আৰ্য্যদৰ্শন

মাসিক পত্র ও সমালোচন

১১শ খণ্ড] বৈশাখ ১২৯২। এপ্রেল ১৮৮৫। [১ম সংখ্যা।

সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা

রাজা রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়া।

সুপ্রসিদ্ধ কৃত্তিনাশা * (পদ্মা) নদীর দক্ষিণ বিভাগে যে সমস্ত স্থান দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাজনগর একটী বিখ্যাত স্থান। ইহা ঢাকা জেলা ও বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে সুবিখ্যাত কৃত্তি-নাশা নদী প্রবাহিত থাকিয়া ভীষণ তরঙ্গ-মালা বিস্তার করতঃ অলঙ্ঘ্য দুর্গ-পরিখার ন্যায় বিপক্ষগণের ভয় সঞ্চার করিতেছে। কুল কুল নাদে প্রবাহিত হইয়া দর্শক-বৃন্দের আনন্দোৎপাদন করিতেছে। দক্ষিণে মৃত কালীগঙ্গা নদী। যদিও এই সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে অন্যান্য পল্লী আছে তথাপি ইহা সাধারণতঃ রাজনগর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই রাজনগর মৃত রাজা রাজবল্লভ রায় রাইঁয়া ও তাঁহার বংশধরগণের কীর্ত্তি-কলাপ বক্ষে ধারণ করিয়াই গৌরবান্বিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বেদগর্ভ সেনগুপ্ত নামক [illegible] সম্ভ্রান্ত

* এই নদীর উৎপত্তি বিষয়ে একটী অদ্ভুত জনপ্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ চাঁদরায়, কেদার রায়ের রথের চক্রে একস্থানে একটী গর্ত্তের মত হইয়াছিল। একদা এক ব্রাহ্মণ রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে 'তিনি ঐ গর্ত্তে ডুবিয়া মরিতেছেন'। পর দিবস ব্যঙ্গচ্ছলে ঐ গর্ত্তে পা দিয়া স্বপ্ন বিবরণ বলিতে বলিতে প্রলয় নদী হইয়া গেল। রথ টানিবার স্থানে হইল বলিয়া প্রাচীনেরা উহাকে "রথখোলার নদী" বলিয়া [illegible]। ইহাকে এখন কৃত্তিনাশা বলা যায়। আমরা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে উক্ত প্রবল স্রোতোময়ী অল্পপরিসর ছিল। [illegible]পরি-উক্ত রাজনগর হইতে বহুসংখ্য গ্রাম অতিক্রম করিয়া ৬৭ ঘণ্টায় নদীতীরে উত্তীর্ণ হইতে হইত। এখন উহা সে সমুদয় গ্রামসহ রাজনগর উদরসাৎ করতঃ বহু বিস্তীর্ণ হইয়াছে। বোধ হয় উহার এরূপ দ্রুত বিস্তীর্ণতা বশতই উল্লিখিত প্রবাদ হইয়া থাকিবে। বহুল কীর্ত্তিসমূহ নাশ করিয়া পদ্মার এই অংশ 'কৃর্ত্তিনাশা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

ব্যক্তি যশোহরের অন্তঃপাতী ইটনা গ্রাম হইতে এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে রাজনগরে আসিয়া পাঠাভ্যাস করেন। ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহার এক পুরোহিতও আইসেন। কাল সহকারে তাঁহারা উভয়েই বিবাহ বশতঃ ঐ স্থানে বাস করেন। এই বেদগর্ভ সেন হইতে ধারাবাহিক কতিপয় পুরুষ গত হইলে সেই বংশে কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনার বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকাতে আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। উল্লিখিত মজুমদার মহাশয়ও অনেক ক্রিয়া-কলাপ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত নবরত্ন ও [illegible]ল দীর্ঘিকা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করি[illegible]ছে। উহা চতুর্দ্দিকে দ্বিতলবিশিষ্ট আটটী [illegible] দ্বিতলের মধ্য হইতে অবশিষ্ট রত্নটী দণ্ডায়[illegible]মান হইয়াছে। মধ্য রত্নটী উচ্চতায় ৯০ হ[illegible] পরিমিত হইবে। ইহার প্রাচীর এরূপ দৃঢ় [illegible] পুরু যে কামানের গোলা অনায়াসে ভেদ [illegible]রিতে পারে না। প্রত্যেক তিন স্তর অন্তর [illegible]ক স্তর প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। প্রোক্ত রত্নের [illegible]মুখে একটী পুষ্করিণী। প্রবাদ আছে ঐ রত্ন [illegible] গ্রথিত করিবার সময় তাহার চূর্ণ শুরকি [illegible]দি মিশ্রিত করিবার জন্যই উক্ত পুষ্ক[illegible] খাত হইয়াছিল। তজ্জন্য উহা নবরত্নের "পুষ্করিণী" বলিয়া কথিত হইত।

কালক্রমে মজুমদার মহাশয়ের চারি পুত্র জন্মে। ১ম রাজারাম, ২য় ধনিরাম, ৩য় রাজবল্লভ, ৪র্থ রামরাম। রাজবল্লভ ১১০৫ বঙ্গাব্দে † জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ আছে।—

প্রথম প্রবাদ এই যে, মজুমদার-পত্নী গর্ভ-সূচনার প্রারম্ভে নিশীথকালে স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটী পূর্ণ চন্দ্র তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া তাঁহার স্বামীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শ্রবণমাত্র মজুমদার মহাশয় পত্নীর কপোলে এক চপেটাঘাত করিলেন। মজুমদার-পত্নী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে অবশিষ্ট রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে মজুমদার মহাশয় স্বীয় পত্নীকে বলিলেন "প্রিয়তমে! তোমাকে যাতনা দেওয়ার অভিলাষে আমি চপেটাঘাত করি নাই। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন সুস্বপ্ন দর্শন করিয়া নিদ্রা গেলে সে স্বপ্ন কখনই সফল হয় না। অতএব তোমাকে আর নিদ্রা যাইতে না

* জ্যৈষ্ঠ মাসের বান্ধবে রাজা রাজবল্লভ সেন শীর্ষক যে ভ্রমপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয় এবং ২৩শে আশ্বিনের সাধারণীতে উদ্ধৃত হয়, ৩০শে মাঘের সাধারণীতে তাহার ভ্রমপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিবাদ সহ এই অংশ মুদ্রিত হয়। এখন সাধারণীতে প্রকাশের সুবিধা না হওয়াতে আর্য্যদর্শনে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করিয়াছি। মজুমদারপত্নী পতির এই সকল বাক্য শ্রবণে বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে এই গর্ভে বিখ্যাত রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রবাদানুসারে নদীয়ার নৃপতি-শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হস্তচালনায় এইরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, 'মগধেশ্বর খ্যাত-নামা জরাসন্ধ রাজবল্লভরূপে জন্মগ্রহণ করেন।' রাজবল্লভের জীবন-চরিত লেখক এ স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র ভূপতি প্রধান।
পেয়েছিলা হস্তচালে শ্লোকের প্রমাণ॥
কিং পৃচ্ছসি রে মূঢ়! বারম্বারং মুহুর্মুহুঃ।
পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধঃ ইদানীং রাজবল্লভঃ॥

তৃতীয় প্রবাদ এই যে, মজুমদার মহাশয়ের উল্লিখিত চারিপুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে আরও দুইটী পুত্র জন্মে। তাঁহারা যখন ১০।১২ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হন, তখন এক দিবস এক সন্ন্যাসী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া মজুমদার মহাশয়কে বলিলেন যে "এই দুই পুত্র মানব নহে। ইঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কোন প্রকার সুখ হইবে না।" অতঃপর সন্ন্যাসী এক মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র তাহারা উভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে দাঁড়কাকের আকৃতি ধারণ করিল। মজুমদার মহাশয় এতদ্দর্শনে অতিশয় ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলির ভিতর হস্ত প্রবেশ করিয়া উত্তোলন করিলে পাঁচটী শস্যের বীজ ঝুলি হইতে উত্থিত হইল। বীজগুলি তৎক্ষণাৎ ভূমিতে বপন করিবামাত্র দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইল, এবং তৃতীয় অঙ্কুরটী অন্যান্যগুলি অপেক্ষা অতিশয় সতেজ হইল। সন্ন্যাসী তখন হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে "তোমার চারি পুত্র ও এক কন্যা হইবে, এবং তৃতীয় পুত্র অতিশয় ক্ষমতাশালী ভূপতি হইবে।" তদনন্তর মজুমদার মহাশয়ের চারি পুত্র, এক কন্যা জন্মে, এবং তৃতীয় পুত্র রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।*

* গ্রাম্য প্রবাদ রাজনগর ও অন্যান্য গ্রামসমূহের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই বলিয়া থাকে, অন্যান্য স্থানের লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। আমি উত্তরাঞ্চলে বগুড়া জেলায়ও কোন কোন প্রাচীনের মুখে শুনিয়াছি। ২য় ও ৩য় প্রবাদ রাজা রাজবল্লভের জীবন-বৃত্তান্তেও প্রাপ্ত হওয়া গেল। বলা বাহুল্য যে প্রবাদ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নিশ্চয় করিয়া বলা কাহারও সাধ্য নাই। যে প্রবাদ যত অধিক দূর ব্যাপ্ত হয়, লোকে তাহাই তত সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে। যদি চন্দ্রশেখরের প্রতি মহামায়ার কৃপাবশতঃ সমুদ্র এক রাত্রি মধ্যে দ্বীপে পরিণত হইয়া চন্দ্রদ্বীপ সৃষ্টি ও মেথলা নদে বিশ্বম্ভর চরের ভুল হওয়াতে 'ভুলোয়া'

রাজবল্লভ সুশ্রী, সাহসী, কর্ম্মদক্ষ, দয়ালু ও পরমদাতা ছিলেন। রাজারাম বাল্যকালে পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঢাকা নবাব সরকারে কাননগুই সেরেস্তায় কাজ করিতেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার নিকটে থাকিয়া পারস্যভাষা অধ্যয়ন করেন। প্রথমতঃ ঢাকার নবাব সরকারে কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে উচ্চ পদে আরূঢ় হন, এবং দক্ষতাগুণে সুযোগ ক্রমে মুরশিদাবাদের নবাব সরকারে নিযুক্ত হন। সেই সুযোগ এই যে নবাব যখন ঢাকা নেবায়তীর নিকাশ তলব করেন, তখন রাজা রাজবল্লভ নিকাশ দেওয়ার জন্য মুরশিদাবাদে প্রেরিত হন। তিনি দক্ষতা সহকারে নিকাশ দিলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে মুরশিদাবাদে উচ্চপদ প্রদান করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১১৪৬ বঙ্গাব্দে (১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে) মুরাদ আলী যখন ঢাকার নবাবীপদে নিযুক্ত হন রাজবল্লভ তাঁহার সহিত ঢাকা আইসেন। মুরাদ আলীর পর ১১৪৭ বঙ্গাব্দে (১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে) নিবাইশ মহম্মদ যখন বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন, রাজবল্লভ তখন তাঁহার প্রধান সহকারী হন। একজন বিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন "Raja Rajbullabh was the Deputy Governor of Dacca"। রাজবল্লভ দীর্ঘকাল এই পদে থাকিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, তিনি ক্রমে নানাবিধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, দেবালয় স্থাপন, দীর্ঘিকা খনন, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, দান, যাগ, যজ্ঞ ও অন্যান্য অনেক কার্য্য করিয়া স্বীয় নাম ও বংশ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্রমে তাহার সবিস্তার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন কীর্ত্তিনাশা নদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া পশ্চিম-পূর্ব্ববাহিনী হওতঃ ঐ স্থানকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্রূপ তাহার (কীর্ত্তিনাশার) একটী ক্ষুদ্র স্রোত রাজনগর মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া ক্রমিক বক্র গতিতে আড়িয়াল খাঁ নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাজনগরকেও উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই খালটী বহমান থাকাতে রাজনগরের নানা প্রকার গতি বিধি ও বাণিজ্য বিষয়ক সুবিধা ও অন্যান্য অনেক নৌকাবাহীর যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভ এই খালের অব্যবহিত দক্ষিণ পারে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে একটী বিস্তৃত হাট স্থাপন করেন।

নাম হইয়া তাঁহারই ভুলুয়াধিপতি হওয়া সম্ভব হয়, তবে উপরি-উক্ত প্রবাদগুলি হয়ত বান্ধবের রাজবল্লভ শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক ভিন্ন ভাল লোক দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

রাজা কর্ত্তৃক খাত বলিয়া দীর্ঘিকা 'রাজসাগর' বলিয়া কথিত হয়, এবং তাহার তীরে স্থাপিত বলিয়া হাট 'রাজসাগরের হাট' বলিয়া অভিহিত হয়। উহা রাজবাটী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। রাজা কর্ত্তৃক খাত বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা যাহা লিখিয়াছেন, ও রাজা রাজবল্লভ শীর্ষক প্রবন্ধের ভ্রমসংগ্রাহক কর্ত্তৃক যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভ্রম। আমরা অন্যান্য দীঘিকার বর্ণন সময়ে সে ভ্রম আরও দর্শাইব। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দীঘি। এক তট হইতে বন্দুকের ধ্বনি করিলে অন্যতটস্থ লোক শুনিতে পায় না। চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসিতে দেড় দুই ঘণ্টার প্রয়োজন। প্রোক্ত হাটটী দীর্ঘিকার উত্তর পারে স্থিত। অপর তিন পারে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী(নবশাখ) লোকদিগের বসতি। এক এক পার এক একটী গ্রামের মত। এখন দীর্ঘিকা ভগ্ন হইয়া কীর্ত্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে। হাটটী কিঞ্চিৎ সরিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। হাটটী অতি বিস্তৃত ও তথায় বহুসংখ্যক মহাজনের ঘর আছে। ৮।১০ ক্রোশ দূরস্থিত লোক একটু বৃহৎ ব্যাপার হইলেই এই স্থান হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যায়।

প্রোক্ত খালের একপার (দক্ষিণ পার) হাট। অপর পার (উত্তর পার) হইতে বরাবর সোজা ভাবে উত্তর দিকে একটী বিস্তীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর উত্তরাস্যে কিয়দ্দূর গমন করতঃ পশ্চিমগামী হইয়া বহুদূর অতিক্রম করিলে সম্মুখেই রাজবাটীর প্রথম দৃশ্য একুশ রত্ন* দৃষ্ট হয়। উহা ধনুরাকারে শোভিত হইয়া দর্শকবৃন্দের নেত্র ও মন আনন্দে আপ্লুত করে, অভেদ্য গিরিদুর্গের ন্যায় বিপক্ষগণের ভয় সঞ্চার করে। এক জন ইংরাজ দর্শক রাজবাটী দর্শন করিতে গিয়া একুশ রত্নের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে সাহসী হইলেন না। বলিলেন "উহা রাজাকা গড়"— অতিক্রম করা বিধেয় নহে। বাস্তবিকই উহাতে রাজকীয় সেনা থাকিত। রত্নাবলী ইষ্টকনির্ম্মিত। ঠিক মধ্যস্থল দিয়া রাজবাটী প্রবেশের সিংহদ্বার। উক্ত দ্বার এরূপ বিস্তৃত ও উচ্চ যে নিশাদীত্রয় অনায়াসে একত্রে প্রবেশ করিতে পারে। সিংহদ্বার প্রবেশের উভয় পার্শ্বে দুইটী ভিত। ঐ দুই ভিতের উপর দুইজন সান্ত্রী অনবরত যমদূত ও কালদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া

* উল্লিখিত একুশ রত্ন রাজা রাজবল্লভের পঞ্চমপুত্র কুমার রায় গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যে বৎসর থাকবস্তার জরিপ হয়, সেই বৎসর একজন সাহেব রাজনগরে তাঁবু গাড়িয়াছিলেন, সেই সাহেবকর্ত্তৃক সেই সময়ে এই সকল রত্ন পরিমাপ হয়, এবং ফটোগ্রাফিক চিত্র লওয়া হয়। অবশেষে সমাগত বালকমণ্ডলীরও এক ফটোগ্রাফিক চিত্র লওয়া হইয়াছিল।

শত্রুদিগের ভয় সঞ্চার করিত। রত্নরাজি দ্বিতলের চতুষ্কোণে চারিটী। সম্মুখ দিকের মধ্যপ্রদেশে (সিংহদ্বারের ঠিক উপরিভাগে) ৩টী ও পশ্চাৎদিকে একটী। সম্মুখের ৩ টীতে অষ্ট প্রহর নহবৎ বাদ্য হইত। ত্রিতলের সম্মুখে দুই কোণে দুইটী এই সমস্তে দশটী। অবশিষ্ট একাদশটী ত্রিতল হইতে লম্বমান হইয়া শ্রেণীভাবে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে, মধ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, উহার উচ্চতা ৯০ নব্বই হস্ত পরিমিত হইবে। মধ্যটী হইতে উভয় পার্শ্বের গুলি ক্রম নিম্ন হইয়া আসিয়াছে, তজ্জন্যই দেখিতে ঠিক ধনুরাকার দৃষ্ট হয়।

উপরি-উক্ত একুশ রত্ন মধ্যস্থিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করিলে বিস্তৃত এক অঙ্গন প্রাপ্ত হওয়া যায়, উক্ত অঙ্গন সাধারণতঃ একুশ রত্নের খণ্ড (২য় খণ্ড) বলিয়া অভিহিত হয়। এই অঙ্গনের উত্তরের দিকে বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত ইষ্টক নির্ম্মিত একটী মন্দির। উহাতে রাজা রাজবল্লভের বার্ষিক দুর্গোৎসব ক্রিয়া সমাধা হইত, এ জন্য উহা সাধারণতঃ 'দুর্গাদালান' বলিয়া কথিত হয়। উহার আকৃতি দ্বিচাল ঘরের মত। চতুর্দ্দিকের ভিত্তিতে নানা প্রকার সুন্দরদৃশ্য ছবি অঙ্কিত। দৃষ্টিমাত্রেই প্রাচীন স্থপতিকারগণের শিল্পকৌশলের গৌরব স্মরণ করিয়া মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। দক্ষিণ দিকে আর একটী দ্বিতল দালান, উহা সচরাচর 'সে ঘরা' শব্দে অভিহিত হয়। উহার তিনটী প্রকোষ্ঠ এজন্যই উক্ত নাম হইয়াছে। রাজকীয় নানা প্রকার দৈবী ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াদিতে বাদকগণ উহাতে বাস করিত। পশ্চিমদিকে অর্থাৎ একুশ রত্নের ঠিক বিপরীত দিকে সমান্তরালে সিংহদ্বার সমন্বিত অপর একটী দালান। উহার মধ্যস্থলে সিংহদ্বার উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠ দ্বয়ে সান্ত্রীগণ অবস্থান করতঃ প্রতিনিয়ত স্ব স্ব পাহারা সম্পাদন করিত। এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেই সম্মুখে তৃতীয় অঙ্গন। এই অঙ্গনের এক দিকের একটী মন্দিরে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বাসুদের খণ্ড বলিয়া কথিত হয়। অপর দিকে রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের রঙ্গমহল। কথিত আছে বাসুদেব অতি পৌরাণিক বিগ্রহ। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হিন্দুদেববেষী বিখ্যাত কালাপাহাড় অনেক বিগ্রহের নাশা কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন, এই বিগ্রহও সেই হিন্দুকুলাঙ্গার বীর কর্ত্তৃক অসম্মানিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় অঙ্গন হইতে একটু তির্য্যকভাবে উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া অপর একটী তোরণ অতিক্রম করিলেই সম্মুখে অপর এক অঙ্গন (চতুর্থ খণ্ড) প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাধারণতঃ উহা পঞ্চ রত্নের খণ্ড বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই অঙ্গনে প্রবেশ করিলেই, সম্মুখে প্রকাণ্ড-

দৃশ্য সপ্তদশরত্ন উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। সতরটী রত্নে মণ্ডিত ও সুশোভিত বলিয়া উহা সচরাচর সতর রত্ন নামে কথিত হয়। উহার মূল প্রদেশের চারিকোণে চারিটী। এই চারিটীর উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া আটটী, এবং প্রত্যেক দিকের এই দুইটীর মধ্যে একটী করিয়া চারিদিকে চারিটী, এই ষোলটী। ইহারা প্রত্যেকেই দ্বিতল ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট। দ্বিতলের মধ্য হইতে অবশিষ্ট রত্নটী লম্বমান হইয়া বহুদূর উঠিয়াছে। উহা উচ্চতায় ১২৫ হস্ত * পরিমিত হইবে। এই লম্বমান রত্নটী চতুস্তল অর্থাৎ মূল প্রদেশ হইতে পঞ্চতল বিশিষ্ট। রাজার বার্ষিক দোলোৎসব ক্রিয়া সমাধা হইত এজন্য উহা দোলমঞ্চ বলিয়াও কথিত হয়।

মহারাজ বহুল সমারোহসহকারে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র দোলে উঠাইতেন। কথিত হয় যে রাজার প্রতি উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের স্বপ্নাদেশ দ্বারা নিষেধ হওয়াতে উহাতে দোলোৎসব হওয়া বন্ধ হয়। দোলোৎসবের সময় উপর তল হইতে আবির বস্তা বস্তায় এইরূপ নিক্ষিপ্ত হইত যে, সমুদায় জীব জন্তু, বৃক্ষ, লতা ঘাট পথাদি লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যাইত। উর্দ্ধতল হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে বহুদূর পর্য্যন্ত নয়নগোচর হইত এবং প্রকাণ্ড বৃক্ষাবলিকেও সমতলক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইত, নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃতা কীর্ত্তিনাশা নদীকেও একটী ক্ষুদ্র পরিখা বলিয়া ভ্রম হইত। উপর তলে উঠিতে পথিমধ্যে ৩।৪ স্থানে বিশ্রাম করিতে হইত। দ্বিতলে একটী বন্দর সংস্থাপিত ছিল। তাহাতে দৈনিক ক্রয় বিক্রয় সমাধা হইত। ইহার বিপরীত দিকে অঙ্গনের পশ্চিম পার্শ্বে পঞ্চরত্ন সংস্থাপিত। ইহা দ্বিতল ও বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত, দেখিলেই মন নানাবিধ আনন্দরসে আপ্লুত হয়। কোথাও প্রাচীরের গাত্রে রামলক্ষ্মণ দণ্ডায়মান অবস্থায় ধনুকে জ্যা-রোপণ করিতেছেন, পার্শ্বে হনুমান বিভীষণাদি মিত্রগণ চরণ বন্দনা করিতেছেন। কোথাও বা দেবাসুরের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইতেছে। কোথাও বা স্বর্গীয় নর্ত্তকীগণ,—উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি দেবগণ সমক্ষে আনন্দে নৃত্য

* বিক্রমপুরের ইতিহাসে ইহা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এই বুঝা যায় যে, মূল হইতে চতুস্তল পর্য্যন্ত চারিকোণে চারিটী করিয়া ১৬টী চূড়ার উপর অবশিষ্ট রত্নটী। আমরা উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, বস্তুতঃ উহা ভ্রমপূর্ণ। একুশ রত্ন সম্বন্ধেও ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ অসম্পূর্ণ বর্ণনা হইয়াছে। এরূপ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াই বান্ধবে রাজা রাজবল্লভ সেন শীর্ষক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতঃ অন্যান্য ইতিহাসকে 'অকর্ম্মণ্য' ও 'ঐতিহাসিকগণকে' 'ঐতিহাসিককুলকলঙ্ক' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া কতদূর সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ পৌরাণিক মূর্ত্তি ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া কাহার মন না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, ও স্থাপয়িতাকে হৃদয় ও মনের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? উহার মধ্যপ্রদেশে একটী রত্ন অবস্থিত থাকিয়া তাহার চারিকোণে সংলগ্নাবস্থায় চারিটী রত্ন সুশোভিত। ইহারা প্রত্যেকেই দ্বিতল। মধ্যস্থিত রত্নটীর চতুর্দ্দিকে চারিটী বারান্দা থাকিয়া রত্নগুলিকে আরও সুশোভিত করিয়াছে। রাজবল্লভ মহাসমারোহ সহকারে ইহাতে তাঁহার দেবালয় স্থাপন করেন। দেবালয়ে নানাবিধ বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে 'রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' সমধিক বিখ্যাত। লক্ষ্মীনারায়ণ একটী শিলাচক্র ও রাজরাজেশ্বরী একখানি দক্ষিণাকালী। কথিত হয় রাজবল্লভ প্রোক্ত শালগ্রাম এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হন। একদা এক সন্ন্যাসী রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজার আকৃতি দর্শনে, তাঁহাকে ক্ষমতাপন্ন লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া, তাঁহার ভাবী উন্নতির সূচনা স্বরূপ উক্ত চক্র প্রদান করেন। সন্ন্যাসী একাদিক্রমে ৩ বার ঝুলিতে হস্ত প্রদান করিলে তিন বারই উক্ত চক্র উত্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজশ্রীর চিহ্নসূচক উক্তচক্র প্রদান করেন। মহারাজ উক্ত বিগ্রহের নামে নানা-দেবোত্তর দান করেন, যাহা ১১৭২ সালের ঢাকা নেবায়তীর জমাবন্দীতে জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ নামে রাজনগর প্রভৃতি ৩৮ খান মহলের জমাবন্দী ১০০৮৮ নব্বই হাজার অষ্টাশি টাকা লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নৈষ কান্দি, বাসুদেবপুর প্রভৃতি অনেক লাখেরাজ মহলও উক্ত বিগ্রহের নামে দান করেন। উহা লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও নিষ্কর নিরূপিত হইয়া, আদ্যাপিও উক্ত বিগ্রহের নামে চলিতেছে। অদ্যাপিও উহার রাজস্ব আদায় হইয়া দুই জন পাণ্ডা দ্বারা প্রাত্যহিক বিগ্রহ-গুলির অর্চ্চনা হইতেছে। পূর্ব্বে অতি সমারোহ সহকারে প্রাত্যহিক নানাবিধ ভোগ ও বলি দ্বারা অর্চ্চনা হইত, এখন রাজবংশের রাজলক্ষ্মী অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের লক্ষ্মীও হীনপ্রভ হইয়াছেন। প্রোক্ত রাজনগর প্রভৃতি মহাল নিলাম হইয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে। নিষ্কর মহালগুলির রাজস্ব দ্বারা অর্চ্চনা হইতেছে। উক্ত চক্র স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসন সহ চুরি হইয়াছিল, বহু অনুসন্ধানের পর পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিগ্রহগুলির অনেক ভগ্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখনও ৮৫টী শালগ্রাম, বহুসংখ্যক লক্ষ্মীগোবিন্দ ও অন্যান্য নানাবিধ মূর্ত্তি আছে। যে লক্ষ্মীগোবিন্দ দ্বারা দোল ও ঝুলন ক্রিয়াদি হয়, উহা মহারাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহার পাদদেশে এই সংস্কৃত শ্লোকটী লিখিত আছে; যথা—মাতুঃ শ্রীরামদাসস্য প্রতিষ্ঠা জাহ্নবীতটে। এতদ্ভিন্ন অঙ্গনের উত্তরে ও দক্ষিণের দিকে আরও দুইটী সুরম্য হর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরেরটীতে দুর্গোৎসব সমাধা হইত, দক্ষিণেরটী দেওয়ানখানা নামে অভিহিত হইত। এইটীও নানাবিধ শিল্প কার্য্যের বিশেষ পরিচয় দেয়। রাজ-দেওয়ান উক্ত হর্ম্ম্যে পারিষদগণবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

শতদ্রু দর্শন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভকাল হইতে লাহোরের কথা শুনিয়া আসিতেছি। পাঠশালার পটমণ্ডপে সঙ্কীর্ণ পত্রপট্টিকায় বসিয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত যখন গুরুমহাশয়ের নিকট সময়ে সময়ে ইহার বিবরণ শুনিতাম, তখন মনে হইত বুঝি যথার্থই "লাহোরের" পর আর দেশ নাই। ক্রমে ঈশ্বরানুগ্রহে গুরুমহাশয়ের তর্জ্জন গর্জ্জন ও বেত্র যষ্টি হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইয়া স্কুলের কাষ্ঠমঞ্চে স্থান পাইলাম। শিক্ষা প্রণালীর সুচারু পদ্ধতিক্রমে পাঠ্য পুস্তকা-বলির সহিত "ভূগোল সূত্র" পাঠে ক্রমে ভৌগলিক বিদ্যার সূত্রপাত হইল। তখন বুঝিলাম লাহোর পৃথিবীর শেষে নহে,—পঞ্জাবের প্রধান নগর মাত্র। কিন্তু তাহার পর হইতে ইহার সম্বন্ধে মনো-মধ্যে আর একটী নূতন ধারণা স্থান পাইল। পঞ্জাবপ্রদেশ সিন্ধুনদের পঞ্চশাখা বিধৌত। যে স্থানে একত্রে পাঁচটী নদী সখীভাবে বহমান, হিমগিরি যাহাদের সকলের জন্মদাতা, সেই পঞ্চ নদীর লীলাভূমির সমস্ত রত্ন ও সৌন্দর্য্য-রাশি যথায় একত্রিত, না জানি সেই লাহোর কতই মনোহর। ক্রমশঃ রাজ-তরঙ্গিণীর এবং ইবন আলাটির, আবুল-ফিদা, আবুল ফজল, বর্ণিয়ার, ফেরিস্তা, মিল্টন,* মুর† ও টড প্রভৃতি মনীষিগণের

* —"From the destined walls
Of Cambalu, seat of Cathian Can,
And Samarchand by Oxus,
Temir's throne,
To Paquin of Sinaean Kings;
and thence,
To Agra and Lahore of great
Mogul,
Cities of old or modern fame,
the seat
Of mightiest empires.—"
Paradise Lost, Bk, XI, 337-341.

† "They had now arrived at the splendid city of Lahore, whose mausoleums and shrines, magnificent and numberless, where Death appeared to share equal honours with heaven, would have wonderfully affected the heart and imagination of Lalla Rookh, if feelings, more of this earth had

গ্রন্থে ইহার বিবিধ বিচিত্র বর্ণনা পাঠ করিয়া সেই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইল। বুঝিলাম কাহার যথার্থই মায়াপুরী। দেখিতে কৌতূহল জন্মিল; যে কৌতূহলে মর্ম্মস্থল এতদিন উদ্বেলিত ছিল। আজি ঘটনাস্রোতের ঘোর আবর্ত্তে পতিত হইয়া সেই স্বপ্নমোহী পঞ্চনদ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্জাবের সীমায় পদার্পণ করিয়া অবধি আমি তৃষিতের ন্যায় লৌহবর্ত্মের দক্ষিণবামে দেখিতে লাগিলাম। তৃপ্তি হইল না—নয়নদ্বয় বিপ্রলব্ধ আশামুগ্ধ প্রেমিকের ন্যায় চপলভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রন্থসমূহের উপদেশ ভুলিয়া কেবল সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে পঞ্জাব ভূমিকে প্রকৃতির হাস্যময়ী লীলাস্থলী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা মরুভূমি মাত্র। লৌহপথের দুই ধারে—যতদূর দৃষ্টি যায়—দেখিতে পাইলাম সুদূর প্রসারিত শুষ্ক ক্ষেত্রসমূহ দূরে দিগন্ত রেখার সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে দুই চারি খানি জনার, গোধূম ও ইক্ষুক্ষেত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া মরুভূমির ভীষণ দৃশ্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। কোথায় কৃষকের চত্বরস্থিত কূপের অমৃত রস পানে অশ্বত্থ, নিম্ব বা শিশু পাদপাবলি তাহার পর্ণকুটীরকে পরিবেষ্টন করিয়া ছায়া দান করিতেছে। দরিদ্র জাঠ সপরিবারে তাহাদের ছায়াতলে উপবেশন করিয়া প্রখর রৌদ্র হইতে বিরাম লাভ করিতেছে, অথবা মহিষ বা বলদতাড়িত পারসিক চক্রের সম্মুখে বসিয়া চকিত নয়নে উন্নত গ্রীবায় ধাবমান বাষ্পীয় রথের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে। যেখানে যেখানে কূয়া ও হন্ট, সেই খানে সেই খানেই দুই চারিটী গাছ একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা সমস্তই মরুভূমি—ছায়াহীন—শস্যহীন—বিশাল ভয়ঙ্কর মরু! প্রাণ আকুল হইল, বুঝিলাম চিরকালের ধারণা ভ্রান্ত। তথাপি আশা ফুরাইল না; মনে ভাবিলাম শতদ্রুর তীরভূমি দেখা যাউক। শতদ্রু আমার পক্ষে আকাশগঙ্গার ন্যায় কল্পনাময়ী ছিল। তারকামণ্ডিত নির্ম্মল নৈশগগনে ক্ষীরধৌত ছায়াপথ দেখিয়া যেমন মন্দাকিনী কল্পনা করিয়া থাকি, মানচিত্রের মসীময়ী নদীরেখা দর্শনে সেইরূপ শতদ্রুর অবয়ব কল্পনা করিতাম। আকাশগঙ্গা কোথায়—জানি না। সেই জন্য তাহা যথার্থই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু

not taken entire possession of her already. * * * * Engines were worked in all the squares, which cast forth showers of confectionery among the people, while the artizans, in chariots adorned with tinsel and flying streamers, exhibited badges of their respective trades through the streets. Such brilliant displays of life and pageantry among the palaces and domes and gilded minarets of Lahore, made the city altogether like a place of enchantment.—Lalla Rookh.

শতদ্রুর বর্ণনা অনেকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক গ্রন্থে ইহার অনেক বিবরণ পাঠ করিয়াছি; সুতরাং ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও এতদিন ইহাকে মন্দাকিনীর মত মনে করিতাম। আজি সেই মন্দাকিনী দেখিব,—হৃদয়ে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

দিবা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব আত্মকৃত অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত প্রখর তাপে উত্যক্ত হইয়া যেন শান্তিলাভ করিবার জন্যই পশ্চিম গগনে ধীরে ধীরে নামিতেছেন। লৌহপথের দুই পার্শ্বস্থ শিশুতরুশ্রেণীর নিভৃত পত্রাবলি ত্যাগ করিয়া বিহগকুল নিম্নশাখায় নামিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর বজ্রগম্ভীর শব্দ শুনিয়াও তাহাদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল, সেই প্রখর রৌদ্রের সময়ও দুই একজন কৃষক হলচালনা করিতেছে। পঞ্জাবের জাঠ কৃষকগণ এমনই কঠোর পরিশ্রমী। দিবাকর ধীরে ধীরে দিগ্বলয়ের নীচে নামিলেন,—দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার শেষ রশ্মিজাল পশ্চিমাকাশে নানাবর্ণে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। এমন সময়ে শতদ্রুর সৈকতজাত শালবন দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী নদীর উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শতদ্রুর উপরে বিরাট লৌহ সেতু। সেই সেতুর উপরে আসিয়া বাষ্পীয় শকট মন্দ মন্দ ভাবে চলিতে লাগিল। সেই অবসরে শতদ্রুকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম শতদ্রু সৈকত শয্যায় শয়ান, ক্ষীণ জীবন,—অস্ফুট কলনাদী। সৈকতমালা অসংখ্য বিকট ব্রণের ন্যায় তাহার অঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যেন তাহার শোণিত শুষিয়াছে,—তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে। শতদ্রুর সে তেজ সে কূলপরিপ্লাবী উচ্ছ্বাস—সে শ্রবণ ভৈরব গর্জ্জন,—কিছুই নাই; ভারতের দুর্দ্দশা যেন তাহার সমস্ত অঙ্গে বিরাজ করিতেছে।

সেইদিন সেই লীয়মান রবিকিরণে আমার কল্পনার চিরসহচরী সুরনদীর সেই ম্রিয়মান ভাব দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মথিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলাম, "সুরসরিৎ! আজি তোমার এ দশা কেন? কেন তুমি আতট ও অনন্ত তরঙ্গলীলা ছাড়িয়া সৈকত শয্যায় শুইয়া রহিয়াছ? যেদিন হিমালয়ের বিরাট পাষাণ-প্রাকার ভাঙ্গিয়া পাঁচটী ভগিনীতে জড়াজড়ী করিয়া ভারত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সেইদিন তোমার যে তেজ ছিল, আজি তোমার সে তেজ কোথায়? যে তেজের প্রভাবে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া, ভূতল কাঁপাইয়া, ভারতবাসীর হৃদয়ে নূতন মন্বন্তরের তান উঠাইয়া নিজ মদে মত্ত হইয়া গেলিয়াছিলে, আজি তোমার সে তেজ, সে মত্ততা কোথায়? যে দিন বুধশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া স্বীয়গলে পাষাণ

বাঁধিয়া তোমার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেই দিন তোমার যে তেজ, যে যোজন-ব্যাপিনী শতধা দ্রুতগতি দেখিয়া আর্য্য পিতামহগণ তোমাকে শতদ্রু নামে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সে তেজ—সে তীব্রগতি কোথায়? যে দিন চন্দ্র-বংশীয় বাহ্যাশ্বের ধুবন্ধর পঞ্চ পুত্র তোমার বিশাল বক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া প্রসিদ্ধ পাঞ্চাল রাজ্য স্থাপন করিলেন সেইদিন তোমার যে তেজ ছিল, আজি সে তেজ কোথায়? যেদিন পঞ্চ পাণ্ডব সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয়তমা পাঞ্চালীর সহিত তোমাদের পঞ্চ ভগিনীকে পার হইয়া হিমগিরির অনন্ত তুষার রাশির মধ্যে জীবন পরিত্যাগ করিলেন সেই দিন তোমার যে তেজ ছিল, আজি সে তেজ কোথায়?

ভীষণ গৃহযুদ্ধে সুবিশাল যদুকুল ধ্বংস পাইলে যেদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনৈক বংশধর তোমাদের লীলাভূমি পঞ্চনদ পার হইয়া দেবীর অনুগ্রহে প্রসিদ্ধ বিহাররাজ্যে সিংহাসন লাভ করিলেন, সেই দিন তোমার যে তেজ ছিল, আজি তাহা কোথায়? যেদিন সেমিরামিস, যেদিন সিসষ্ট্রীশ, যেদিন তক্ষকগণ, যেদিন রোস্তম, দারায়ু, আলেকজন্দার, নশেরোয়াঁ, নশেজেদ, প্রভৃতি পাশ্চাত্য বীরগণ অভিযানোদ্যত হইয়া ভারত ভূমে আপতিত হইল, সেই দিন তোমার যে তেজ ছিল, আজি তাহা কোথায়? সকলই ফুরাইয়াছে—সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে—ভারতের মন্দ ভাগ্যের সহিত সে তেজ—সে গতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা আজি তুমি নিজ অঙ্গে লৌহ শৃঙ্খল পরিবে কেন? এ কলঙ্ক কিসের জন্য? উঠ, সতি, নিজ পূর্ব্ব পুণ্যবলে পূর্ণ তেজ ধারণ করিয়া এ কালিমা ধুইয়া ফেল এবং দিক ভাসাইয়া শতদ্রু নাম সফল কর *।"

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামায়ণের লুপ্ত অধ্যায়।

ইদানীন্তন ধর্ম্মালোচনায় চালিত হইয়া আমরা রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করি। পাঠ শুদ্ধ করিবার জন্য দুই খানি গ্রন্থ লই,—একখানি এক্ষণকার মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ, আর একখানি হস্তাক্ষরিত বহুকালের প্রাচীন পুথী। পুথীর অনেক স্থল কীট-দষ্ট হইয়াছিল। এই পুথীমধ্যে আমরা একটি অধ্যায় পাই, তাহা মুদ্রিত-গ্রন্থে ছিল না। অনন্তর, আমরা অপরাপর অনেক মূল গ্রন্থ খুঁজিয়া দেখি, তাহাতেও সে

* এই প্রবন্ধ গত বৎসর আষাঢ় মাসে লাহোরের পার্শ্বস্থ ছাউনি মিয়াঁমিরে লিখিত হইয়াছিল।

অধ্যায়টি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। তজ্জন্য অনুমান করিলাম, এই অতিরিক্ত অধ্যায় মূল গ্রন্থে ছিল, কালক্রমে রামের গোঁড়ারা তাহা উঠাইয়া দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই লুপ্ত অধ্যায় দেখিতে পাইয়াছি। সকলের বিদিতার্থ তাহা প্রকাশ করা উচিত বিবেচনায় বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্মাংশ দিলাম।

বনবাসিনী সীতাকে রামের অঙ্কে পুনঃস্থাপিত করিবার উদ্দেশে মহর্ষি বাল্মীকি যখন চিন্তাপরায়ণ ছিলেন, তৎকালে বিশ্বামিত্র তাঁহার আশ্রমে একদা উপস্থিত হয়েন। যথোচিত সমাদর ও সৎকার পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে তিনি আশ্রমে দুই এক দিবস রাখিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, বিশ্বামিত্র রামের নিকট তদুদ্দেশে গমন করিবেন। রামচন্দ্র যখন কুশলে প্রজাপালন করিতেছেন এমত সময় হঠাৎ একদা বিশ্বামিত্র রামের নিকট সমুপস্থিত। রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে অনেকক্ষণ গুরুশিষ্যে প্রিয় সম্ভাষণ হইল। তৎপরে বিশ্বামিত্র অবসর বুঝিয়া রামকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার আদেশ করিলেন। যজ্ঞ সস্ত্রীক করিতে হয়, এজন্য রামচন্দ্র বলিলেন গুরো, এ যজ্ঞ ত সস্ত্রীক সমাধা হইবে না। মুনি বলিলেন সস্ত্রীক না হইলে কি যজ্ঞ হয়? তুমি সীতা, বনবাস হইতে পুনরানয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ কর। রামচন্দ্র কোন মতেই সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল, রামচন্দ্র পুনর্ব্বিবাহ করিবেন। নিরপত্যতা বশতঃ রামেরও দুঃখ ছিল, তিনি বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র মনে করিলেন, রামের দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ নিষ্ফল করিতে পারিলে অবশ্য তিনি সীতাকে গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞাত যজ্ঞ সমাধা করিবেন। স্থির হইল, রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন। মুনি বাল্মীকিকে সমুদায় বিদিত করিয়া চলিয়া গেলেন। রাম পুনরায় দার পরিগ্রহ না করিতে পারেন, তজ্জন্য বাল্মীকি ব্যস্ত রহিলেন।

এ দিকে চারিদিকে ঘোষণা হইল, রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন। কয়েকটি রাজকন্যাও মনোনীত করা হইল। কুলে, শীলে এবং রূপে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রথমে তাঁহার জন্য দূত প্রেরিত হইল। দূত কন্যার পিতাকে রামের অভিপ্রায় বিদিত করিলেন। নৃপতি পূর্ব্বেই বাল্মীকির পত্রে সমুদায় অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রামচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই:—

"মহাশয়, আমি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখিত হইলাম, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে

আমি অসমর্থ। আপনাকে কন্যা দিয়া পাছে আমাকে জনকের মত মনোবেদনার ক্লেশ পাইতে হয়, এই ভয়ে আমি তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। সীতা তবু জনকের ঔরসজাত নহে, কিন্তু আমার কন্যা আমারই ঔরসজাত। স্ত্রীর প্রতি আপনি অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন। সে ব্যবহার আমার কন্যার প্রতি করিলে আমি সহিতে পারিব না। আপনি জানকীকে যেরূপে লাভ করিয়াছিলেন, পণ দ্বারা সেই রূপে কন্যালাভের চেষ্টা দেখুন। নহিলে আপনার পুনরায় দারপরিগ্রহ দুর্ঘট হইবে। পণ দ্বারা যে বিবাহ দেয়, তাহার পাত্রাপাত্র বিচার করা হয় না। অতএব, সেই প্রকারে পুনরায় কন্যালাভ করিবার চেষ্টা দেখুন। আমি সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাদান করিব। আপনি আমার কন্যালাভের মানস পরিত্যাগ করুন।"

দ্বিতীয় রাজার নিকট হইতে যে পত্র আইসে তাহার মর্ম্ম এই:—

"আপনি না সূর্য্যবংশীয় দশরথ রাজার বংশধর? যে দশরথ রাজা মহিষী সত্ত্বেও শত শত উপপত্নীতে সতত অনুরক্ত ছিলেন,—যে দশরথ রাজার প্রধানা মহিষী চিরকাল মনোবেদনায় কালাতিপাত করেন, একদিকে পতির অপ্রসন্নতা অন্যদিকে পুত্রের বনবাস হেতু চিরদিন অশ্রুজলে মহিষীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত, যে দশরথ রাজা কামাতুর হইয়া কোন রাত্রে কৈকেয়ীর নিকট কি একটা কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাই রক্ষা করা যিনি পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া অপরাপর মহিষীর দারুণ মনোবেদনা দিয়া পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, যে দশরথ রাজার কাহাকে প্রতিজ্ঞা বলে, কাহাকে প্রতিজ্ঞা না বলে, এমত বিবেচনা ও জ্ঞান ছিল না, যে দশরথ রাজার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না, যে দশরথ রাজা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন যে, কামাতুর হইয়া কামিনীর নিকট কোন অসৎ প্রতিজ্ঞা করিলে, সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়াও কর্ত্তব্য, যে দশরথ রাজার দৃষ্টান্তানুসারে কলিকালে অনেক বেশ্যাসক্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী লোকে তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাপালনার্থ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে, আপনি না সেই দশরথ রাজার বংশধর? দশরথ রাজা সূর্য্যবংশে যে কলঙ্ক আনিয়াছেন, আমি সেই কলঙ্কিত সূর্য্যবংশের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহি না। অতএব আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ-অভিলাষ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয় পত্রখানির মর্ম্ম এই:—"মহাশয় আপনার সহিত আমার কন্যার বিবাহে আমি সম্মত নহি; তাহার কারণ এই:—

(১) আপনার পিতাই যেন কামাতুর হইয়া মোহবশতঃ বিবেক-পরাঙ্মুখ

বিমাতার নিকট আপনার অনর্থ সাধন জন্য কোন প্রতিজ্ঞা করেন। সেই প্রতিজ্ঞাই কি আপনার পালনীয়? আপনি কি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ জানেন না? পিতার ভ্রান্তি অথবা মোহকৃত পাপ অনুসরণ করাই কি কর্ত্তব্য? আপনি কি জানেন না যে কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই? প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যাচরণে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না? আপনি বিমাতার কু অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এত যত্নশীল কেন? প্রাণোৎসর্গ লোকে ভাল বিষয়েই করিয়া থাকে। আপনি যে বিষয়ে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে বিষয় কি সৎ? তদপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ে কেন আপনি জীবন উৎসর্গ করিলেন না? আপনার পিতারই যেন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তৎসঙ্গে আপনার মোহ কেন হয়? পিতা আপনাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিলেও আপনি তাহার আদেশ পালন করেন নাই কেন? পিতার মন্দ আদেশ পালন করিয়াই কি পিতৃভক্তি দেখাইতে হয়? তাঁহার সৎ আদেশও কি পালনীয় নহে। তিনি যে মুখে আপনাকে বনবাসের প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞাপন করেন, সেই মুখেই আবার পরে বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইতে আপনাকে আদেশ করেন। আপনি বিচার করিয়া তাঁহার সৎ আদেশই পালন করেন নাই কেন? আপনার দৃষ্টান্তানুসারে কলিকালে অনেক ভদ্র সন্তান পিতৃবেশ্যার খোরাকী যোগাইবে, সন্দেহ নাই। আপনার যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধাবোধ নাই, যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তখন আপনাকে কন্যা দেওয়া আমার অভিমত নহে।

আপনিই যেন বনে গেলেন; বনবাসে সঙ্গে রমণী কেন? আপনিই বল্কলধারী বনবাসী হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু সীতাকে সঙ্গে লইলেন কেন? যদি লইয়াছিলেন, তবে রমণীর রক্ষার উপযুক্ত রক্ষিবর্গ সঙ্গে লয়েন নাই কেন? যদি আপনিই সীতারক্ষণে সমর্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন তবে সমর্থ হয়েন নাই কেন? যে ব্যক্তি আপনার ভার্য্যা রক্ষায় অপারগ, তাহার সহিত কন্যা বিবাহ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। অতএব, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণে বিরত হউন।"

চতুর্থবার দূত আসিয়া রামচন্দ্রের হস্তে এই মর্ম্মের পত্র দিল:—

"মহাশয়, আমি শুনিয়াছি, স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে আপনি তাহার অগ্নি-পরীক্ষা লয়েন। এ বড় কঠিন ব্যাপার। অন্যান্য পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকিলেও অগ্নি পরীক্ষা দিতে আমার কন্যাকে পরামর্শ দিতে পারিব না। সে পরীক্ষা দিতে আমার কন্যাও বোধ হয় সাহসিনী হইবে না। অতএব জানিয়া শুনিয়া, কন্যাকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিতে আমি সম্মত নহি। আপনি অন্য

পাত্রীলাভের চেষ্টা দেখুন।"

পঞ্চম পত্রের মর্ম্মানুবাদ করিলে এই রূপ দাঁড়ায় :—

"মহাশয়, শুনিয়াছি আপনি একজন প্রসিদ্ধ ভূপতি। প্রজারঞ্জন করিবার জন্য আপনার অত্যন্ত যত্ন। কিন্তু তজ্জন্য আপনি যে নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন সে নিয়মে কতদূর কৃতকার্য্য হন বলা যায় না। আপনি কোন বিষয়ের নিন্দা শুনিলেই তাহা পরিত্যাগ করেন। এ নিয়মের অনুসারী হইলে জগতে সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয়। সামান্য নিন্দার ভয় করিলে রাজাকে রাজ্য শাসন করিতে হয় না। সে যাহা হউক, আপনি অগ্নিপরীক্ষা করিয়া লইয়াও সীতার সম্বন্ধে কে কোথায় দুই একটি কথা গোপনে বলে তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে যখন পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন আপনার হস্তে আমার কন্যাকে অর্পণ করা বিধেয় জ্ঞান করি না। বিশেষতঃ আমার কন্যার কিছু চঞ্চল স্বভাব। আপনার হাতে পড়িলে তাহার বনবাস স্থির নিশ্চয়। আপনি যখন নিন্দুকের ফুসফুসনি শুনিয়া সাধ্বী সতীকে বনবাস দেন, তখন আপনার হস্তে আমার কন্যার বনবাস অনিবার্য্য! চিররন-বাসিনী করিবার জন্য আমি কন্যা বিবাহ দিতে পারি না। আপনি স্থানান্তরে বিবাহের চেষ্টা দেখুন।"

এই সমস্ত পত্র পাইয়া রামের বড় ঘৃণা বোধ হইল। তিনি বিবাহের জন্য আর দূত প্রেরণ করিয়া শুদ্ধ গালি খাইতে বিরত হইলেন। রামচন্দ্র জানিতেন না এ সমস্তই বাল্মীকিরই সংঘটন; তিনিই এই সমস্ত গালিপূর্ণ পত্র লিখাইয়াছিলেন। রামকে অন্য দারপরিগ্রহ হইতে নিবারণ করাই এই পত্রাবলির উদ্দেশ্য। বাল্মীকির সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাল্মীকি যে উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা রামায়ণেই বিবৃত আছে। সে সকল কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। যে সকল রাজারা রামকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম ও ধাম আজি জানিবার যো নাই; কারণ, পত্রাবলির সে সকল অংশ কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

শ্রীপূর্ণ

কোন এক সমালোচকের প্রতি।

১

কবির হৃদয় উন্মত্ত জলধি
তরঙ্গে তরঙ্গে তায়।
ত্রিদিব মদিরা বিদ্যুত্ প্রবাহে
উছলি উছলি ধায়॥
ক্ষুদ্র প্রাণী তুমি তুলনায় তাঁর—
বারি বিন্দু সম নহ।
উপহাস কর নহি ক্ষতি তায়
দূরে দাঁড়াইয়া রহ॥
কুলুষিত করি দৃষ্টি পথ তাঁর
সমুখে না রহ আর।
কেবলি মাধুরী ভাসিয়া বেড়াক
নয়নের কাছে তাঁর॥

২

তুমি জড় পিণ্ড সংসারের গাভী
গোশালে তোমার বাস।
কীলকের পাশে রজ্জুর বন্ধনে
বাঁধা রবে বার মাস॥
খাবে খোল খড় কর্দ্দম-পূরিত—
সলিল করিবে পান।
আবদ্ধ চরণে রাখালের ত্রাসে
করিবে দুগ্ধ দান॥
কবি না সুধায় তুমি কেন তবে
বিরক্ত করিছ তাঁকে।
ওই দেখ ফিরি রজ্জু তুলি হাতে
সংসার তোমায় ডাকে॥

৩

ফিরে যাও গাভী আপন গোয়ালে
বন্ধন গ্রীবায় পর।
ভণ্ড শিক্ষা দীক্ষা চর্ব্বণ করিয়া
উদরেতে দুগ্ধ ধর।
পরহিত ভাণ ধরিয়া হৃদয়ে
দ্বিতীয় দধীচি প্রায়।
সংসারের চক্ষে কর ধূলী দান
কবি নাহি দুগ্ধ চায়॥
থাকে পরকাল পাবে পুরস্কার
হবে তথা কল্পতরু।
নিজ কার্য্য ভুলি কাব্যে কেন রত
ওহে সংসারের গোরু?

৪

অবনত স্কন্ধে যাহ যদি কাছে
কবি দিবে বুকে স্থান।
বিদ্যুৎ ছটায় হেরিবে অমরা
অমৃতে পূরিবে প্রাণ॥
নন্দন সৌরভে ভরিবে আঘ্রাণ
চৈতন্য জাগিবে বুকে।
একে একে সেই অমরা মাধুরী
হেরিবে পরম সুখে॥
স্বপনেও যাহা দেখনি কখন
ধরমে—বৈকুণ্ঠ যাহা।
পীযূষে গলিয়া পড়েছে চলিয়া
সমুখে হেরিবে তাহা॥

৫

বিপুল ব্রহ্মাণ্ড আসিয়া নিকটে
সুধাবে অমৃত বাণী।
ঘুচিবে এ ভ্রম গোজন্ম হইতে
মুক্ত হ'বে তব প্রাণী॥
কিবা মায়া দয়া ভক্তি স্নেহ প্রেম
অকূল আকৃতি যার।
কখন হাসিছে কখন কাঁদিছে
নিরখিবে চারিধার॥
জড় কি অজড় ক্ষুদ্র কি মহত
যা কিছু জগতে আর।
হেরিবে সকলি এই সুধা পানে
স্নিগ্ধ করে প্রাণ তার
জলাশয় জলে আনন্দের ভরে
ভাগে যথা জলচর।

কবির হৃদয়ে মাধুরী সাগরে
ভাসে বিশ্ব নিরন্তর॥
এ সুধা সেবিতে থাকে অভিলাষ
যাও অবনত শিরে।
না থাকে সে সাধ সংসারের গাভী
গোশালায় যাও ফিরে॥

শাস্ত্র তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত, বেদ, বেদমূলকস্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, দর্শনশাস্ত্র, বৈদ্যশাস্ত্র, কাব্য নাটকাদি সমুদায়ই শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে কি না? কাব্যাদির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাতে শাস্ত্রের লক্ষণ যাইতে পারে। কারণ, কাব্যাদি পাঠেও অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে। তবে শাস্ত্র বলিলে যে আমরা স্মৃতি বা পুরাণাদি বুঝিয়া থাকি, তাহা কেবল আমাদের সংস্কারের দোষে; অথবা গুরুবাক্যের অনুরোধে তাহাই ধারণা হয়। যাহা দ্বারা শাসন করা হয়, তাহারই নাম শাস্ত্র, ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু শাসন বলিলে, কিরূপ শাসন, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন সুস্থ শরীরে সমস্ত নিয়ম, আচার ও ব্যবহার কার্য্যের প্রবৃত্তি-সম্ভাবিত দেখা যায়, তখন দেহ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় রীতি নীতি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। নতুবা পীড়িত শরীরে কোন নিয়মই সম্ভবপর নহে। বেদের সৃষ্টিকাল হইতে দেখিয়া আসুন, দেখিতে পাইবেন, আশ্রমোচিত আচার ব্যবহার সকল কেবল সুস্থ শরীরেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও আছে—"আতুরে নিয়মোনাস্তি" পীড়িত হইলে কোন নিয়মই থাকে না। সুতরাং শাস্ত্রকার ঈশ্বর হউন, আর মনুষ্য হউন, মনুষ্যের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা সমুদায় শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন।

সমুদায় শাস্ত্রকারের ঐকমত্য থাকাতে কবিকুলশিরোমণি কালিদাস স্বপ্রণীত কুমারসম্ভবে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" অর্থাৎ "শরীর ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায়" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রের মধ্যে লঘু গুরু ভেদ নাই, তাহাও একপ্রকার দেখান হইয়াছে। তবে বচনের একবাক্যতার জন্য কোন বচনের সঙ্কোচ করিতে হয়, কাহারও বা তাৎপর্য্যবশতঃ অর্থের উপলব্ধি করিয়া লইতে হয়। কিন্তু কোন বচনের অশাস্ত্রীয়তা বোধ করিয়া তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞাপ্রকাশ করা উচিত নয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কোন এক পদার্থের পূর্ব্বে একটি বিশেষণ থাকিলে তাহাতে তাহার বস্তুত্বের ন্যূনাতিরেক হয় না সত্য, কিন্তু বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের বোধ হওয়াতে বস্তুর আকৃতি, পরিমাণ, গুণ, ইত্যাদির কিয়ৎ পরিমাণে পার্থক্য উপলব্ধ হয়। "ঘট" বলিলে যাবতীয় ঘট অনুভূত হয়। "নীল ঘট" বলিলে নীলত্বপুরস্কারে অর্থাৎ নীলগুণবিশিষ্ট ঘটের অনুভব হয়। আর "ক্ষুদ্র নীল ঘট" বলিলে ক্ষুদ্রত্ব, নীলত্ব এই দুইটি বিশেষণকে লইয়া তবে ঘটের জ্ঞান হইবে। তদ্রূপ বেদশাস্ত্র বলিলে বেদোক্ত ছন্দ, ঋষি, বিনিয়োগ, দেবতা ও বেদোক্ত কার্য্যকলাপের সহিত বেদ পদার্থের জ্ঞান হইবে। তাহা হইলে একেবারে অকূল সাগরে নিপতিত হইতে হইল। একে বেদজ্ঞান নাই, তাহার উপর ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ জানিয়া বেদজ্ঞান, বেদের অর্থজ্ঞান করিতে হইলে কাযেই সমুদ্রে নিমজ্জন হইল বৈ আর কি বলিব? তবে সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান হওয়া জন্মান্তরীণ সুকৃত-সাপেক্ষ। শুদ্ধ শাস্ত্রপাঠে কোন ফল হয় না। শাস্ত্রপাঠান্তে তাহার অর্থ বোধ হইলে একটু ফল হয়। আবার অর্থ বোধ হইল, কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মে জগত চলিল না, সে পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান হওয়া আর না হওয়া দুইই সমান। শাস্ত্রে আছে—

"শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা নবা॥
নচ শূরো বিজয়াৎ রণাচ্চ পণ্ডিতঃ।
ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ।
হিতপ্রয়োক্তি ভবেদ্বক্তা দাতা সম্মান-
দানতঃ॥"

শত লোকের মধ্যে এক জন বীর পুরুষ জন্মায়, সহস্র লোকের মধ্যে এক জন পণ্ডিত জন্মায়, শতসাহস্রের মধ্যে এক জন বক্তা জন্মায়, কিন্তু দাতা জন্মায় কি না সন্দেহ। আর পরদেশ-লুণ্ঠনে বীর হয় না, কেবল মাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে পণ্ডিত হয় না, বাক্‌পটুতা থাকিলেই বক্তা হওয়া যায় না; এবং অর্থদান করিলেই দাতা হওয়া যায় না। তবে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বীর-পুরুষ; যিনি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্ডিত; যিনি পরের কল্যাণকর কার্য্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ বক্তা; এবং যে ব্যক্তি সম্মান দান করিতে সক্ষম, তিনিই জগতে দাতার অগ্রগণ্য।

দেখুন, এ স্থানে যেমন ক্রমশঃ বীর প্রভৃতির উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ বীর অপেক্ষা পণ্ডিতের, পণ্ডিত অপেক্ষা বক্তার, ও বক্তা অপেক্ষা দাতার সম্মান সংসূচিত হইয়াছে, তদ্রূপ কেবল মাত্র বেদপাঠ অপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞানের, এবং অর্থজ্ঞান অপেক্ষা বেদোক্ত কার্য্যের আচরণের উত্তরোত্তর মাহাত্ম্য নিরূপিত হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলে অনেকে বলিবেন, যখন শাস্ত্র বলিতে পৃথিবীর সমুদয় শাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে, তখন কোরাণ, বাইবেল্ ইহাদের মতানুসরণে দোষ কি? দোষ বলিলে পূর্ব্বে শাস্ত্রের যে লক্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে দোষ পড়ে।

আমরাও একথা স্বীকার করিয়া থাকি। যবন শাস্ত্র আমাদের মতে অশাস্ত্র হইলেও, হিন্দুশাস্ত্রের পরম শত্রু হইলেও, তাহাদের দেশীয় লোকের পক্ষে যে তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বররাজ্যে যত লোক বাস করে, তাহাদের শাসনসম্বন্ধে একখানি পুস্তক থাকিলে, কি একখানি মাত্র শাস্ত্র দ্বারা জগন্নিবাসী সর্ব্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, ও সর্ব্বজাতীয় মানবমণ্ডলী পরিচালিত হইলে কখন এই বিশ্বসাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা, প্রণালী বা অঙ্গসৌষ্ঠব নিরাপদে থাকিতে পারিত না। পৃথিবীতে যে পরিমাণে মানবের বাস, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এখন বর্ত্তমান যত প্রকার শাস্ত্র আছে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক হইলে ভাল হইত। প্রবৃত্তি লইয়া শাস্ত্রের ফলাফল, গুণাগুণ পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতের কথা লইয়া আমেরিকায় যাইয়া তাহা দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে শিক্ষিত, চালিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্ত করিতে হইলে পরমেশ্বরের মত এক জন বহুদর্শী, বায়ুর মত একজন সর্ব্বত্রসঞ্চারী, আকাশের মত এক জন বৃহৎ যুবা পুরুষকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইত। তবে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার পক্ষে এখনও আমেরিকার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম সমভাবেই আছে। তাহার কাছে চিরকালই জাতিভেদ নাই; চিরদিনই সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া থাকে। হোটেলে আহার করিবার সময়, মদ্যপান করিবার কালে, মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার বা প্রবঞ্চনা করিবার সময় ভেদাভেদ নাই স্বীকার করিব, আর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের আচার, সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, অতিথিসেবা, করিতে হইলে মনুকে "Damn the Manu" বলিব।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি
শান্ত উপাসীত।" ৩।১৪।১।

এই দৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়। কারণ, তজ্জলান্ অর্থাৎ তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, তাঁহাতেই লীন হইবে, এবং তাঁহা হইতে বাঁচিয়া থাকে। জন্ ধাতু হইতে জ, লী ধাতু হইতে ল, ও অন্ ধাতু হইতে অন্—তাহাতেই 'তজ্জলান্,' এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব শমগুণাবলম্বী হইয়া সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। অন্য উপনিষদে আছে—

"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মনুপশ্যতঃ।"

যে ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত সমস্ত বস্তুর অভেদ দর্শন করেন, তাঁহার তদবস্থায়

কি শোক, কি মোহ, কিছুই থাকে না। অন্য উপনিষদে আছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-
সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

যাহা হইতে স্থাবর জঙ্গম, কীটপতঙ্গাদি দৃশ্যমান সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই যাহাদ্বারা বাঁচিয়া থাকে, ধ্বংস বা বিনাশ কালে সকলেই যাহাতে লীন বা প্রবেশ করিয়া থাকে, তুমি সেই পদার্থকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম। হে শ্বেতকেতো! আর সেই পরব্রহ্ম তুমিই হইতেছ।

কিছুই জানিলাম না, বেদের অধিকারী হইলাম না, বেদাধ্যয়ন করিলাম না, বেদের অর্থজ্ঞান সুতরাং হইল না, তথাপি আমি সমাজে নয়ন নিমীলিত করিয়া 'সোঽহং' বলিয়া একেবারে ব্রহ্মপদ পাইলাম। এরূপ দুরাশার শাস্তি অবশ্যই ভাণ ব্রাহ্মদের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকে, নয় হইবে, ইহা অবশ্য বলিতে পারা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সর্ষপ দিয়া ভূতাপসরণ করা যাইবে, সেই সর্ষপ এখন ভূতাভিভূত। এ কথা নির্দ্দেশ করিলেও কোন সবিশেষ ফলোদয় হইবে না।

তবে আমাদের সদুপদেশ শুনিয়া যাঁহারা হুঙ্কার বা গর্জ্জন করিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা গরুড়পুরাণের নিম্নলিখিত এই কবিতাটি শুনাইব। যথা—

"গুরুং হুঙ্কৃত্য তুঙ্কৃত্য বিপ্রং
নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে জায়তে ব্রহ্ম-
রাক্ষসঃ॥" ২।৫।২১।

যিনি গুরুকে হুঙ্কার ও তুঙ্কার (তুই তুকারি) করিয়া, কিম্বা বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করেন, তিনি জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আমরা হিন্দুশাস্ত্রের অনুগামী, পরকালে বিশ্বাস আছে, পরজন্ম স্বীকার করিয়া থাকি, সুতরাং উপদেশ অমান্য করিলে গুরুকে অমান্য করা হইবে, তাহাতে ব্রহ্মরাক্ষস হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এই কারণে দেশবিশেষে শাস্ত্র পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে
মহামুনে।
যতোহি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা
ভোগভূময়ঃ॥"

সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। কারণ, ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য সমুদায় ভোগভূমি।

"অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি
সত্তম।
কদাচিৎ লভতে জন্তুর্মানুষ্যং
পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥"

মহস্র সহস্র জন্মের পর, অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলে, কখন অতিকষ্টে এই ভারতবর্ষে প্রাণিবর্গ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণের এই সুধাময় সুললিত বচনটী শুনিলে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হয়। কারণ, ভারতভূমি অতিপবিত্র ও রমণীয় স্থান, স্বর্গ এবং মোক্ষের একমাত্র আস্পদ। দেবত্ব না থাকিলে পুনরায় কখন এস্থানে মনুষ্য হইয়া জন্মলাভ করা যায় না। অতএব যাঁহারা এরূপ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে জন্ম লাভ করেন, তাঁহারা ধন্য। এই স্থান ভিন্ন আর কোন স্থানে দেবতারা সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন না। যেরূপ জল, মৃত্তিকা, ঋতু, ও অন্যান্য নবীন উপাদানে ভারত রচিত হইয়াছে, এরূপ আর কোন স্থানে দেখা যায় না। সুতরাং ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রক্ষার্থে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। পাঠক! অনুগ্রহ করিয়া অপরাধ লইবেন না।

মনু বলিয়াছেন—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং
প্রচক্ষতে।" ২।১৭।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদীর যে মধ্যস্থান, সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥"
মনু।২।১৯।

কুরুক্ষেত্র, মৎস্যদেশ, কান্যকুব্জ ও মথুরা দেশ, ইহাদিগকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন।

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্
বিনশনাদপি।
প্রত্যাগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ॥" মনু।২।২১।

উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হিমালয়, দক্ষিণদিগবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল, এই উভয়ের যে মধ্যস্থান, আর সরস্বতী নদী যে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহার যে পূর্ব্বভাগ, আর প্রয়াগের যে পশ্চিম ভাগ, তাহার নাম মধ্যদেশ।

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু
পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদু
র্বুধাঃ।।" মনু।২।২২।

পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের যে মধ্যস্থান পণ্ডিতেরা তাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশ
স্তুতঃপরঃ।" মনু।২।২৩।

যে দেশে কৃষ্ণসার হরিণ স্বভাবতঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সেই দেশই যজ্ঞের উপযুক্ত দেশ। তদ্ব্যতীত অন্য সমুদয় দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলা যায়।

এক্ষণে সকলে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের, আর দেশ সম্বন্ধে মনুর, এই কয়টী বচনের অভিপ্রায় দেখিয়া বিবেচনা করুন, ভারতবর্ষ কিরূপ পূত ও রমণীয় স্থান, ইহার মত আর কোন স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আস্পদ স্বরূপ পুণ্যভূমি আছে কি না সন্দেহ। ভারত ভিন্ন আর কোন দেশে যে তপস্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা তত্তৎদেশের এক একটী ঈশ্বরদত্ত অনিবার্য্য (শীত ও সমধিক উত্তাপ প্রভৃতি) প্রতিবন্ধ দেখিলেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। এই জন্যই ভারতকে স্বর্গ বলিতে ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণসার হরিণ স্বভাবতঃ সঞ্চরণ না করিলে যদি সেই দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিতে হয়, তবে আমাদের এই মনুবচনের প্রবল উদাহরণে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশ কাল পাত্রানুসারে, শরীরের স্বচ্ছন্দতার অনুরোধে মনুষ্য-প্রকৃতি এক হইলেও দেশের জল, বায়ু, খাদ্য পান দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়াছে, এবং দেশভেদে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের, পরিচ্ছদের, খাদ্যের, ধর্ম্মের নূতন নূতন আকৃতি সংস্থাপন করা হইয়াছে। এই কারণে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া পাশ্চাত্যেরা এবং পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আচার ব্যবহারের ও ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয়েরা কখনই এক দিন চলিতে পারিবে না। চলিলে স্বভাবলঙ্ঘন শাস্তিকে লিপ্ত হইয়া শীঘ্র মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

অনেকে বলিবেন, ঈশ্বর এরূপ বিসদৃশ পদার্থের সৃষ্টি করিলেন কেন? তবে অবশ্য ঈশ্বর পক্ষপাতী। নতুবা অন্য দেশে কৃষ্ণসার হরিণ সঞ্চরণ করেনা কেন? তাহারই বা কারণ কি? তবে অন্য দেশে যাহারা বাস করে, তাহারা কি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবে না?। তখন আর এরূপ পক্ষপাতী শাস্ত্রের পক্ষপাতী আচার ব্যবহারের অনুসরণ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করাতে, অথবা ঈশ্বরকল্প মনু, পরাশর, বেদব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের শাস্ত্রীয় নিয়মের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে, আর একটী নূতন দোষের অনুশীলন করা হয় মাত্র। প্রথমতঃ শাস্ত্রজ্ঞান নাই, বুঝিবার শক্তি অতি অল্পই আছে অথচ মনুর শাস্ত্র অগ্রাহ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সদ্‌বুদ্ধি হারাইয়া অসদ্‌বুদ্ধির সাহায্যে যাহাতে শাস্ত্রীয় নিয়মের কোনরূপ প্রমাদ বা ত্রুটি বাহির করিতে পারা যায়, তাহার জন্য লোকে ব্যস্ত। এই খানেই জানিতে হইবে, ধর্ম্মজ্ঞান, ঈশ্বরবিশ্বাস, আস্তিক্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত না হইয়া,

তাহার পরিবর্ত্তে হিন্দুশাস্ত্রের উপর অনাস্থা প্রকাশ করা যে ভগবানের অনভিপ্রেত, বা তাঁহার আশীর্ব্বাদের বিরুদ্ধকার্য্য, তাহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহাই পাপপুণ্যের ভোগ।

"বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাব-সেৎ॥" মনু।৩২।

স্বকীয় বেদশাখার অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, নয় বেদের তিনটী শাখা, নয় বেদের দুটী শাখা, না হয় বেদের একটী মাত্র শাখা, মন্ত্র ব্রাহ্মণ ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সকল অনুষ্ঠান করিবেক। স্নাতক ব্রহ্মচারী এইরূপ কার্য্য করিলে তাহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হয় না।

মনু এস্থানে কতদূর করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিতে না পার, স্বকীয় বেদশাখার একটী মাত্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। এরূপ ব্যবস্থা কি কৃপাপ্রদর্শন নহে? ইহাতেও আমরা মনুর উপর-খড়্গ-হস্ত। কারণ, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা মনুতে দেখা যায় না কেন?।

অবস্থানুসারে শাস্ত্রের অবস্থাও পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কামধেনু হিন্দুশাস্ত্রের, বা হিন্দুধর্ম্মের যথাযোগ্য নিয়ম পালন করিতে যখন আমরা কাতর হইলাম, এত সুবিধা সত্ত্বেও যখন আমরা শাস্ত্রীয় ব্যবহারের উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তখন আর কোন্ শাস্ত্রে এরূপ সরল, পবিত্র, যথাযোগ্য নিয়মাবলী আছে যে, তাহা আমরা প্রতিপালন করিতে পারিব। কিন্তু শাস্ত্রদ্বেষী পামরেরাও যে হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহাতে আর সংশয় নাই।

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ) ৪।২।৩৯।

এই মহর্ষিগণ (সপ্ততারা) যখন মঘা-নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, এবং অকৃত্রিম ক্ষত্রিয় নন্দরাজের যখন সমূলে উচ্ছেদ হইবে, তখনই কলিবৃদ্ধি পাইবে।

"যদা যদা সতাং হানি র্বেদমার্গানুসারিণাম্।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয়! পণ্ডিতৈঃ॥"
—(বিষ্ণুপুরাণ। ৬।১।৪৫।)

হে মৈত্রেয়! যখন যখন দেখিবে যে, বেদমার্গানুসারী বৈদিক পণ্ডিতগণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যখন দেখিবে ধার্ম্মিক পুরুষদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপক্রম বিফল হইয়া যাইতেছে, তখনই পণ্ডিতগণ অনুমান করিবেন যে, কলির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

"কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দেবৈঃ কিং শৌচেনাত্মজন্মনা।
ইত্যেবং বিপ্র! বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপ-হতা নরাঃ॥ ৪৯॥
স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র! প্রাপ্তে কালৌ যুগে॥ ৫০॥
শাণপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ ৫১॥
অণুপ্রায়াণি ধান্যানি অজাপ্রায়ং তথা পয়ঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উশীরং চানুলেপনম্॥ ৫২॥
শ্বশ্রূশ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ।
শ্যালাদ্যা হারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তম॥ ৫৩॥
কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মাত্মকঃ পুমান্।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ॥ ৫৪॥
বাঙ্মনঃ কায়িকৈর্দ্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ।
নরাঃ পাপন্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্প-মেধসঃ॥ ৫৫॥
নিঃসত্ত্বানামশৌচানাং নিঃশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্।
যদ্ যদ্ দুঃখায় তৎ সর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি॥ ৫৬॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বহাবিবর্জ্জিতে।
তদা প্রবিরলো বিপ্র! কচিল্লোকো নিবৎস্যতি॥ ৫৭॥"
(বিষ্ণুপুরাণ।৬।১।)

হে বিপ্র! বেদে কোন ফল নাই, ব্রাহ্মণেও কোন ফল নাই, দেবতা থাকিলেই বা কি? না থাকিলেই বা কি? জলদ্বারা যে শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাও বৃথা। পাষণ্ড পামরেরা কলিকালে এই কথাই মুখ দিয়া বলিবে। ৪৯।

মেঘে জল বর্ষণ হইবে না, শস্যের ফল অতি অল্প হইবে, যাহাও ফল হইবে, তাহার সারভাগ অতি অল্প। হে ব্রাহ্মণ! কলিযুগে প্রায়ই শস্যাদির এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।৫০।

পাট শোণ ইহা দ্বারাই বস্ত্র নির্ম্মিত হইবে। প্রায় সমস্ত বৃক্ষ শমীবৃক্ষের মত নিষ্ফল ও অকর্ম্মণ্য হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য উঠিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সকল বর্ণই শূদ্রবর্ণের সদৃশ হইবে ৫১।

কলিকাল উপস্থিত হইলে ধান্য সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইবে। একটি অজার যতটুকু দুগ্ধ হয়, গাভি সকল সেইরূপ অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দান করিবে। বীরস বৃক্ষের মূল স্নিগ্ধতার জন্য গাত্রে অনুলেপন করা হইবে। ৫২।

হে মুনিবর! কলিকাল উপস্থিত হইলে গুরুলোক কেবল শ্বশুর ও শ্বশ্রূ। শ্যালক তৎকালে বন্ধু হইবেন। ৫৩।

যখন একজন মনুষ্য কোন একটী

কার্য্য করিবেন, তখন যে সকল মানব শুভরেই একান্ত অনুগত, তাহারা বলিবে, কাহারই বা মাতা, কাহার বা পিতা। ৫৪

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যগণ বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা উপার্জ্জিত দোষ রাশি দ্বারা বারম্বার অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ কেবল পাপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে। ৫৫।

যাহাদের বলবীর্য্য নাই, যাহারা শৌচকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, যাহাদের কোন সৌন্দর্য্য থাকিবে না, এইরূপ মনুষ্যদের দুঃখের জন্য যে যে বস্তু আছে, কলিকালে তৎ সমুদয় বস্তুর কোন অভাব থাকিবে না। ৫৬।

হে বিপ্র! কলিকালে কেহ বেদপাঠ করিবে না—কেহ বষট্কার উচ্চারণ করিবে না—কেহ পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের উপলক্ষে স্বধা মন্ত্র বলিবে না—দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতি দিবার জন্য স্বাহা মন্ত্রের উচ্চারণ করিবে না। তৎকালে উত্তম লোকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। ৫৭।

(ক্রমশঃ)

ভগবদ্গীতা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

কেহ কেহ বলেন, ভগবদ্গীতার সমাদর এই জন্য যে, ইহাতে অনেক মহার্ঘ উপদেশ নিহিত আছে। সেই মহার্ঘ উপদেশের মধ্যে তাঁহারা ইন্দ্রিয় ও রিপু শাসনের কথা প্রধানতঃ উল্লেখ করেন। ভগবদ্গীতায় ইন্দ্রিয় ও রিপু শাসনের কিরূপ উপদেশ আছে, তাহা আমরা এই প্রস্তাবে বিচার করিব। আমাদের সিদ্ধান্ত এই, ইন্দ্রিয় ও রিপু শাসনের উপদেশ দিবার জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি নহে। পরন্তু অর্জ্জুনের রিপুকে উত্তেজিত করাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। সুতরাং রিপুশাসনের উপদেশ সে স্থলে উপযুক্ত নহে। অর্জ্জুন নিজে, সাত্ত্বিকভাবে অনুশাসিত হইয়াই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সে সময়ে আবার শাসনের উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং, সামান্যতঃ প্রতীত হয়, ইন্দ্রিয় ও রিপু শাসনের উপদেশ ভগবদ্গীতা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমরা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়াও এ কথা প্রতিপাদন করিব। আমরা ইন্দ্রিয় ও রিপু শাসনের কর্ত্তব্যতাকে অতি সামান্য ও সহজ জ্ঞান বলি, এবং তাহা ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মমুক্ষু যোগী হইতে বলিতে-

ছেন*। কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় সোহং জ্ঞান ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ। "কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত ক্লেশ পঞ্চককে দগ্ধ বীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলিতে হয়। নচেৎ উহারা অনর্থ আনয়ন করিবে। উহারা যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই অনর্থ। সুতরাং অগ্রে উহাদিগকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা তনুকৃত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে হইবে; পশ্চাৎ যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তের ক্লেশ নামক ধর্ম্মগুলি দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়।" ক্লেশ কি, পতঞ্জলি তাহা বলিতেছেন :—

"অবিদ্যাস্মিতরাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"

অজ্ঞানতা বা মোহ, আত্মাভিমান, সুখের প্রতি আসক্তি, দুঃখের প্রতি বীতরাগ, এবং মরণের প্রতি দ্বেষ—এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ সমুদয় বিষয়বাসনা ও ইন্দ্রিয়-ভোগের মূলাধার। বিষয়-বাসনা ও ইন্দ্রিয়-ভোগে লিপ্ত হইলে কখন যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইতে হইলে চিত্তকে একেবারে নিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভক, অজেয় ও দুর্ভেদ্য, *। এই দুর্নিগ্রহ মনকে নিগৃহীত করিবার উপায় কৃষ্ণ বলিয়া দিতেছেন।

"হে অর্জ্জুন, চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগলাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট; যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ (ক)। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদেও চিত্ত-নিরোধের উপায় স্বরূপ কথিত হইয়াছে :—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ।১২।

এই বৈরাগ্য বড় দুরূহ ব্যাপার। যোগে চারি প্রকার বৈরাগ্যের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থা যতমান,

---

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানি-
ভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী
ভবার্জ্জুন। ৪৬।
—ভ, ৬, অ।

* ভগবদ্গীতায়ও ইহা উক্ত হইয়াছে :—
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব
সুদুষ্করং। ৩৪।
—ভ, ৬, অ।

(ক) অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহ-
চঞ্চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ
গৃহ্যতে। ৩৫।
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি
মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তু-
মুপায়তঃ। ৩৬।
—ভ, ৬, অ।

দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয়, চতুর্থ বশীকার। "চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান নামক বৈরাগ্য এবং তাহাই বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ আসক্তি সজীব রহিল, ইহা বাছিয়া সজীব আসক্তি গুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক বৈরাগ্য। ক্রমে যখন দেখিবে সকল আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, মনে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য মাত্র আছে, তখন জানিবে যে একেন্দ্রিয়-নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। যখন ঐ ঔৎসুক্য পর্য্যন্ত থাকিবে না, তখন জানিবে বশীকার অবস্থা জন্মিয়াছে, এই বশীকার যখন দৃঢ় হয় তখন পর-বৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পর-বৈরাগ্য যোগলাভের অসাধারণ উপকরণ।"

এই বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তমধ্যে কামক্রোধাদি রিপু লয় প্রাপ্ত হয়। এই বৈরাগ্য অভ্যাস করিবার জন্য যোগী একাকী নির্জ্জনে নিরন্তর অবস্থান করেন। বিষয় পাছে তাঁহাদিগের মনকে এবং ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ করে, তজ্জন্য তাঁহারা বিষয় হইতে দূরে যান। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া যোগীরা নির্জ্জনে অবস্থান করেন। কামক্রোধবিহীন না হইলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। এই চিত্তশুদ্ধিলাভ করিবার জন্য যোগীরা কামক্রোধাদি রিপুগণকে একেবারে দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ—

"কামক্রোধবিহীন শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী লোকগণের কি জীবদ্দশা কি মরণদশা সর্ব্বকালেই ব্রহ্মভাব সমান থাকে। বিষয় সকল বস্তুত বহিঃস্থিত কিন্তু চিন্তা করিলে অন্তরে প্রবেশ লাভ করে, অতএব সেই চিন্তা ত্যাগ দ্বারা বিষয় সকলকে বহির্গত করিবে এবং নয়ন মুদ্রিত করিলে পাছে নিদ্রাভিভূত হইতে হয়, আর তাহা উন্মীলিত রাখিলে পাছে বিষয়েতে দৃষ্টি হয়, এজন্য সেই দোষ পরিহারার্থ ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নাসিকার মধ্যে গমনশীল প্রাণাপান বায়ুকে রুদ্ধ করিবে। এইরূপে যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে বশীভূত করেন এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মোক্ষ চিন্তায় নিরত থাকেন তিনিই মুক্তিলাভ করেন। কেবল ইন্দ্রিয় দমনে মোক্ষ হয় না, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা হয় *।

* কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং। ২৬।
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। ২৭।

অনাত্রঃ—

"জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্র মনে পবিত্র স্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন, ও বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত অনতি উচ্চ, অনতিনীচ, স্থিরতর আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে উপ-বেশন, শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম ও সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।"(ক)

"যখন বশীভূতচিত্ত সর্ব্ব প্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠান কালে নির্বাত, নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ। ২৮।
—ভ, ৫, অ।

(ক) শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন-মাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরং। ১১।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে। ১২।
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চান-বলোকয়ন্। ১৩।
—ভ, ৬, অ।

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাতেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র-লভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচালিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ; তাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই; তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্য-বসায় সহকারে ও নির্ব্বেদ শূন্যচিত্তে অভ্যাস করিবে। সংকল্পসমুৎপন্ন কামনা সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদায় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল-স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে তাহারে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। (খ)"

(খ) যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাব-তিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা। ১৮।

ইহাতে প্রতীত হইতেছে, কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যোগোক্ত মোক্ষধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন। "ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস, এই ত্রিবিধ আশ্রমনিয়মই

যথা দীপো নিবাতস্থোনেঙ্গতে
সোপমাস্মৃতাঃ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো
যোগমাত্মনঃ।১৯।
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং
যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি
তুষ্যতি।২০।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্য মতী-
ন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি
তত্ত্বতঃ। ২১।
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে
নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি
বিচাল্যতে। ২২।
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং
যোগসংজ্ঞিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগো-
নির্ব্বিণ্ণ চেতসা। ২৩।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা
সর্ব্বানশেষতঃ।
মন সৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য
সমন্ততঃ। ২৪।
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যাধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি-
চিন্তয়েৎ। ২৫।
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল-
মস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং
নয়েৎ। ২৬।
ভ, ৬, অ।

মোক্ষধর্ম্মসাধক।" (ক) যোগী সংসারাশ্রম-বিবর্জ্জিত হইয়া মন হইতে সমুদায় বিষয় দূর করিয়া দিবেন। সংসারীর পক্ষে মোক্ষসাধক যোগধর্ম্ম কখনই উপযুক্ত নহে। এই জন্য আমরা বলিয়াছি যোগপথ ও ভোগপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসারীর গার্হস্থ ধর্ম্ম যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার পক্ষে যোগধর্ম্ম কখনই ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইবে না। সংসারীর ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মের অঙ্গ হয়, এবং ভগবদ্গীতায় যদি কৃষ্ণ যোগধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, ভগবদ্গীতায় ধর্ম্মের পূর্ণ অবয়ব প্রকাশিত হয় নাই।

যোগোক্ত মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী হইলে কিরূপ বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা আরও দেখাইয়াছি, এই বৈরাগ্যলাভের জন্য মনকে ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে একেবারে নিগৃহীত করিতে হয় এবং ক্রোধাদি রিপুগণকে একেবারে দমন ও বিলীন করিতে হয়। রিপুগণ চিত্তমধ্যে একেবারে না স্থান প্রাপ্ত হয়, কোন মতে তাহাদিগের উদ্রেক না সম্ভব হয়, এরূপ না করিতে পারিলে যোগ অভ্যাস হয় না। কিন্তু সংসারী ও ভোগীর পক্ষে এ নিয়ম বিধেয় নহে। রিপুগণ না থাকিলে কোন কার্য্য হয়

(ক) মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতা পর্ব্বের পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়ে কৃষ্ণই এ কথা বলিয়াছেন।

না। ইন্দ্রিয়-বিষয় ভোগ না করিলে সংসারী ভোগীর কিছুতেই সুখ নাই। কামক্রোধ একেবারে পরিত্যাগ করা, এবং যথাবিধি শাসনে রাখিয়া তাহাদিগের স্ফূর্ত্তি হইতে দেওয়া সমান কথা নহে। একেবারে বিনাশ করা, আর শাসন করা, এই দুই স্বতন্ত্র কথা। ইন্দ্রিয়গণকে যথাবিধি শাসনে রাখিয়া তাহাদিগকে বিষয়সুখে লিপ্ত করা, আর তাহাদিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা, এই দুই স্বতন্ত্র কথা। যোগধর্ম্মে ক্রোধাদি রিপুগণকে একেবারে বিনাশ করিতে বলে, এবং ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে বিষয় হইতে নিগৃহীত করিতে বলে। কৃষ্ণ যদি ভগবদ্গীতায় যোগধর্ম্মোক্ত মুক্তি লাভের উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই মোক্ষসাধক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং চিত্তনিরোধেরও অবশ্য উপদেশ দিয়াছেন। দিয়াছেন কি না, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি।

যাঁহারা বলেন, বাসুদেব ভগবদ্গীতায় ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে শুদ্ধ শাসনে রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র ভগবদ্গীতার উপদেশ উপলব্ধি না করিয়া সেরূপ কহিয়া থাকেন। বাসুদেব যদি যোগোক্ত মুক্তির উপদেশ দিয়া থাকেন তবে তিনি কখনই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের শাসন করিবার কথা বলেন নাই। কারণ, সেরূপ করিলে আত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়, ইন্দ্রিয় ও রিপুর শাসন নহে, তাহাদিগকে একেবারে দমন ও নিঃশক্তি না করিতে পারিলে কখন চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্য ঘটে না। অতএব যাঁহারা বলেন, বাসুদেব ভগবদ্গীতায় ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের শাসন করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা ভগবদ্গীতার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নহেন। দুই এক শ্লোকে, দুই একটি শ্লোককে বিচ্ছিন্ন ভাবে লইয়া তাঁহারা সেইরূপ অর্থ ঘটান মাত্র, নহিলে সমগ্র গ্রন্থের ভাবগ্রাহী হইলে কখনই সেরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইতেন না।

যোগোক্ত মুক্তিলাভের পথ বড় কঠিন। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী হইলে সেই মুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। মুক্তি কি—আত্মার বন্ধন হইতে মুক্তি। আত্মা কি—পরমাত্মার অংশই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা নিজ কর্ম্মের ফলভোগহেতু সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই কর্ম্মফল হেতু তাহাকে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহারই নাম কর্ম্ম-বন্ধন। যোগ, এই বন্ধন ছেদন করিয়া আত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলাইয়া দেয়। আত্মা বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। আর তাহাকে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না। কিরূপে এই মুক্তি সাধিত হয়, কিরূপে আত্মার কর্ম্মফল সকল বিনষ্ট হইয়া তাহা বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, যোগ তাহারই উপায় মাত্র

নির্দ্দেশ করে। কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাস ও জ্ঞান-যোগ সাধন করিতে হয়। জ্ঞান-যোগ সাধন করিলে কি হয় ভগবদ্গীতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে।" (ক) অন্যত্র :—

"আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না, এবং তাঁহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।" (খ) আর এক স্থলে :—

শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মন দ্বারা তাবৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে বসতি করেন এবং আমি করি, আমি করাই, তাঁহার এ প্রকার অভিমান থাকে না অতএব তিনি স্বয়ং বা অন্যকে দিয়া কিছুই করেন না।"(গ) আরও এক স্থলে :—

"কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি না হইলে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না, অতএব হে কৌন্তেয়, কর্ম্মযোগ ব্যতীত যে কর্ম্মসন্ন্যাস সে কেবল দুঃখের কারণ; কিন্তু কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মুনি চিত্তশুদ্ধির পর কর্ম্মত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মেতে লীন হন।(ঘ)

এই রূপে কর্ম্মফল বিনষ্ট করিবার জন্য যোগীরা কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জ্ঞানযোগ দ্বারা তাঁহারা কর্ম্ম-বীজ ভস্মীভূত করেন। জিতেন্দ্রিয় যোগী

(ক) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।৩৭।
—ভ, ৪, অ।

(খ) যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ১৭।
নৈব তস্য কৃতে নার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ।১৮।
—ভ, ৩, অ।

(গ) সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যাস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্। ১৩।
—ভ, ৫, অ।

(ঘ) সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু-মযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধি-গচ্ছতি। ৬।
স্বামিকৃত টীকা।
* * * *। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞান-নিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ত-তয়া মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বাঽচিরেণ ব্রহ্মা-ধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি অতশ্চিত্ত-শুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সংন্যা-সাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধতি।
—ভ, ৫, অ।

এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন এবং চিত্তশুদ্ধি সাধন করিবার জন্য মন হইতে রিপু সকলকে একেবারে তাড়াইয়া দেন। তিনি কর্ম্ম যোগ অভ্যাস করিয়া ক্রমে কর্ম্মসন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করেন, তৎপরে জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই মোক্ষলাভ কাহার পক্ষে সহজ হয়, কাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়।

ভগবদ্গীতায় যোগপথ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় যাহা বাস্তবিক আছে, তাহা প্রদর্শন করিলাম। বিষয় বিচার করিলেও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কৃষ্ণ যদি ভগবদ্গীতায় যোগোক্ত মোক্ষলাভের উপদেশ দিয়া থাকেন তবে তিনি কখনই ইন্দ্রিয় এবং রিপুসেবার পরিমাণ অথবা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন না। পরিমিত ইন্দ্রিয় এবং রিপুসেবা করিয়া কখন কর্ম্মসন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সেই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে একেবারে নিগৃহীত করিতে না পারিলে, এবং রিপুগণের উদয় সম্ভাবনার একেবারে বিনাশ সাধন না করিতে পারিলে কর্ম্মযোগী ও সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। ভগবদ্গীতায়ও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগীর জিতেন্দ্রিয়তার অর্থ নয়—ইন্দ্রিয়-শাসন; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ নিগ্রহ, প্রত্যাহরণ, অথবা দমন। যোগীর জিতচিত্তের অর্থ নয়—রাগ-দ্বেষাদির শাসন, কিন্তু রাগ দ্বেষাদির সম্পূর্ণ পরিহার। এই প্রকার ইন্দ্রিয় ও রিপুর দমন মোক্ষ-ধর্ম্মের উপযোগী। ইন্দ্রিয় ও রিপুর শাসন মাত্রে যখন কর্ম্মফল বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা মোক্ষ পথের উপযোগী নহে। সুতরাং প্রতীত হইতেছে, ভগবদ্গীতায় যে যে স্থলে জিতেন্দ্রিয়তার কথা উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের শাসন নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ দমন; এবং যে যে স্থলে চিত্তশুদ্ধি অথবা চিত্ত-সংযমের কথা আছে, তাহার অর্থ রাগদ্বেষাদির যথোচিত শাসন নহে, কিন্তু একেবারে রাগ দ্বেষাদির সম্পূর্ণ ধ্বংস ও পরিহার। যাঁহারা উহাদের অন্য অর্থ করেন, তাঁহারা যোগ ধর্ম্ম এবং সমগ্র ভগবদ্গীতার মর্ম্ম না বুঝিয়া সেরূপ অর্থ করেন। তাঁহারা নিজে সংসারী ও ভোগী, সংসারীর পক্ষে ইন্দ্রিয় ও রিপু-গণের শাসন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা সেই সংস্কারে নীত হইয়া ভগবদ্গীতারও উপদেশ ইন্দ্রিয় ও রিপু-শাসন বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃত অর্থগ্রহণে তাঁহারা সমর্থ হয়েন না।

কৃষ্ণ, ইন্দ্রিয় ও রিপুশাসনের কর্ত্তব্যতা ভগবদ্গীতায় শিক্ষা দিয়াছেন;—এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায় যে সংসারীর পক্ষে ইন্দ্রিয় ও রিপুশাসনের কর্ত্তব্যতা অতি সামান্য শিক্ষা। ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণকে শাসন করা যে কর্ত্তব্য তাহা সংসারীর আবালবৃদ্ধ, ভদ্রাভদ্র

সকলেই জানেন। কার্য্যগতিকে তাহা জানিতে হয়। এ উপদেশ কাহাকেও দিতে হয় না। এ জ্ঞান মাতৃ-অঙ্কার্জ্জিত বলিলেও বলিতে পারা যায়। কি ইতর, কি ভদ্র, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেরই এ জ্ঞান আছে। পরিমিত ভোজনের কর্ত্তব্যতা যেমন কাহাকে শিখাইতে হয় না, পরিমিত ইন্দ্রিয় ও রিপুসেবার কর্ত্তব্যতাও কাহাকে শিখাইতে হয় না। আমি এমত কথা বলি না যে, এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানে পরিচালিত হইয়া সকলেই তদনুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন। সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞানের যে দশা, এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানেরও সেই দশা। জ্ঞান থাকিলেই যে লোকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে, সকল অবস্থায়, সকল সময়ে এবং সকল লোকে তাহা ঘটে না। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বসাধারণে কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া যে, তাহারা সেই জ্ঞান বিরহিত, এমত সপ্রমাণ হয় না। মানুষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেই যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান আপনাপনি জন্মায়, যাহার অর্জ্জন জন্য গুরুর উপদেশ আবশ্যক করে না, সে কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে অতি সহজ ও সামান্য বলিতে হইবে; এবং যে গ্রন্থ শুদ্ধ সেই জ্ঞান দিবার জন্য দশ পাত লেখে, সে গ্রন্থের মূল্য আমরা অধিক জ্ঞান করি না। ইন্দ্রিয় ও রিপুশাসনের কর্ত্তব্যতা একটি মহার্ঘ জ্ঞান নহে, এবং তাহা শিখাইবার জন্য এক জন দেবতা অথবা মহাগুরুর আবশ্যক করে না। যে গ্রন্থে এই জ্ঞানের উপদেশ দেয়, তাহা মহা ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। এমত সহজ ও সামান্য জ্ঞানের উপদেশ দিবার জন্য কৃষ্ণ যোগতন্ত্রের আশ্রয় লয়েন নাই। এই সামান্য জ্ঞান দিবার জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি নহে। যাঁহারা এই জ্ঞান ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধার করিতে চান, তাঁহারা কতদূর কুসংস্কার-চালিত, তাহারই পরিচয় মাত্র দেন।

হা কৃষ্ণ, হা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রতিমা, তোমার মুখে জিতেন্দ্রিয়তার উপদেশ শুনিলে বাস্তবিক হাসি পায়! যিনি দ্বারকার রাজা-সুখে নিমগ্ন থাকিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টমহিষী ব্যতীত ষোড়শ সহস্র উপপত্নী যাহার সেবায় অহরহ নিযুক্ত ছিল, যাহার রাজ্যে ও রাজ-সংসারে রাত্রিদিন নৃত্যগীত ও সুরাপান চলিত, সেই দ্বারকা-রাজ-মুখে ইন্দ্রিয়-সংযমের উপদেশ? এই দেখুন, দ্বারবতী নগরের এবং ইন্দ্রিয়-সুখসেব্য শত-প্রাসাদ-পরিশোভিত রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন "হরিবংশে" কেমন বর্ণন করিতেছেন:—

"অনন্তর কৃষ্ণ স্বীয় বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ হইতে স্বর্গপুরী সদৃশ দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইলেন। নিরন্তর আনন্দ-নাদে তাহার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহার কোন স্থানে মণি-পর্ব্বত, কোন স্থানে যন্ত্র, কোন স্থানে

ক্রীড়া-গৃহ, কোন স্থানে দিব্য উদ্যান, কোন স্থানে উৎকৃষ্ট উপবন, কোন স্থানে বড়ভিনিচয় এবং কোন স্থানে বা বিচিত্র চত্বর বিরাজিত রহিয়াছে। * * *। পুরীর চতুর্দ্দিক গঙ্গা ও সাগর সমান পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখা মধ্যে হংস, সারস ও পদ্ম সকল বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে মনোহর বৃক্ষমালা। যেমন আকাশ মণ্ডল মেঘ মালায় সমুজ্জ্বল থাকে তদ্রূপ অরুণবর্ণ সুবর্ণময় প্রাকারে নগর সতত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। কুবেরোদ্যান ও নন্দন-কানন-প্রতিম উদ্যানে দ্বারকার শোভার সীমা পরিসীমা নাই। নগরীর পূর্ব্ব দিকে মণি ও কাঞ্চন তোরণময় রমণীয় সানু ও উপত্যকা বিরাজিত অতি সুশোভন রৈরতক পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে পঞ্চবর্ণলতা-পরিবেষ্টিত বৃতি যেন ইন্দ্রধ্বজ শোভা পাইতেছে। পশ্চিম দিকে শাখাপ্রশাখাকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শ্রেণী। উত্তর দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেণু সকল দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন মন্দর পর্ব্বতের পাণ্ডুরবর্ণ চূড়া সকল শোভা পাইতেছে। * * * * পবিত্রতোয়া মহানদী একেবারে পঞ্চাশৎ মুখে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারকার চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়াছে। উহার ঔন্নত্য অতীব বিস্ময়জনক। চতুর্দ্দিকে অতলস্পর্শ পরিখা এবং সুধা-ধবলিত উন্নত প্রাচীর। স্থানে স্থানে সুতীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও লৌহ নির্ম্মিত চক্র সকল বিরাজমান রহিয়াছে। উহার সকল স্থানই প্রায় সুবর্ণ রচনায় বিচিত্রিত। স্বর্গের ন্যায় উহার মধ্যেও স্থানে স্থানে উন্নত-পতাকা-পরিশোভিত কিঙ্কিণিযুক্ত আটসহস্র রথ। উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ এবং প্রাশস্ত্য পরিমাণ আট যোজন। * * * পুরীর মধ্যভাগে বাসুদেবের গৃহ; চারি যোজন আয়ত এবং চারিযোজন বিস্তীর্ণ। তন্মধ্যে ক্রীড়া-পর্ব্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে কাঞ্চন নামক অতি মনোহর অট্টালিকা। ঐ গৃহ রুক্মিণীর নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ঔন্নত্য সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায়। সত্যভামার গৃহও অতি মনোহর এবং পাণ্ডুর বর্ণ। উহার সোপান সকল অতি বিচিত্র এবং মণিময়। পতাকা সকল নির্ম্মল সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ভাস্বর। ঐ গৃহ ভোগবান নামে বিখ্যাত। জাম্ববতীর গৃহও অতি সুশোভন, এবং তাহার চতুর্দ্দিক ধ্বজ-পতাকায় পরিপূর্ণ। উহা দেখিলে প্রতিক্ষণে নূতন বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল গৃহের মধ্যস্থলে সাগর সদৃশ অতি মনোহর সুমেরু নামে এক গৃহ বিরাজিত হইয়াছে। যেমন সূর্য্য-প্রভায় অন্যান্য প্রভা সকল উপহত হয়, তদ্রূপ সেই সুমেরু গৃহের প্রভায় অন্যান্য গৃহ ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ গৃহের দীপ্তি উদয়োন্মুখ অর্ক, উত্তপ্ত সুবর্ণ এবং প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়।

উহাতে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী অবস্থান করিয়া থাকেন। উহার নিকটেই পদ্মকূট নামে যে পদ্মবর্ণ গৃহ বিরাজিত ছিল, তাহার শোভাও অতি মনোহর এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্যে সুসজ্জিত। তাহারই পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভ নামে যে প্রাসাদ সুসজ্জিত ছিল, তাহা দেবী লক্ষ্মণার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার নিকটেই দেবী মিত্রবিন্দার অট্টালিকা। উহার প্রভা বৈদূর্য্যমণির ন্যায় হরিৎ বর্ণ এবং সকলেই সেই অট্টালিকাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ফলতঃ ঐ অট্টালিকা সমুদায় অট্টালিকার ভূষণ স্বরূপ। এমন কি দেবর্ষিগণও ঐ প্রাসাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবী সুনন্দার গৃহের নাম কেতুমান; সমস্ত দেবলোকেই উহার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। * * * এই পুরীমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা কত যে পুষ্করিণী ও সরোবর খনন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল পুষ্করিণী ও সরোবর রত্নগন্ধ যুক্ত বিবিধ পদ্মে পরিশোভিত। উহার উপকূল সকল রত্নপুষ্প ও রত্নফল বিশিষ্ট নানাবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। * *। যাহাই হউক, ঐ দ্বারবতী নগরের কি শত হস্ত উন্নত হিরণ্ময় প্রাসাদ, কি পর্ব্বত, কি নদী, কি সরোবর কি বন, কি উপবন, সমস্তই বিশ্বকর্ম্মার যত্নসিদ্ধ। * * *। বৃষভলোচন কৃষ্ণ দ্বারকার এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে শত-প্রাসাদ-পরিশোভিত স্বীয় ভবনের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, অযুত সহস্র মণিময় স্তম্ভ বিরাজিত থাকাতে ভবনে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। কাঞ্চনময় বেদীযুক্ত মণি, বিদ্রুম, ও রত্নখচিত তোরণ সকল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দ্যুতি ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার উন্নত ও আয়ত কাঞ্চনময় প্রাসাদ বিরাজিত রহিয়াছে। উহার স্তম্ভ সকল স্ফটিকে নির্ম্মিত। ঐ ভবনে তাঁহার আদেশ মত কৃত্রিম বাপী সকল কল্পিত হইয়াছে। বাপীর জলে অতি সুগন্ধ রক্ত ও শ্বেতপদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। উহার সোপান সমুদায় রত্নদ্বারা নির্ম্মিত। মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলগণ নিরন্তর উহাতে বিরাজমান রহিয়াছে। উহার প্রাচীর-ভিত্তি সমুদায় শিলাময় এবং ঊর্দ্ধে শত হস্ত বিস্তীর্ণ। চতুর্দ্দিকে পরিখা। ঐ গৃহ সর্ব্বাংশেই ইন্দ্র-ভবনের অনুকরণ করিয়াছে। উহার বিস্তার চতুর্দ্দিকে এক যোজন।" (ক)

দ্বারবতীর রাজপ্রাসাদ সকল কৃষ্ণ এইরূপ ইন্দ্রভবনের বিলাস সুখে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি নন্দনকাননের সুখ-সম্ভোগে রাজ্যভোগ করিতেন। এমত কি, নন্দনকাননের পারিজাত পর্য্যন্ত হরণ করিয়া আনিয়া নিজ ক্রীড়াকাননে রক্ষিত করিয়া-

(ক) হরিবংশের ষট্ ও সপ্ত পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় দেখ।

ছিলেন। রাজপুরী সতত কেবল আনন্দ লহরীতে উচ্ছ্বসিত হইত। তাহা ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে পরিপূর্ণ ছিল। নৃত্যগীত, নট, নটী, রমণীসম্ভোগ, মধুপানের উন্মত্ততা, প্রভৃতি সকল সুখই তথায় বিরাজমান ছিল। কৃষ্ণের রাজসংসারের উৎসবরবে দ্বারকাপুরী সততই প্রতিধ্বনিত হইত। এই দেখুন, এই রাজসংসারের উৎসব একস্থলে কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

"অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতক পর্ব্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ সকল রত্ন-মণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপসমূহ দ্বারা সুশোভিত হইল; এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত সুবর্ণ যানে আরোহণ পূর্ব্বক বারম্বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্য যানে, কেহ সামান্য যানে, কেহ বা পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত, ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনও অঙ্গনা-সহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক পরমসুখে বিহার করিতে ছিলেন। রুক্মিণীতনয় ও শাম্ব, ইহাঁরাও মধুপানে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্যমাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধব, ইহাঁরা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক পৃথক গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।" (ক)

দ্বারকার রাজসংসার এইরূপ উৎসবময় ছিল। কৃষ্ণ এই রাজসংসারের অধীশ্বর ছিলেন। সেই অধীশ্বর ষোড়শ সহস্র রমণী দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁহার সমুদায়ে এক লক্ষ সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। আমরা আশ্চর্য্য হই, কৃষ্ণ যখন কুরুকুল বিনাশে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার মনে একবারও দ্বারকার বিলাসধাম মনে পড়ে নাই! তিনি যখন পার্থকে জিতেন্দ্রিয়তা শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন কি তাঁহার মনে দ্বারকার সুখভোগ স্মরণ হয় নাই! স্মরণ হইবে কি, তখন তিনি ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্ত হইয়া কিছুকাল বিরাম লাভ করিতে ছিলেন। আমরা তাঁহার বৃন্দাবন ও গোকুলের লীলার কথা উল্লেখ করিতে চাহি না, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীহরণের কথা উল্লেখ করিতে চাহি না, মাতুলানী

(ক) মহাভারতীয় আদি পর্ব্বান্তর্গত সুভদ্রাহরণ পর্ব্বাধ্যায় দেখ।

রাধাসম্ভোগের কথাও বলিতে চাহি না, মামারবাড়ীর কুঁজো দাসীটা এক দিন চন্দন যোগাইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল বলিয়া সেও যে বাদ যায় নাই, সে কথাও বলিতে চাহি না, কিন্তু তিনি দ্বারকায় সমুদ্রতীরে সুখময় হর্ম্ম্যোপরি বসিয়া কেমন ষোড়শ সহস্র রমণী সুখভোগ করিতেন, মহাভারতীয় মৌসল পর্ব্বোক্ত সেই কথারই উল্লেখ মাত্র করিতেছি, এবং সেই কথা মাত্র উল্লেখ করিলেই কি তাঁহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় হইল না? কোথায় লাগে নবাবের শত শত বেগমমহলের বিলাসসুখ, কোথায় লাগে, দিল্লী ও আগ্রার যমুনাতীরস্থ বেগম-মহলের সুখভোগ;—কৃষ্ণের সুখভোগ এতদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ছিল। ষোড়শ সহস্র রমণী নহিলে তাঁহার পোসাইত না। হা কৃষ্ণ, হা গোকুলের কালাচাঁদ, হা ব্রজের গোপীনাথ, হা সুরা ও রমণী-প্লাবিত সুখপূর্ণ দ্বারকা-রাজ্যের অধীশ্বর, তোমার মুখে জিতেন্দ্রিয়তার কথা অতি সুমিষ্ট লাগে। তুমি যেন সকল বিলাস সুখে কিয়ৎ-কালের জন্য বিতৃষ্ণ হইয়াই এরূপ উপদেশ দিতেছ। কিন্তু যখন স্মরণ হয়, দ্বারকায় তখনও ভবিষ্যৎ ষট্‌ত্রিংশ বৎসর বিলাস সুখভোগের জন্য তোমায় ষোল হাজার রমণী আবদ্ধ আছে, যাহাদের চৌকিদার সুরাপায়ী ও দ্যূতক্রীড়াসক্ত বড়দাদা বলরাম এবং বৃদ্ধ পিতা বসুদেব, তখন তোমার জিতেন্দ্রিয়তার উপদেশ শুনিয়া তোমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা রসের উৎস একেবারে উৎসারিত হইয়া উঠে। তখন ঠিক বোধ হইতে থাকে, মহাত্মা অর্জ্জুনকে পাপপথে প্রবৃত্ত করাইবার তুমিই উপযুক্ত গুরু বটে! তোমারই মুখে জিতেন্দ্রিয়তার উপদেশ বিলক্ষণ শোভা পায়! আর কুরুকুল ধ্বংস করাইবার জন্যই কি তুমি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলে? তোমার যোগ-বিদ্যার বল কি এই কাজেই লাগিল? হা, যোগিশ্রেষ্ঠ, লোকে কি এই জন্যই তোমাকে পরম যোগী বলে? না তুমি ষোল হাজার রমণীর তৃপ্তি সাধনে সিদ্ধপিট বলিয়াই পরম যোগীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ!

আর রিপুদমনের ত কথাই নাই। সে বিষয়েও তুমি অতুল্য বলিলে হয়। শাপ-প্রদানে আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিগণ যেমন সিদ্ধ ছিলেন, রিপুদমন বিষয়ে পরম যোগী কৃষ্ণ তদ্রূপ সিদ্ধ ছিলেন। বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে একটু রহস্য করিল, বড় বড় মুনি ঋষিরা সে রহস্য বুঝিতে পারিলেন, অমনি তাহাতে পাঁচ লক্ষ যদুকুলের প্রাণ সংহারের ব্রহ্মশাপ প্রদত্ত হইল। যে স্থলে তুমি আমি রহস্য বলিয়া উড়াইয়া দিই, সে স্থলে মুনি ঋষিরা ক্রোধে অধীর হইতেন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, যে কালে এত শাপ ফলিত, যে কালে স্ত্রীলোকের শাপ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইত না,

সে কালে রাজশাসন ও দণ্ডনীতির এত পীড়াপীড়ি ছিল কেন। যাহা হউক, দুর্ব্বাসার ওষ্ঠাগ্রে যেমন শাপ ছিল, কথায় কথায় লাল গো-চক্ষু বিশিষ্ট কুচকুচে কালাচাঁদের চক্ষুর্দ্বয় তেমনি জবাফুল হইত। কেন না হইবে? কেবল প্রাণী সংহার করিতে যিনি জন্মিয়াছিলেন তাঁহার ক্রোধ, হিংসাদি হাত ধরা না থাকিলে কি হয়? দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্যের মূর্ত্তিমান প্রতিমা, জনার্দ্দন ছিলেন। ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি মহৎ গুণ সকল তাঁহার ভয়ে পলাইয়া দশ ক্রোশ দূরে থাকিত। কে বলে শিশুপালকে তিনি শতবার ক্ষমা করিয়াছিলেন? তাঁহার শতবারের রাগ পোষা ছিল, একেবারে সেই সমুদায় রাগের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। নহিলে এক সামান্য অপরাধে কি তাহার মাথা কাটা যায়? শুদ্ধ ক্রোধ নয়, দ্বেষ, হিংসা প্রবঞ্চনা, প্রতারণায়ও কেশব অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্যকে কেমন কৌশলে প্রতারিত করেন, মহাভারত-পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এ অংশকে "প্রক্ষিপ্ত" বলিলে মহাভারতের কোন অংশ তবে "প্রক্ষিপ্ত" নয়? দুর্য্যোধন যখন মাতৃ-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, কেশব অমনি তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া কটিদেশ ঢাকিয়া যাইতে বলিলেন। বাস্তবিক প্রাণ-সংহার করাই যাহার ব্রত, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, এবং দ্বেষ হিংসাকে অঙ্গভূষণ না করিলে কি তাহার ব্রত উদ্যাপন হয়? বাল্মিকীর কোমল-হৃদয় প্রসূত রামচন্দ্র এরূপ ছিলেন না। তাঁহার করস্পর্শে শাপগ্রস্ত পাষাণও দিব্য আকার ধারণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কেবল রক্তপাত জানিতেন। তিনি পৃথিবীকে নররুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশি-রাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ, এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়া ভারতকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। যদুবংশ এবং কুরুবংশের ধ্বংস তাঁহারই কার্য্য। তাঁহাকে যিনি হিংসা ও নিন্দা করিতেন, তাহার আর নিস্তার ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে দেশ শুদ্ধ লোককে হিংসা করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। শুদ্ধ দ্বেষ হিংসা নয়, কামেতেও তিনি উন্মত্ত হইতেন। চন্দ্রাবলীকে বঞ্চনা করিয়া রাধাপ্রেমে একদা উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আবার রাধিকাকে বঞ্চনা করিয়া কুব্জার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কুব্জা তাঁহাকে কতদূর মত্ত করিয়াছিল, রাধার দূতী তাহার বিলক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এ কি দেবতুল্য আদর্শ চরিত্র! যিনি রিপুকুলের মূর্ত্তিমান প্রতিমা ছিলেন, তাহার মুখে রিপুদমনের কথা! কৃষ্ণ তুমি কেন বল নাই, অর্জ্জুন আমি যাহা করি তাহা করিও না, যাহা উপদেশ দিই, তাহাই গ্রহণ করিও।

ভগবদ্গীতার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগতত্ত্বেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় যুধিষ্ঠিরকেও সেই উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভারতের আরও অনেক স্থলে সেই সকল উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বন ও শান্তিপর্ব্বে তাহার ছড়াছড়ি হইয়াছে। বোধ হয়, দ্বৈপায়ন নিজে যোগোক্ত মোক্ষপ্রিয় ছিলেন, এজন্য তিনি যাহার তাহার মুখ দিয়া তাহা প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ জগতে ধর্ম্মের অথবা জ্ঞানের কোন নূতন ভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিজেই ভগবদ্গীতায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ভারতে যোগ ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। কৃষ্ণ দার্শনিকগণেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশল কেবল কুচক্রিতায় ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যা বিষয়ে যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, যে জন্য তিনি দেবোপম হইতে পারেন, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না। তিনি একজন কৌশলী ও কুচক্রী দলপতি এবং যুদ্ধনায়ক হইতে পারেন, তিনি একজন মহারথী হইতে পারেন, এমত কি, তিনি একজন বীরও হইতে পারেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। বিদ্যা অথবা ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে যে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল এ কথা আমরা স্বীকার করি না। এক জন কপিলের যে শক্তি ছিল, কৃষ্ণের সে শক্তি ছিল না। যদি বল, কোন এক বিশেষ বিষয়ে কৃষ্ণের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা না থাকিলেও, তিনি মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সামঞ্জস্যের প্রতিমা ছিলেন। এ কথা সপ্রমাণ করা অসাধ্য। এ কথা সপ্রমাণ না হইলে তাহা স্বীকার্য্য নহে। প্রত্যুতঃ আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণচরিত্রে অনেক দোষেরই সমাবেশ ছিল। যিনি মহাভারত হইতে কৃষ্ণচরিত্রের সাধুতাব দেখাইতে যান, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, মহাভারতের যে যে স্থানে কৃষ্ণ ও শিব মাহাত্ম্য-সূচক রচনাবলি দৃষ্ট হয়, সে সমুদায় শৈব ও বৈষ্ণব "গোঁড়াদের" প্রক্ষিপ্ত বচন মাত্র * একথা স্বীকার করিয়া লইলে, মহাভারত হইতে আর কৃষ্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য দেখাইতে যাওয়া ভাল দেখায় না। কারণ, উভয় পক্ষীয় প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাদ দিলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য-সূচক সমুদায় রচনাবলিই বাদ পড়িয়া যায়। মহাভারতে কৃষ্ণ-গৌরবের হানি হইয়াছে বলিয়াই বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবৎ রচনা করিয়াছেন, এবং মহাভারতের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্যই সেই শ্রীমদ্ভাগবৎকে দ্বৈপায়নপ্রণীত বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। ইহা কৌশলী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণেরই কৌশল মাত্র।

শ্রী পূর্ণ——

* গত চৈত্র মাসের (১২৯১) "প্রচারে" লিখিত "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক প্রবন্ধ দেখ।

দেহাত্মবাদ।

চার্ব্বাক-মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মত, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাই। ধূমরূপ কার্য্যদর্শনে বহ্নির অস্তিত্বজ্ঞান, মেঘোন্নতিদর্শনে বৃষ্টিনিশ্চয়তা জ্ঞান, নদীতীরে ফলের অস্তিত্ব শ্রবণে তদাহরণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই মানসিক অবস্থা মাত্র। স্মৃতিরূপ ব্যাপারও মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়ামাত্র। সমস্ত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা তজ্জনিত ক্রিয়ার ফল মাত্র। স্মৃতি প্রভৃতির স্বতন্ত্র আধার বা অস্তিত্ব নাই। অনুমান-বলে স্মৃতি প্রভৃতির অপ্রত্যক্ষগোচর স্বতন্ত্র আধার বা অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। কারণ, অনুমান দ্বারা কোন বিষয়ের নিশ্চয়তা হইতে পারে না। অনুমান-প্রামাণ্য-বাদীরা যে একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব বা একের অনস্তিত্বে অপর বিষয়ের অনস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন তাহা সম্ভবপর জ্ঞান মাত্র। উহা কখনই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে না। ভূত বিষয়-পরম্পরা দর্শনে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষের উপরই বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস করা অনুমান মাত্র। আমি প্রতিনিয়তই রাত্রির অবসানে দিবস বা সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেছি বলিয়াই যে ভবিষ্যতেও সূর্য্যোদয় হইবে ইহা অনুমান মাত্র। অনুমান প্রত্যক্ষমূলীয়। প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত অনুমান স্বতন্ত্রভাবে প্রামাণ্য নহে। ধূমাদি দর্শনে অগ্ন্যাদির অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক। পূর্ব্বপূর্ব্ব দর্শনজনিত জ্ঞান পৃথকভাবে প্রত্যক্ষাগোচর মনে বা আত্মায় অবস্থিতি করে এবং অনুমান রূপ মানস কার্য্যকালে স্মৃতিরূপে উপস্থিত হয়, এরূপ বোধ নিরর্থক কল্পনা মাত্র। দেহাতিরিক্ত মন বা আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ, চার্ব্বাক-পদ্ধতির মূলসূত্রই দেহাত্মবাদ বা শরীরাতিরিক্ত চৈতন্যের অভাব। ঐ মতে শরীর দ্বিবিধঃ—প্রথম চেতন-শরীর; দ্বিতীয় জড়-শরীর। চেতন শরীর বা চেতনেন্দ্রিয় প্রাজ্ঞ মস্তিষ্কের অধীন; এবং জড়শরীর বা জড়েন্দ্রিয় জড়যন্ত্রের অধীন।

মস্তিষ্ক।—মস্তকস্থ শ্বেতাভ কোমল পদার্থবিশেষকেই মস্তিষ্ক কহে। মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। ঐ সকল অংশ-বিশেষের ক্রিয়াবিশেষ হইতেই প্রত্যক্ষ, বিশেষ জ্ঞান, সামান্য জ্ঞান ও অনুমিতির উৎপত্তি হয়। উহারা ঐ সকল জ্ঞানের আধার নহে। কিন্তু ঐ সকল জ্ঞানের জনক। মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী মজ্জা বা কোমলাংশ আঘাত হইতে রক্ষার জন্য কেবল মাত্র অস্থিময় আবরণে আবৃত নহে,

উহা তিন খানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। মস্তিষ্কই চিন্তা করে ও কার্য্য করে। মস্তিষ্ক স্বীয় অংশ ও শিরার সাহায্যে শরীরে চিন্তা ও গতি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করে।

শিরাসকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের আকারে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে। উক্ত শিরাসকল মস্তিষ্কের ইচ্ছা নামক ক্রিয়াবিশেষের অধীনে যথাসময়ে পরিচালিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সকলকে পদার্থের প্রতিকৃতি ধারণে সচেষ্ট করে। ঐ সকল শিরা মেরুদণ্ডের গাত্রাবলম্বনে শৃঙ্খলের ন্যায় লম্বিত। যে সকল শিরা উক্ত মেরুদণ্ডের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত তাহারা ইন্দ্রিয়ের গতি বিধান করে এবং যাহারা পশ্চাদ্ভাগে বিলম্বিত তাহারা ইন্দ্রিয় হইতে পদার্থ-প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে আনয়ন পূর্ব্বক জ্ঞান সম্পাদন করে। যখন আমরা এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহে হস্তার্পণ করি, তখন জ্ঞানজনক শিরাসকল ঐ উত্তাপ-প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে নীত করিয়া গতি-জনক শিরা দ্বারা লৌহ হইতে হস্তা-পসারণ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। উক্ত ক্রিয়া তাড়িত ক্রিয়ার ন্যায় অতি সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

জড়েন্দ্রিয় কতকগুলি অস্থি ও স্নায়ু বা শিরার সমষ্টি মাত্র। জড়েন্দ্রিয়ের নিজের স্ফুট চৈতন্য নাই। সুতরাং জড় শরীরের অংশভূত হৃদয়, ফুসফুস, উদর, লিঙ্গ, যকৃত, অন্ত্র, কোষ্ঠ এবং প্লীহা, এই সকল শরীরাংশ অস্থিময় গৃহে অবস্থিত হইয়া জীবনোপযোগী কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করে। পরিপাক, শ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পোষণ ও রস বিভাগাদি ক্রিয়াসমূহ ঐ সকল অঙ্গের দ্বারা সাধিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গই জড় ও চেতন এতদুভয়বিধ শক্তিসম্পন্ন শিরাসমূহের সমাবেশবিশিষ্ট। অতএব ঐ সকল ক্রিয়ার দ্বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া ইচ্ছার অধীন ও কতকগুলি ক্রিয়া স্বাধীন। স্বাধীন ক্রিয়াগুলি সকল সময়েই আমাদিগের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইতে থাকে।

রক্তসঞ্চালন।—প্রাণীর শরীর জীবিতা-বস্থায় প্রতিনিয়তই ক্ষয় ও বৃদ্ধি ভজনা করিতে থাকে। ক্ষয় শ্বাস প্রভৃতি নিঃসারক কার্য্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, এবং বৃদ্ধি পরিপাক ও রক্তাদি সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে ক্ষয়ের অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। সুতরাং তৎকালে পরিপাকও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই ক্ষয় বৃদ্ধি দর্শনে দার্শনিকেরা স্মরণ জ্ঞানের অনুপপত্তির আশঙ্কায় অর্থাৎ পূর্ব্ব শরীরগত প্রত্যক্ষ-জনিত জ্ঞান পরজাত শরীরে উপস্থিতির অসম্ভাবনা আশঙ্কায় ঐ স্মরণক্রিয়ার কর্ত্তৃস্বরূপ দেহাতিরিক্ত চেতনকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যুক্তি-দৃষ্টিতে ঐরূপ অতিরিক্ত চেতনকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। মস্তিষ্কের

অভাবে যখন কোন জ্ঞানেরই উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না; বিশেষতঃ যখন মস্তিষ্কের সর্ব্বজ্ঞানজনকত্ব রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন প্রত্যক্ষা-গোচর অর্থশূন্য নিরাধার চেতনকর্ত্তার অস্তিত্বে কোনরূপেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

পরিপাকাদি শারীরিক ক্রিয়া এবং স্মৃত্যাদি নিখিল জ্ঞান মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হইতেছে। জল ও অগ্নির সংযোগে যেরূপ বাষ্পীয় যানের গতির উৎপত্তি, প্রাণবায়ু জলবায়ু প্রভৃতির সংযোগে যেরূপ জল ও বায়ুর উৎপত্তি, পরমাণুবিশেষের সংযোগ বিয়োগে যেরূপ ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি, পরমাণু-বিশেষের কম্পনে যেরূপ আলোকের উৎপত্তি, বিষয়েন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত পারমাণবিক কম্পনে যেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি, পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সেইরূপ স্মরণাদি মানসিক জ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। মানসিক জ্ঞানের অতীতাবস্থার কোন প্রমাণই নাই। জ্ঞানকালেই উহাদের অস্তিত্ব সুতরাং অতিরিক্ত চেতনকর্ত্তার অভাবেও স্মরণাদির অনুপপত্তি হয় না। অস্তিষ্ক হইতে জ্ঞানের উৎপত্তির সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মস্তিষ্কের আকার, পরিমাণ ও অবস্থার তারতম্যে জ্ঞানের তারতম্য এবং মস্তিষ্কের অভাবে জ্ঞানের অভাব ও দেহবিচ্ছিন্ন মস্তকে বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা চক্ষুরুন্মীলনাদি ক্রিয়া সাধনে বৈজ্ঞানিকগণ, মস্তিষ্কই যে একমাত্র জ্ঞানের কারণ, তাহা প্রমাণ ও অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

যাঁহারা বলেন, কেবলমাত্র মস্তিষ্কই যদি জ্ঞানের কারণ হইত তাহাহইলে মস্তিষ্কাতিরিক্ত শরীরের কার্য্য-জ্ঞান মস্তিষ্ক দ্বারা নিষ্পন্ন হইত না। এই বিরোধী মত এক প্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে, তবে বিশেষরূপ অবগতির জন্য পরিপাকাদি কার্য্যের বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরিপাক।—খাদ্য সামগ্রী বদনস্থ হইলেই দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত ও লালা-মিশ্রিত হইয়া গলনলীপথে অধঃকৃত ও পাকযন্ত্রস্থ হয়। খাদ্যদ্রব্য এইরূপে উদরস্থ ও অম্লাদি রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত ও সার এবং অসার নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়। তদনন্তর ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া রক্তাধারে উপস্থিত হয় ও অসারাংশ অধোগামী হইয়া বহির্গমন করে। রক্তাধারগত ভুক্ত সার বা রক্ত শিরা বিশেষ দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র নীত হইয়া পোষণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ক্রমে ঐ রক্ত দূষিত হইলে পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত ও শ্বাসক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার পোষণ-ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। কোন কারণে এই রক্তসঞ্চালন রহিত হইলেই জীবন বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্ক যতক্ষণ জাগরিত

থাকে রক্তসঞ্চালন ততক্ষণই হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের বিশ্রামসময়ে রক্তগতিও মৃদু হয়, এবং ঘটনা বিশেষ দ্বারা মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য হইলে রক্তের গতিও চঞ্চল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক নিয়ত কার্য্য করিতে করিতে যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখনই জীব নিদ্রিত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হইলেও কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রামের এই কার্য্যাভাব হইতেই আত্মারূপ অতিরিক্ত চেতনকর্ত্তার অস্তিত্বের অপ্রামাণ্য হইতেছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুরাদি ভেদে পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে চক্ষু দর্শনজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। যখন প্রাণিগণ একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করে, তখন উজ্জ্বল প্রসারিত কিরণ বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুর ক্রমোন্নত ন্যুব্জাকৃতি উপরিভাগে পতিত হয়। চক্ষুর গঠনকৌশলে উক্ত কিরণাংশ চক্ষুর গোলকমধ্যেই পতিত হইয়া থাকে। উক্ত তারকা গোলাকার এবং সচ্ছিদ্র। ঐ ছিদ্র কিরণের তারতম্য অনুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঐ কিরণ তারকার পশ্চাদ্ভাগে সম্বদ্ধ শিরার মুখস্থ স্বচ্ছ কোমল আবরণে বিপরীত ভাবে পতিত হয়। ঐ আবরণ-নিপতিত কিরণ তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সচ্ছিদ্র জালবৎ আবরণের অভ্যন্তর দিয়া দর্শন শিরায় পতিত হয়, এবং উক্ত শিরা মধ্যস্থ স্নায়বীয় পরমাণু সঙ্ঘের কম্পন সহকারে মস্তিষ্কে নীত হইয়া দর্শনজ্ঞান সম্পন্ন করে। শ্রবণাদি জ্ঞানও ঐরূপ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়পথে শিরা মধ্যস্থ পারমাণবিক কম্পনাদিজনিত ক্রিয়াবিশেষ।

মানবের জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম উক্ত হইল। মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবগণেরও অনেকেরই ঐ সকল ইন্দ্রিয় আছে এবং তাহাদেরও দর্শনাদি ক্রিয়া সকল তারতম্য সত্ত্বেও প্রায় ঐরূপই হইয়া থাকে। ঐ সকল ইন্দ্রিয় চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং প্রকৃতি উহাদের পুনরুৎপত্তির নিয়ম স্থাপন করিয়া সাম্য ও স্বীয় অপরিবর্ত্তনীয়তা রক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেরই উৎপাদন শক্তি আছে; এবং ঐ শক্তির বিদ্যমানতা প্রযুক্তই লিঙ্গভেদ হইয়াছে। উক্ত উৎপাদন ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপে সম্পন্ন হইলেও প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না। যাবতীয় উৎপাদন ক্রিয়ার মূল সূত্র একই। একই শক্তি হইতে অপর শক্তির বা পূর্ব্বোক্ত শক্তিরই অবস্থান্তরের প্রকাশ। একই দেহের অংশ হইতেই অপর দেহের উৎপত্তি।

পৃথিব্যাদির উৎপত্তি।—একটী প্রাচীন ন্যায় আছে যে, বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি বা অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি? এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই এই পরিচ্ছেদের অবতারণা। দেহ চারি প্রকার,—ভৌতিক, পার্থিব, উদ্ভিদ, ও জৈব। প্রাকৃতিক শক্তির পরিণাম তাড়িতশক্তি। উক্ত তাড়িতশক্তির বিকার বা উৎপাদন শক্তি হইতেই তড়িন্ময় সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ তড়িন্ময় সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগস্থ (উৎপাদন শক্তির প্রকাশ বা ফলস্বরূপ) চঞ্চল (গতিশীল) পরমাণুসকল ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর ক্রমান্বয়ে তরলত্ব ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকার ধারণ করে। প্রত্যেক পরমাণুই নিশ্চিত ও অনিশ্চিত নামক শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট। নিশ্চিত শক্তি এক পরমাণুকে অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত ও অনিশ্চিত শক্তি তাহাকে অপর পরমাণু হইতে বিশ্লিষ্ট করে। ক্রমিক বিবর্ত্তনে যে পরমাণুর আকর্ষণশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, সে অপর পরমাণুসমূহকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ কলেবর বৃদ্ধি করে ও ক্রমে বিশ্লেষণশক্তিবলে অপর পরমাণুসমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। এইরূপে সঞ্জাত দেহের নামই ভৌতিক দেহ। পরে এই নিয়মানুসারেই তরল ও ঘন ভাবের উৎপত্তি। এবং ঐ শক্তি প্রকাশেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ বিশ্লেষণ শক্তি হইতেই সূর্য্যমণ্ডল-বিচ্ছিন্ন গ্রহ উপগ্রহগণের উৎপত্তি। এই প্রকারে উৎপন্ন দেহেরই নাম পার্থিব দেহ।

পরমাণুসমূহ যতই ঘনীভূত হয় ততই সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ সঞ্চিত করে, এবং যতই তরল হয় ততই প্রসারিত হইয়া উত্তাপ ব্যয়িত করে। আকর্ষণের নিয়মানুসারে সঙ্কুচিত ও সঞ্চিত উত্তাপ

বিশ্লেষণের নিয়মানুসারে প্রসারিত ও ব্যয়িত হইতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস পূর্ব্বে ১৮০ ডিগ্রি (Degree) ছিল; ক্রমে ক্রমে ৪৭ হইতে ২২,৮, ও অবশেষে ২ ডিগ্রি (Degree) হইয়াছে। সূর্য্যের এই সঙ্কোচে পৃথিবীমণ্ডল ক্রমে শীতল হইয়া ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহারা গণনা দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবী বহু কোটী বৎসর হইল, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কয়েক লক্ষ বৎসর জীবের আবাসভূমি হইয়াছে।

তড়িন্ময়ী পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে কিঞ্চিদ্ঘন উত্তপ্ত বাষ্পত্বে পরিণত হইয়া গুরুভার হয়। ঐ বাষ্প ক্রমে গুরুভার প্রযুক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া জলাকারে পতিত হইতে থাকে। ঐ জলরাশি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে একত্র অবস্থান করিয়া সঞ্চিত ও দৃঢ় হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত বাষ্প ও শেষোক্ত জলরাশির মিশ্রণেই ক্রমশীতলত্ব ও দৃঢ়ত্ব সঙ্ঘটিত হয়। জলরাশি জমিয়া উপরিভাগ দৃঢ় হইলে তাহা হইতে স্ফটিক প্রস্তরাদির উৎপত্তি হইতে থাকে। এইরূপে পৃথিবীর আবরণ ক্রমে দৃঢ় হইলে অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ বহির্গমনের চেষ্টা করিতে থাকে, এবং উপরিস্থ জলরাশি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ও জলের সংযোগে বাষ্পোৎপত্তি হয়।

ঐ বাষ্পবেগেই ভূমিকম্পনের সৃষ্টি। উক্ত ভূমিকম্প হইতেই পর্ব্বত ও আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তাম্রাদি খনিজ পদার্থের উৎপত্তি হইতে লাগিল। অবশেষে যখন পৃথিবীর উত্তাপ অল্প হইয়া ৮০ ডিগ্রি হইল তখনই উদ্ভিদের প্রথম উৎপত্তি হইল।

এই ভূমণ্ডলে আমরা ৭২ টি মূল পদার্থ দৃষ্টিগোচর করি। ঐ ৭২ টি পদার্থই একমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে একই আকর্ষণ বিশ্লেষণ নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত মূল পদার্থই প্রথমে বাষ্প ও তদনন্তর তরল হইয়া তন্মধ্যস্থ পরমাণুনিকরের পরস্পর সংযোগ বিয়োগেই উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—প্রাণবায়ু কোন পদার্থের সহিত অধিক ও কোন পদার্থের সহিত অল্প পরিমাণে মিলিত হওয়াতেই ক্ষারকতা বা দাহ্যতা প্রাপ্তি প্রযুক্ত দাহ্য বাষ্প নামে অভিহিত। ঐ কারণেই উহার সংমিশ্রণোৎপন্ন পদার্থও অম্ল নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ মিশ্রণের ফলই উত্তাপ ও আলোক।

জলবায়ুর ১১ অংশ এবং প্রাণবায়ুর ৮৯ অংশ মিশ্রিত হইলেই জলের উৎপত্তি হয়। ক্ষার বায়ুর ৭৭ অংশ ও প্রাণবায়ুর ২৩ অংশ সংযুক্ত হইয়া বায়ুর উৎপত্তি। এতদ্ব্যতীত গন্ধকাদি কতকগুলি খনিজ মূল পদার্থ আছে। ঐ সকল খনিজ ও বায়ুর সংযোগেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তাপে বায়বীয় অংশের ঘনীভাবে বায়ুর গুরুত্ব এবং শৈত্য বায়বীয় অংশের প্রসারণ প্রযুক্ত বায়ুর লঘুত্ব হয়। জলের সঙ্কোচ ও প্রসারণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইলেই হইয়া থাকে অর্থাৎ শৈত্যে গুরুত্ব ও উত্তাপে লঘুত্ব হয়। এই বৈপরীত্য নিয়মেই এক পদার্থের সংশ্লেষ ও অপরের বিশ্লেষে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির যে নিয়মে ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, সেই নিয়মেই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উৎপত্তি। কাল ও আধার অনাদি ও অনন্ত। জড়ের আকার ও গতি পরিবর্ত্তনশীল বটে কিন্তু নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। আদিকারণ— নিশ্চিতানিশ্চিত উৎপাদনশীল তাড়িতশক্তি।

২। উৎপাদনশীল চঞ্চল তড়িত।

৩। উৎপাদনশক্তিবিশিষ্ট পরমাণুর বিশ্লিষ্টাবস্থা।

৪। উৎপাদনশক্তিবিশিষ্ট পরমাণুর সংশ্লিষ্টাবস্থা—ভূত।

৫। বহু পরমাণুর সংমিশ্রণ— পৃথিবী।

৬। সংশ্লিষ্ট পরমাণুর স্ফীতি— উদ্ভিদোৎপত্তি।

৭। উদ্ভিদ হইতে ঐন্দ্রিয়িক পদার্থের উৎপত্তি—জীবোৎপত্তি।

৮। বীজবিহীন উদ্ভিদ ও জননেন্দ্রিয়বিহীন জীব ইহাদের উভয়েরই দেহ হইতে স্বজাতীয় দেহের উৎপত্তি।

৯। পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদ্ভিদ ও জীবের স্ব স্ব সত্তার বিলোপ না হইয়াই উভয়েরই অংশ হইতে তত্তজ্জাতীয় অপর দুই নূতন ঐন্দ্রিয়িক দেহের উৎপত্তি।

১০। পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদ্ভিদ ও জীবের অঙ্গবিশেষ হইতে তত্তজ্জাতীয় দেহের আবির্ভাব।

১১। একই উদ্ভিদের একই পুষ্পে ও একই জীবের একই দেহে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের বা উভয়বিধ জননেন্দ্রিয়ের অবস্থান। স্ত্রীকেশরে পুংকেশররেণুর পতনে বীজোৎপত্তি এবং জীবের পক্ষে তজ্জাতীয় দুই জীবের পরস্পর সংযোগে সন্তানোৎপত্তি।

১২। একই উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব; পুংপুষ্প-কেশররেণু স্ত্রীপুষ্প মধ্যে পতিত হইলেই বীজোৎপত্তি হয়। এই শ্রেণীর জীবের প্রথম দ্বিতীয় ক্রমে প্রথমের দ্বারা দ্বিতীয়ের তদ্দ্বারা তৃতীয়ের তদ্দ্বারা চতুর্থের ইত্যাদি ক্রমে সন্তানোৎপত্তি।

১৩। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ও ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব। ইহাদের একের পুংজননেন্দ্রিয় ও অপরের তদিতর।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সমালোচন।

সুশ্রুতসংহিতা। * —দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বঙ্গাক্ষরে পৃথক্ বঙ্গানুবাদ সহিত উক্ত সুশ্রুত গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যতগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে চরক ও সুশ্রুত এই দুই খানিই সর্ব্বপ্রধান। ইহার মধ্যে চরক কায়চিকিৎসার এবং সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসার প্রধানতম গ্রন্থ। হিন্দুগণ অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এই সুশ্রুত গ্রন্থই তাহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের মূল ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের

* মহামতি ডহ্বনাচার্য্য কৃত টীকা সহিত। টাকীর সুবিখ্যাত দানশীল জমীদার শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীচন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত এবং ২৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে সাধারণের নিকট পরিচিত করেন। কিন্তু ইহার টীকা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। টীকার সাহায্য ব্যতীত এরূপ প্রাচীন গ্রন্থের মর্ম্মবোধ হওয়া অসম্ভব সুতরাং কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র ও চন্দ্রকুমার ইহার মূল ও অনুবাদের সহিত টীকা প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুশ্রুত অতি বৃহৎ গ্রন্থ এবং ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার; কিন্তু কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র ও চন্দ্রকুমার ইতিপূর্ব্বে সুবৃহৎ চরকসংহিতা সম্পূর্ণ প্রচারিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সুতরাং ইহাতেও যে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে সাধারণের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম টীকার জমীদার বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বিশেষ সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। সুরেন্দ্র বাবু যে এত অল্প বয়সে ধনীজনসুলভ আলস্য ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমরা আশা করি বঙ্গের অপরাপর কৃতবিদ্য ও ধনী ব্যক্তিবৃন্দ সুরেন্দ্র বাবুর সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন।

গ্রন্থের এক খণ্ড দেখিয়া ইহার বিশেষ দোষ গুণ বিচার করা যায় না। তবে প্রথম খণ্ডখানিতে যেরূপ নমুনা দেখা গেল তাহা সন্তোষজনক। সমস্ত গ্রন্থখানি এই খণ্ডের ন্যায় হইলে ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ হইবে।

কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র ও চন্দ্রকুমার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ মূল ও টীকা সংগ্রহ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাবয়বপুষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায়।

বিজ্ঞান-প্রবেশ।—শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ।০ আনা। বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সহজ ভাষায় যতই পুস্তক প্রচারিত হইবে, ততই এদেশের উপকার হইতে থাকিবে। এই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বালকদিগকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া। সঙ্কলয়িতার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু "প্রসারিণী শক্তি" "ঘন সন্নিবেশ-নিবন্ধন" "যোগাকর্ষণ" প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ না লিখিয়া, তাহার বিনিময়ে এক একটী বাক্য রচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।

জড় ও শক্তি।

"Force is not an impelling God, not an essence separate from the material substratum of things. A force not united to matter, but floating freely above it, is an idle conception. Nitrogen, carbon, oxygen, sulphur and phosphorus possess their inherent qualities from eternity"—Moleschott.

জড় ও শক্তি জগতের অমূল-মূল। ইহাই সকল তত্ত্বের সার তত্ত্ব। তদতিরিক্ত আমাদিগের যাইবার সামর্থ্য নাই। আমাদিগের মানসিক অনুধাবনার এই উচ্চতম শেখর। জড় ও শক্তি ব্যতীত আমাদিগের মনে কোন ধারণাই নাই। মনুষ্যের বিশ্ববিজয়িনী বুদ্ধিবৃত্তির এই চূড়ান্ত কীর্ত্তি। কল্পনার এই সীমান্ত বিরামস্থল। জীব ও জড়জগতের এই অন্তস্তমতল। জড় ও শক্তি ব্যতীত বিশ্বসংসারের আমরা কিছু জানিও না এবং জানিতে পারিও না। মনুষ্যের সুবিস্তৃত এবং চিরবর্দ্ধিত জ্ঞানরাজ্যের এই চরমসীমা। আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় কখন সে সীমা অতিক্রম করিতে পারেও নাই এবং পারিবেও না। মানুষ যতকাল মানুষ থাকিবেন ততকাল তাঁহাকে সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে—অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। তবে যদি কোন নূতন অলোকসম্ভবা শক্তি সহসা তাঁহাতে উচ্ছ্বসিত হয়, তবে যদি কোন নূতন অভাবনীয় অলোকসামান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সহসা তাঁহাতে অভ্যুদিত হয়, তাহা হইলে তিনি কি করেন বলিতে পারি না। নতুবা আবহমানকাল যেরূপ হইয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে; তদতিরিক্ত প্রত্যাশা করিবার কোনও কারণই নাই। জ্যামিতির কোণের ভুজদ্বয় ক্রমান্বয় পরিবর্দ্ধিত করিলে যেমন কোণের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না, আমাদের জ্ঞানোন্নতির অনেকটা সেই ভাব। কিন্তু এবম্বিধ অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট মনুষ্য আর মনুষ্যনামে অভিহিত হইতে পারেন না। তাঁহার পদবী উচ্চ। অবস্থার প্রভেদে পদবী এবং পদবীর প্রভেদে সংজ্ঞার প্রভেদ হইয়া থাকে। তখন সে মানুষ আর এ মানুষ রহিল না। এতদুভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইল। সে দেবস্বরূপ কল্পনাপুত্তলির কথা স্বতন্ত্র। নতুবা মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড চিরন্তন জড় ও শক্তি দ্বারায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে অসমর্থ, অগাধবুদ্ধিজীবী মনুষ্যও তেমন কোন মতেই সেই জড়-শক্তি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। বায়ু সন্তাড়িত হইয়া দণ্ডোচ্চমুখ মধ্যে মধ্যে যদি কখন তিনি সেই সীমান্ত উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পান, মাধ্যাকর্ষণী

শক্তির মত কে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া সেই পাতাল মধ্যে ফেলিয়া যায়। চিন্তাস্রোত নদীস্রোতের মত অনন্তকাল ছুটিতেছে—দিন দিন ক্রমান্বয় গভীর ও প্রসারিত হইয়া আসিতেছে এবং সময়সহকারে তাহার স্ফাটিকের মত নির্ম্মলত্ব ও শোভা-সৌন্দর্য্যও বাড়িতেছে; কিন্তু কিছুতেই সেই তীর ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না; মহাবেগে কূলে কূলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, ইচ্ছা কূল ভাঙ্গিয়া বাহিরিয়া পড়ে; স্তূপে স্তূপে মৃত্তিকারাশি সে ভীষণ সন্তাড়নে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তথাপি যে অবরোধ সেই অবরোধই একরূপে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহা আর কোন মতেই অপসৃত হইতেছে না। মায়াময়ী ছায়াময়ী স্বপ্নময়ী কল্পনা চিরদিনই সেই অকাট্য বন্ধন মোচন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহার লেশমাত্রও ত্রুটি নাই; কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। প্রতি নিয়তই তিনি নিজ মায়ামন্ত্রবলে মনুষ্যকে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের অনন্ত রহস্য ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন, চর্ম্মচক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য মধ্যে জড়শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্বেচ্ছামত পুনর্গঠিত করিতেছেন, অদূরদর্শী মনুষ্য সেই জড়শক্তির অবস্থান্তরিত নূতন মিশ্রণ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না—তাহার স্থূলদৃষ্টি জড়শক্তি উপাদান ভেদ করিয়া আর স্তরান্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি তাহাকে ক্রমান্বয় বস্তু হইতে অবস্তুতে এবং সগুণ হইতে নির্গুণে লইয়া যাইবার সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, জড়বুদ্ধি মনুষ্য কিয়দ্দূর উঠিতেছে—স্থাবর হইতে জঙ্গমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে; প্রস্তর হইতে মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা হইতে জলে, জল হইতে বাষ্পে, বাষ্প হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে গ্যাসে, গ্যাস হইতে ইথরে; সে আর উঠিতে পারিতেছে না; এবং তিনি যতই তাহাকে সবলে উচ্চমুখে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, সে ততই উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত সেই জড়জগতেই ঘুরিয়া পড়িতেছে। করুণাময়ী কল্পনা তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। তিনি স্থূল-প্রকৃতি মনুষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলোক অপেক্ষা বেগবান পক্ষ মেলিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূবায়ু ভেদ করিয়া সতেজে তুঙ্গদেশে উঠিতে লাগিলেন; ক্রমে সমুদ্র গোষ্পদ এবং উচ্চতম ভূধরশৃঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ব্রণের মত অনুভূত হইতে লাগিল, পরে সমস্ত পৃথিবী ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুবৎ কোথায় মিলাইয়া গেল। কল্পনা তখনও দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ছায়াপথে উপনীত হইয়া এক সৌর-

জগৎ হইতে অপর সৌরজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে অসংখ্য ঘূর্ণায়মান পরিক্রমশীল সৌরজগৎ পার হইবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাহার আর সীমান্ত করিতে পারিলেন না; মনুষ্য এতাবৎকাল জড়শক্তির অনন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। দয়াময়ী তাহা দেখিয়া পুনশ্চ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং নিজ ইন্দ্রজাল প্রভাবে পলাণ্ডুর মত বিশ্ব-সংসারের কোষ উন্মোচন করিতে লাগিলেন, কোষের পর কোষ, তার পর কোষ, এইরূপে ক্রমাগত চলিল; কোষেরও শেষ নাই জড়শক্তিরও শেষ নাই; সুতরাং মনুষ্য তাহার সেই অনন্ত কোষ রহস্য দেখিতে লাগিল, অন্য কোন সত্তা বা উপাদান অনুধাবন করিতে পারিল না। পরে কল্পনা দেবী সামান্য বালুকণা লইয়া সহস্র ভাগ করিলেন এবং তাহার এক ভাগ লইয়া মনুষ্যকে দেখাইলেন, স্থূলদৃষ্টি মনুষ্য জড়শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনশ্চ সেই এক ভাগকে আবার লক্ষ ভাগ করিলেন এবং তাহারই একভাগ দেখাইলেন মনুষ্যের স্থূল বুদ্ধিতে জড়শক্তি ব্যতীত কিছুই অনুভূত হইল না। এইরূপে তাহাকে ক্রমে অনন্তকাল ভাগ করিতে লাগিলেন—সে ভাগেরও শেষ নাই—জড়শক্তিরও শেষ নাই। পরিশেষে হতাশ ও আক্রান্ত মনুষ্য কাতরস্বরে কহিল—"দেবি, ক্ষমা করুন! আর পারি না! আপনার পরমাণু অবধি ধরিয়া লইলাম। তাহাকেই জগতের মূল তত্ত্ব বলিব। কই, পদার্থের তো স্বরূপ (abstract entity) দেখিতে পাইলাম না। আপনার তো অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই।" সুতরাং ঐ পরমাণুই চিন্তার পর্য্যবসান স্থান হইল। কল্পনা এবার জড়-শক্তিময় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনন্ত ছায়াবাজি আরম্ভ করিলেন, মনুষ্য সেই স্বপ্নরাজ্যে জড়শক্তির ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। বস্তুতঃ মনুষ্যের জ্ঞাননেত্রে জড়শক্তির অতিরিক্ত কিছুই অনভূত হয় না এবং হইবারও নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ জড়শক্তির ক্রীড়াভূমি নহে; ইহা তাহারই অনন্ত মূর্ত্তি—অনন্তস্ফূর্ত্তি—অনন্ত বিকাশ মাত্র। কলায় কলায়, পিণ্ডে পিণ্ডে, স্তূপে স্তূপে, গ্রহে গ্রহে, চন্দ্রে চন্দ্রে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, সূর্য্যে সূর্য্যে, জগতে জগতে, জড়শক্তির বিকাশ বই আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। ক্ষুদ্র পুষ্পরেণুও যেরূপ জড়শক্তির অবয়বী মূর্ত্তি—প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ। বহির্জ্জগতেও যে কথা—অন্তর্জ্জগতেও সেই কথা। জড়শক্তিময়ী প্রকৃতি অনন্তকাল অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অনন্ত লীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আদি নাই—অন্ত নাই; ব্যাপ্তি আছে—ক্রম আছে—বিকাশ আছে। বিজ্ঞান বহুদিবসাবধি সমস্ত জাগতিক ব্যাপার স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং তদতিরিক্ত

শক্তির মত কে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া সেই পাতাল মধ্যে ফেলিয়া যায়। চিন্তাস্রোত নদীস্রোতের মত অনন্তকাল ছুটিতেছে—দিন দিন ক্রমান্বয় গভীর ও প্রসারিত হইয়া আসিতেছে এবং সময়সহকারে তাহার স্ফাটিকের মত নির্ম্মলত্ব ও শোভা-সৌন্দর্য্যও বাড়িতেছে; কিন্তু কিছুতেই সেই তীর ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না; মহাবেগে কূলে কূলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, ইচ্ছা কূল ভাঙ্গিয়া বাহিরিয়া পড়ে; স্তূপে স্তূপে মৃত্তিকারাশি সে ভীষণ সন্তাড়নে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তথাপি যে অবরোধ সেই অবরোধই একরূপে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহা আর কোন মতেই অপসৃত হইতেছে না। মায়াময়ী ছায়াময়ী স্বপ্নময়ী কল্পনা চিরদিনই সেই অকাট্য বন্ধন মোচন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহার লেশমাত্রও ত্রুটি নাই; কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। প্রতি নিয়তই তিনি নিজ মায়ামন্ত্রবলে মনুষ্যকে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের অনন্ত রহস্য ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন, চর্ম্মচক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য মধ্যে জড়শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্বেচ্ছামত পুনর্গঠিত করিতেছেন, অদূরদর্শী মনুষ্য সেই জড়শক্তির অবস্থান্তরিত নূতন মিশ্রণ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না—তাহার স্থূলদৃষ্টি জড়শক্তি উপাদান ভেদ করিয়া আর স্তরান্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি তাহাকে ক্রমান্বয় বস্তু হইতে অবস্তুতে এবং সগুণ হইতে নির্গুণে লইয়া যাইবার সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, জড়বুদ্ধি মনুষ্য কিয়দ্দূর উঠিতেছে—স্থাবর হইতে জঙ্গমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে; প্রস্তর হইতে মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা হইতে জলে, জল হইতে বাষ্পে, বাষ্প হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে গ্যাসে, গ্যাস হইতে ইথরে; সে আর উঠিতে পারিতেছে না; এবং তিনি যতই তাহাকে সবলে উচ্চমুখে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, সে ততই উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত সেই জড়জগতেই ঘুরিয়া পড়িতেছে। করুণাময়ী কল্পনা তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। তিনি স্থূল-প্রকৃতি মনুষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলোক অপেক্ষা বেগবান পক্ষ মেলিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূবায়ু ভেদ করিয়া সতেজে তুঙ্গদেশে উঠিতে লাগিলেন; ক্রমে সমুদ্র গোষ্পদ এবং উচ্চতম ভূধরশৃঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ব্রণের মত অনুভূত হইতে লাগিল, পরে সমস্ত পৃথিবী ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুবৎ কোথায় মিলাইয়া গেল। কল্পনা তখনও দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ছায়াপথে উপনীত হইয়া এক সৌর-

জগৎ হইতে অপর সৌরজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে অসংখ্য ঘূর্ণায়মান পরিক্রমশীল সৌরজগৎ পার হইবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাহার আর সীমান্ত করিতে পারিলেন না; মনুষ্য এতাবৎকাল জড়শক্তির অনন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। দয়াময়ী তাহা দেখিয়া পুনশ্চ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং নিজ ইন্দ্রজাল প্রভাবে পলাণ্ডুর মত বিশ্ব-সংসারের কোষ উন্মোচন করিতে লাগিলেন, কোষের পর কোষ, তার পর কোষ, এইরূপে ক্রমাগত চলিল; কোষেরও শেষ নাই জড়শক্তিরও শেষ নাই; সুতরাং মনুষ্য তাহার সেই অনন্ত কোষ রহস্য দেখিতে লাগিল, অন্য কোন সত্তা বা উপাদান অনুধাবন করিতে পারিল না। পরে কল্পনা দেবী সামান্য বালুকণা লইয়া সহস্র ভাগ করিলেন এবং তাহার এক ভাগ লইয়া মনুষ্যকে দেখাইলেন, স্থূলদৃষ্টি মনুষ্য জড়শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনশ্চ সেই এক ভাগকে আবার লক্ষ ভাগ করিলেন এবং তাহারই একভাগ দেখাইলেন মনুষ্যের স্থূল বুদ্ধিতে জড়শক্তি ব্যতীত কিছুই অনুভূত হইল না। এইরূপে তাহাকে ক্রমে অনন্তকাল ভাগ করিতে লাগিলেন—সে ভাগেরও শেষ নাই—জড়শক্তিরও শেষ নাই। পরিশেষে হতাশ ও আক্রান্ত মনুষ্য কাতরস্বরে কহিল—"দেবি, ক্ষমা করুন! আর পারি না! আপনার পরমাণু অবধি ধরিয়া লইলাম। তাহাকেই জগতের মূল তত্ত্ব বলিব। কই, পদার্থের তো স্বরূপ (abstract entity) দেখিতে পাইলাম না। আপনার তো অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই।" সুতরাং ঐ পরমাণুই চিন্তার পর্য্যবসান স্থান হইল। কল্পনা এবার জড়-শক্তিময় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনন্ত ছায়াবাজি আরম্ভ করিলেন, মনুষ্য সেই স্বপ্নরাজ্যে জড়শক্তির ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। বস্তুতঃ মনুষ্যের জ্ঞাননেত্রে জড়শক্তির অতিরিক্ত কিছুই অনভূত হয় না এবং হইবারও নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ জড়শক্তির ক্রীড়াভূমি নহে; ইহা তাহারই অনন্ত মূর্ত্তি—অনন্তস্ফূর্ত্তি—অনন্ত বিকাশ মাত্র। কলায় কলায়, পিণ্ডে পিণ্ডে, স্তূপে স্তূপে, গ্রহে গ্রহে, চন্দ্রে চন্দ্রে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, সূর্য্যে সূর্য্যে, জগতে জগতে, জড়শক্তির বিকাশ বই আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। ক্ষুদ্র পুষ্পরেণুও যেরূপ জড়শক্তির অবয়বী মূর্ত্তি—প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ। বহির্জগতেও যে কথা—অন্তর্জগতেও সেই কথা। জড়শক্তিময়ী প্রকৃতি অনন্তকাল অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অনন্ত লীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আদি নাই—অন্ত নাই; ব্যাপ্তি আছে—ক্রম আছে—বিকাশ আছে। বিজ্ঞান বহুদিবসাবধি সমস্ত জাগতিক ব্যাপার স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং তদতিরিক্ত

কোন সত্তা না পাইয়া কোন অভাজ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাংশকে সার, সত্তা বা উপাদান ধরিয়া লইয়া জড়শক্তির ভাষায় সকল কথাই অনুবাদ করিয়া লইয়াছে। দর্শন অনুমান সাহায্যে কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশায় কার্য্যকারণের মহা আড়ম্বর লইয়া ধীরে ধীরে বস্তু হইতে অবস্তুতে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, লোক হইতে অলোকে, সগুণ হইতে নির্গুণে, প্রবেশ করিবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছে, এবং একে একে রূপরসগন্ধস্পর্শ উন্মোচন করিয়া জড়শক্তিময়ী প্রকৃতির উলাঙ্গ সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া আকাশও সময়ের ভাবে (idea) বিভোর হইয়া কিছুকাল অন্ধের মত ইতস্ততঃ হাতড়াইল। অতঃপর জড় শক্তির বন্ধন অতিক্রম করা মনুষ্যের অসাধ্য বুঝিয়া সম্প্রতি তাহারই নিয়মাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। "Perilous as it must ever be to set absolute limits to the future of human capacity, there can be no peril in averring that Metaphysics never will achieve its aims, because those aims lie beyond all scope. The difficulty is impossibility. No progress can be made because no basis of certainty is possible. To aspire to the knowledge of more than phenomena—their resemblances, co-existences, and successions—is to aspire to transcend the inexorable limits of human faculty. To *know* more, we *must be more*.—G. H. Lewes' History of Philosophy. মনুষ্যের জীবনও সেই জড়শক্তিগত—তাহার মনও তন্ময়। জড়শক্তিময়ী প্রকৃতি তাহার ভাবনা—জড়শক্তিময়ী প্রকৃতি তাহার কল্পনা। তাহার জ্ঞানে, ধ্যানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, তপে, জপে, পূজায় অর্চ্চনায়, ভাবে ভক্তিতে, চিন্তায় মায়ায়, অনুভূতিতে আসক্তিতে, অনুমানে, উপমানে সেই একই মূর্ত্তি। জড়শক্তি ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন কথাই নাই; যদি থাকে, তবে তাহা কথা মাত্রই আছে—সে কথার কোন নির্দ্দিষ্ট সত্তা বা ধারণা মনুষ্যের মনে স্থান পায় নাই। তাহা কেবল কথার কথা বই আর কিছুই নহে। জড়শক্তি সকলের মূলে—মধ্যে ও অন্তে। ইহাই জগতের জীবন—স্বাস্থ্য ও নিয়ম। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে অনন্ত জড় এবং অনন্ত শক্তিরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। জড়শক্তিই সৃষ্টি; জড়শক্তিই স্থিতি; জড়শক্তিই প্রলয়। জড়শক্তিই কর্ত্তা, জড়শক্তিই কর্ম্ম, জড়শক্তিই কারণ, জড়শক্তিই কার্য্য, জড়শক্তিই নিয়ম, জড়শক্তিই নিয়ন্তা, জড়শক্তিই জল, জড়শক্তিই পিপাসা; জড়শক্তিই ক্ষুধা, জড়শক্তিই খাদ্য; জড়শক্তিই

কাম, জড়শক্তিই কামনা। আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ন্যায়, দর্শন, কাব্য সকলেরই সেই এক মর্ম্ম। জড়শক্তিই সার এবং জড়শক্তিই সারাৎসার। মহর্ষি কপিলের প্রকৃতি পুরুষ, বোধ হয়, জড়শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নির্ব্বোধের ষষ্ঠীমাকালেও যে কথা দার্শনিক চূড়ামণি হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের অসীম অনন্ত সনাতন শক্তিতেও সেই কথা। ("An Infinite and Eternal Energy from which all things proceed."—(Nineteenth Century.) প্রাকৃতিক রহস্য যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন তিনি সেই ভাবেই দেখিতে পাইয়াছেন। ফলে বিষয় সেই এক বই আর দ্বিতীয় নহে। তবে কি যিনি নিরাকার ভাবেন, তিনি কি নিরাকার সত্তা দেখিতে পান? নিরাকার তো দেখিবার সামগ্রী নহে;—নিরাকার বস্তুর ধ্যান নাই—কল্পনা নাই। যাঁহারা নিরাকার ভাবেন, তাঁহারা হয় বৃহদাকার নয় অন্ধকার দেখিতে পান। মনে মনে যখন নিরাকারের চরণে নমস্কার করেন তখন সম্মুখে অলোকসম্ভব প্রকাণ্ড দুই গদাধরের পাদপদ্ম আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদী যতই তাহা হইতে মন সরাইয়া লইবার প্রয়াস পান, মন ততই তাহা হইতে তদনুরূপ আর একটায় গিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে। যখন আকাশের ধ্যান করিতে গেলে সুনীল তারকা সুশোভিত গগনমণ্ডল মনে উদয় হয়, তখন সীমান্তপ্রাপ্ত কল্পনাতীত মনুষ্য সদৃশ সদগুণবিশিষ্ট নিরাকার অনন্ত সত্তা কিরূপে অনুভূত হইবে?

যাহা হউক, যিনি এই জড়শক্তিময়ী প্রকৃতিকে ভক্তিভাবে দেখিয়াছেন—তিনি আত্মবৎ ভাবিয়াছেন—পূজা করিয়াছেন। যিনি আয়ত্ত করিবার আশয়ে দেখিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। ফলে আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই ভাবুক—পূজক—ভক্তিতে গদগদ—বিস্ময়ের উপান্তে উপনীত। আস্তিকের আস্তিকত্ব যে ভাব, নাস্তিকের নাস্তিকত্বও সেই ভাবের প্রতিঘাত মাত্র। ফলে উভয়েই প্রেমিক—ভাবুক—বিনত—বিস্ময়বিহ্বল। এক জন অন্যায্য আশাপরবশ; আর এক জন অন্যায্য নিরাশ। এক জন প্রেমপিপাসায় কাঁটাখোঁচা ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছেন, আর একজন বিরহী—বিরহ জ্বালায় ছটফট করিয়া চতুর্দ্দিক দাপটিয়া বেড়াইতেছেন। নাস্তিক ও আস্তিকের মনোগত ভাব শীতগ্রীষ্মের মত এক জাতীয় অনুভূতি—শুদ্ধ মাত্রার প্রভেদ মাত্র। তাপমান যন্ত্রের পারদের শীতোষ্ণ অনুভূতির সহিত নাস্তিকতা ও আস্তিকতার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যাঁহার মনে স্থৈর্য্য আছে, সাম্য আছে; ভাব ও বিবেক এবং ভক্তি ও ন্যায় সীমান্ত প্রাপ্ত হয় নাই; মন তুলাযন্ত্রের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার বাদাবাদ নাই;—যদি থাকে তবে

সে সত্যবাদ;—যে দিকে প্রমাণ সেই দিকেই ঝোঁক; অধিক জানেন বলিয়া ভাণও নাই—কোন বিষয় জানেন না বলিতে লজ্জাও নাই। তিনি যাহা জানেন—তাহা জানেন ও মানেন; যাহা জানেন না, তাহা জানেনও না, মানেনও না। যখন যাহা জানিবেন, তখন তাহা জানিবেন ও মানিবেন। তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত সত্যক্ষেত্র; তাঁহার ভাব অতি উচ্চ ও রমণীয়। বস্তুতঃ জ্ঞান অভিমানও নহে—আলস্যও নহে—ঔদাস্যও নহে; —জ্ঞান—জ্ঞান।

মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড অনুশীলন করিলে পর পর তিনটী বিভিন্ন অবস্থা প্রতীয়মান ও হয়। সেই তিন অবস্থায় সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের তিন প্রকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব (Theological), আন্বীক্ষিক (Metaphysical), ধ্রুব, প্রত্যক্ষ বা বৈজ্ঞানিক (Positive)। এই তিন প্রকার ব্যাখ্যা, অনুশীলন করিলে, সকল তত্ত্বেই পাওয়া যায়। আমাদিগের চিন্তামার্গের এই তিনটী অবশ্যম্ভাবী সোপান। বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে পর পর এই তিনটী ক্রম বা অবস্থা দেখা যায়। বিদ্যার এই তিনটী বিভিন্ন গ্রাম। আমরা যে কোন শাস্ত্রে বা তত্ত্বে দৃষ্টিপাত করি না কেন, এই তিনটী সোপান তাহাতেই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। মনুষ্যের বুদ্ধিবিকাশের ও জ্ঞানোন্নতির এই এক অপরিহার্য্য নিয়ম। মহাত্মা কোম্ত এ প্রকার ক্রমবিকাশ নিয়মের প্রথম প্রবর্ত্তক। সত্যব্রত নিউটনের মাধ্যাকর্ষণী শক্তির মত ইহারও গৌরব সমধিক কৌম্ত যদি আর কিছুই না করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাতেই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। "This generalization is the most fundamental of the doctrines which originated with M. Comte; and the survey of history, which occupies the two largest volumes of the six composing his work, is a continuous exemplification and verification of the law. How well it accords with the facts, and how vast a number of the greater historical phenomena it explains, is known only to those who have studied its exposition, where alone it can be found—in these most striking and instructive volumes". —J S. Mill. Assuming it proved, as history will warrant, that the evolutions of Humanity correspond with the evolutions of Thought—that science is the torch whereby we see our way—the importance of the fundamental law discovered by Comte can not easily be exaggerated. It is to social science what Newton's great discovery was to Physics.—G. H. Lewes' Philosophy of the Sciences. বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব (Theology), আন্বীক্ষিকী (Metaphysics) এবং বিজ্ঞান এই তিন জনই মনুষ্যের প্রকৃত শিক্ষাগুরু ও

দীক্ষাগুরু। তিন ভিন্ন সময়ে এই তিন জনেরই শাসন প্রবল হইয়া আসিতেছে। কখন বা এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তাহাদের তিন জনেরই সমান প্রাধান্য দেখা যায়। সে শাসন মনুষ্যমাত্রই এড়াইতে পারেন নাই। আমাদিগের চিন্তাস্রোত এই তিনটী প্রণালীতেই পরপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পারম্পর্য্য দেশীয় বা জাতীয় ইতিহাসে প্রতিপন্ন হইবার নহে—ইহা মানুষের চিন্তার বা দর্শনের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবে যেরূপ ধাত্রী; বিকাশোন্মুখ বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সেইরূপ আত্মতত্ত্ব। মনুষ্যের আদিমাবস্থায় আত্মতত্ত্ব ভিন্ন তাহার গতি নাই—তখন সে নিতান্ত অনন্যোপায়। মনুষ্যের উন্নতির সহিত এই তিনটী অবস্থা পরপর অলক্ষিত ভাবে কেমন পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ে যে কি প্রকার আনন্দের উদ্রেক হয় তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আমাদিগের জ্ঞানরাজ্যে তাহারা পরপর যে কি প্রকার অপ্রতিহত আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে শরীর পুলোকিত হইয়া উঠে। এককালে জগতে আত্মতত্ত্ব অদ্বিতীয়-প্রতাপ ছিল। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই তাহার সম্পূর্ণ শাসন। সকল কথাতেই তাহার একশেষ প্রাদুর্ভাব। তাহার সম্মুখে আর কাহারও অগ্রসর হইবার শক্তি ছিল না। চিন্তাজগতে একাই সে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। একছত্রে সকলকেই সে শাসন করিয়া আসিতেছিল। এখনও হতপ্রতাপ হইয়া বন্দীভাবে থাকিয়াও সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিপ্লব ঘটাইয়া তুলে। আজকাল তাহার শাসন হ্রাস হইয়াও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কোন না কোন বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ব্বরজাতির কথা দূরে থাকুক, সুসভ্য ইয়ুরোপ সমাজেও তাহার আধিপত্য এখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি, অনেক সময়ে একমনে এক সময়েও উক্ত তিন অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে নিঃসঙ্কোচে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, যে তাহার প্রতাপ অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে এবং প্রায়ই সভ্য সমাজে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যখন আত্মতত্ত্ব সংসারে ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভূত, এমন কি, এক মাত্র শাসক, তখন দর্শন কোথায় নিরালয়ে এক প্রান্তে সামান্য পর্ণকুটীরে দীনভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতে ছিল, এবং ক্রমে আত্মবলে বলীয়ান হইয়া অবসরমতে নিজ স্বাধীনতাধ্বজা উড়াইল। চতুর্দ্দিকে তদ্দর্শনে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। যে দর্শন এককালে আত্মতত্ত্বের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত, আজ সে স্বাধীন হইল দেখিয়া আত্মতত্ত্বের আর ক্রোধ ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। সে প্রাণপণে তাহার

উচ্ছেদব্রতে ব্রতী হইল; কিন্তু কিছুতেই সেই উত্থিত শক্তি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। নববলে বলী দর্শন শনৈঃ শনৈঃ একে একে তাহার সুবিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়া আত্মাধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। আত্মতত্ত্বের রাজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। যখন উভয়ে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, চারিদিকে দাবাগ্নি সদৃশ কোপানল ছুটিতেছে, তখন রণক্ষেত্রে আর এক তৃতীয় শত্রু উপস্থিত, বিজ্ঞান সেই বিপর্য্যস্ত সময়ে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আপন স্বাধীনতা প্রচার করিয়া উভয়েরই অধিকার আত্মসাৎ করিতে লাগিল। আত্মতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পর যুদ্ধে এক প্রকার হতবল হইয়া পড়িয়াছিল; সময়গুণে বিজ্ঞানের জয় অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসেই হইতে লাগিল। অবশেষে আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আত্মতত্ত্ব ও দর্শন এইবার সন্ধিসূত্রে একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের সাধারণ শত্রু বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিপর্য্যয় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু অনন্ত প্রতাপ বিজ্ঞানের কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে এইরূপে বহুদিবসাবধি তাহাদের তিন জনের তিনটী পৃথক রাজ্য পার্শ্বপার্শ্বী চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাই ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। মনুষ্যের যেমন তিনটী অবস্থা আছে, বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়; জীবনের যেমন তিনটী চরণ আছে, অন্তঃকরণ, ফুস্‌ফুস্‌ ও মস্তিষ্ক, আমাদের জ্ঞানেরও সেইরূপ তিনটী অবস্থা বা চরণ দেখা যায়, যথা, আত্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞান। আজকাল এই তিনটী প্রণালীকে সংমিলিত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না। ফলে এবম্প্রকার সংকল্পে কৃতকার্য্য হইলেও তাহাদের পার্থক্য লোপ হইবার নহে। বালক কালক্রমে পরিণতি সহকারে যুবক হইতে পারে; কিন্তু অন্তঃকরণ কখনই মস্তিষ্ক হইতে পারে না। আত্মতত্ত্বও সেইরূপ কোনমতেই বিজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। এবং বিজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার আর আত্মতত্ত্বত্ব থাকিবে না। এ তিন জনের রাজ্য চিরকালই পৃথক থাকিবে। যে বিজ্ঞান আদৌ আত্মতত্ত্বের ভয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল এবং কতকাল প্রাকশ্য ভাবেও তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, আজ অবসর পাইয়া নিজ স্বাধীন সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া জগতে অনন্ত কীর্ত্তির ধ্বজা উড়াইয়াছে। যে আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটী কথা বলায় মহাত্মা গালিলিওকে কারাবাস যাইতে হইয়াছিল—আজ আত্মতত্ত্ব সেই কথাকে যথা কথা বলিয়া আপনার অনুমোদিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আজ আত্মতত্ত্ব অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানের অনুগামী। এখন আর তাহার ভূগোল, ভূতত্ত্ব, সৃষ্টিবৃত্তান্ত, নীতি, ইতিহাস

প্রভৃতি শিক্ষিতের নিকট চলে না; সুতরাং তাহাকেও মধ্যে মধ্যে সেই বিজ্ঞানবিবৃত বৃত্তান্ত নিজস্ব বলিয়া ভাণ করিতে হয়। এক্ষণে বিজ্ঞানই প্রকৃত জগদ্‌গুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক এতদুভয় বিষয়েই তাহার প্রাধান্য দেখা যায়। বিজ্ঞানের আজ গৌরব ও প্রাদুর্ভাবের সীমা নাই। আজ বিজ্ঞান ব্যতীত লোকের মুখে আর অন্য কথাই নাই। যাহাতে বিজ্ঞান নাই, তাহা আজ লোকে হেয় ও অপদার্থ মনে করে। যথায় বিজ্ঞান নাই, আজ তথায় প্রেতের বাস—নির্ব্বোধের রাজ্য। বিজ্ঞানই আজ প্রকৃত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আত্মতত্ত্বকে এক্ষণে লোকে একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। ইহার শাসনও যৎসামান্য এবং তাহারও অধিকার পৃথক;—দর্শন ও বিজ্ঞানের শাসনাধীন বিষয়ে নহে। পূর্ব্বে যেমন ইহার সর্ব্ববিভাগে সমান আধিপত্য ছিল—এখন আর তাহার কিছুই নাই। অন্যায্য বলিয়া আজ লোকে তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং সে উচ্চ সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়াছে। যদি ইহার এক্ষণে কোন অধিকার থাকে, তবে তাহা অপার্থিব বিষয়ে বলিতে হইবে? পরিদৃশ্যমান জাগতিক সত্যে অধিকার আছে বলিয়া সে আর ভাণ করে না। আজ কাল ইহা বিশ্বাসের তীর্থের পাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। অনুসন্ধান, গবেষণা, পরীক্ষা, সামান্যতাপাত প্রভৃতিতে আজ সে বিজ্ঞানদর্শনকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে; আর সে সকল বিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপ করে না। আজ সে আত্মার ও পরমাত্মার দ্বারের প্রহরী মাত্র। কাহার আবশ্যক হইলে সে তদ্বিষয়ে পথ বলিয়া দিতে সাহস পায়। যদি যথার্থ আজ তাহার কোন অধিকার থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের ভাবমার্গে বলিতে হইবে—চিন্তামার্গে নহে। ধর্ম্মের ধারণাগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করাই তাহার ন্যায্য কার্য্য। সকল আত্মতত্ত্বের এইটী শুদ্ধ সাধারণ লক্ষণ নহে—আজ কাল সর্ব্বত্র এইটী তাহার প্রধান লক্ষণ বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞানের কার্য্য স্বতন্ত্র। পদার্থের প্রকৃতি বা স্বরূপ (abstract entity) সম্বন্ধে আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই। পদার্থ যেরূপ আমাদিগের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয়, আমাদিগের তদ্বিষয়ে সেইরূপই জ্ঞান। তাহার অতিরিক্ত সত্তায় আমাদের আদৌ কোন অধিকারই নাই। এবং সে প্রত্যক্ষজ্ঞানও আর এক দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে। জগতে দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকিত না। বস্তুর স্বরূপ বা নিগুণ সত্তা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। আমার আম্রের জ্ঞান আছে; অর্থাৎ, আম্র আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। উহার আকার, প্রকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ আমার যে প্রকার অনুভূত হইয়াছে তাহা লেবু বা রম্ভার সহিত পৃথক বা অনেক সদৃশ।

আমাদিগের জ্ঞানই ইত্যাকার। এতদ্ভিন্ন আত্মের স্বতন্ত্র সত্তা আমরা জানি না। নির্গুণ সত্তা আমাদিগের উপলব্ধি হয় না এবং কোন বস্তুর প্রকৃত উৎপত্তি কারণ বা নিমিত্তক কারণ আমরা জানিও না এবং জানিতে পারিও না। বস্তুসমূহের সাদৃশ্য, সমকালবর্ত্তিতা (co-existence) পারম্পর্য্য (succession) সম্বন্ধ ব্যতীত আমাদিগের আর কিছু জানিবার শক্তি বা সাধ্য নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য (constant); অর্থাৎ, অবস্থার প্রভিন্নতা না হইলে সে সম্বন্ধেরও প্রভিন্নতা ঘটে না—চিরন্তন একভাবই থাকে। অগ্নিতে কাষ্ঠ দগ্ধ হয়; অর্থাৎ, অগ্নি ও কাষ্ঠ সমকালবর্ত্তী, এবং দহন পরবর্ত্তী, ঘটনা। অগ্নি এবং কাষ্ঠ (মনে কর, শুষ্ক কাষ্ঠ) সংযোগে,অর্থাৎ, সমবর্ত্তী সম্বন্ধে (দহন) পরবর্ত্তী সম্বন্ধ সংসাধিত হয়। এ সম্বন্ধ নিত্য; তবে অবস্থান্তরে সম্বন্ধের প্রভিন্নতা হয়—তাহাও নিত্য। অর্থাৎ আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে সম্বন্ধ পৃথক হইবে। যে নিত্য সাদৃশ্য সূত্রে বস্তু সকল গ্রথিত, এবং যে নিত্য প্রণালীতে তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং পারম্পার্য্য সম্বন্ধে সংযত দেখা যায়; তাহাকেই নিয়ম বলে। আমরা একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম, কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল; বার বার পরীক্ষায় লক্ষিত হইল সেই একই ভাব। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এস্থলে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে এইরূপ সংঘটন দর্শনে আমাদের প্রতীতি হইল যে এই কাষ্ঠ সদৃশ পদার্থ, অর্থাৎ, অপর কাষ্ঠ, শুষ্ক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ খানি নয়, অগ্নি সংযোগে (অর্থাৎ অগ্নি ও কাষ্ঠ সমবর্ত্তী হইলে) পরবর্ত্তী ঘটনা দহন দৃষ্ট হইবে। এস্থলে আর একটী দ্রষ্টব্য আছে; সেইটী কাষ্ট এবং অগ্নির জ্ঞাত অবস্থা। কাষ্ঠ (আর্দ্র বা শুষ্কাবস্থায়) অগ্নি সংযোগে (অগ্নিরও বিশিষ্ট অবস্থা বুঝিতে হইবে) দগ্ধ হইয়া থাকে। ইহারই নাম নিয়ম। পদার্থ সম্বন্ধে আমরা এই নিয়ম মাত্র জানি। তাহাদের সূক্ষ্ম প্রকৃতি (essential nature) ও আদি বা উৎপত্তি কারণ প্রভৃতি আমাদিগের জানিবার সামর্থ্য বা সঙ্গতি নাই। বস্তুর অদৃষ্ট সত্তা বা স্বরূপ (absolute existence) মনুষ্য কখন জানিতে পারেও নাই এবং পারিবেও না। এইরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থজ্ঞানকে সুসজ্জিত করাই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। পদার্থ যেরূপ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সেইরূপ ভাবিয়া আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত পারম্পর্য্য সম্বন্ধ প্রণালীবদ্ধ বা সজ্জীকৃত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। " It (science) may be defined as the *systematisation of our knowledge of the order of phenomena considered as phenomena.* It co-ordinates common knowledge. It explains the order of phenomena, by bringing them under their respective laws of co-existence and succession, classing particular facts under general conceptions."—G. H. Lewes. প্রত্যেক বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে। গণিত শুদ্ধ সংখ্যা, জ্যামিতি দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, জ্যোতিষ জ্যোতিষ্কগণের আকৃতি, পরিমাণ, গতি বিধি প্রভৃতি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণ জড়বস্তুর পরিবর্ত্তন, শারীরবিদ্যার শারীরিক প্রক্রিয়াদি, লইয়া আলোচনা করে; কিন্তু প্রকৃত দর্শনের কোন বিশেষ বিষয়ই নাই। ইহা সমস্ত চিন্তা জগতের অধিকারী। মনুষ্য যে অবস্থায় থাকনা কেন, ইহাই তাহার প্রাণের প্রাণ। দর্শনই জীবনের একমাত্র অকৃত্রিম সুখ। বিজ্ঞান ইহারই সেবার জন্য সুদূরপরাহত তত্ত্বনির্ণয়ে তন্ময় হইয়া থাকে। তাহারই প্রেমের বাধা মস্তকে বহিয়া বেড়ায়। দর্শন বিজ্ঞান সাপেক্ষ; বিজ্ঞানই ইহার মূল ভিত্তি। বিজ্ঞান ব্যতীত যথার্থ দর্শনের অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞান দেহ—দর্শন জীবন। "As Science is the systematisation of the various generalities (reached through particulars, so Philosophy is the systematisation of the generalities) of generalities. In other words, Science furnishes the knowledge, and Philosophy the Docrine."—G. H. Lewes.

আমরা উপরিভাগে আত্মতত্ত্ব, আন্বীক্ষিকী ও বিজ্ঞানের যে তিনটী ভিন্ন প্রণালী আছে তাহার কতক তাৎপর্য্য ব্যাখা করিলাম বটে; কিন্তু সকল সময়ে তাহাদের এ প্রকার সুস্পষ্ট ব্যবধান চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এ তিনটীর রাজ্য কখন কখন একত্র জড়ীভূত ভাবে প্রতীয়মান হয়। ফলে মনুষ্যের চিন্তাকাণ্ডের ইতিবৃত্ত দেখিলে এই প্রকার ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ প্রকার ক্রমোন্নতির পারম্পর্য্য জাতীয় ইতিহাসে বিশদ রূপে দেখা যায় না; বরং এক সময়ে একদেশে একজনের মনেও সেই তিন অবস্থাই এককালীন বলবতী দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন বিষয়ে বটে। আদৌ দর্শন আত্মতত্ত্বের একপ্রকার অনুচরের মত ছিল, ক্রমে নিজ স্বাধীনতা ও অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। বিজ্ঞানও সেইরূপ প্রথমতঃ ভয়ে আত্মতত্ত্বের সম্মুখে কোন কথাই কহিতে সাহস পাইত না; যাহাতে তাহার মনস্তুষ্টি হয় তাহাতেই যত্নবান হইত। সতত তাহার তোষামোদ ও স্তুতিবাদ লইয়াই থাকিত। যেমন তত্ত্বের পর তত্ত্ব, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, জয়ের পর জয়, দেশের পর দেশ, বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার বলবিক্রম বাড়িল, অনুচর বাড়িল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভয় ভাঙ্গিতে লাগিল। এখন তাহার অতুল সাহস, অসীম প্রতাপ এবং অপরিমেয় আত্মনিষ্ঠা। এখন আত্মতত্ত্বের

পক্ষে তাহার সম্মুখীন হওয়া ভার। ত্রাসে সততই সে নিজ দুর্গ মধ্যে থরহরি কাঁপিতেছে। কখন কি হয় ভাবিয়াই আকুল। এক্ষণে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া মিটাইবারই সম্পূর্ণ চেষ্টা। কিন্তু দুই জনের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; মিটিবার উপায় কই? চতুর্দ্দিকে মহামহোপাধ্যায়গণ সন্ধি করাইয়া দিবার জন্য ভয়ঙ্কর উৎসুক। তা বই, এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন সুবিধাই তো দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে কি হয়, তাহা ভবিষ্যৎই জানে। উভয়ের কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। দর্শন সন্ধি স্থাপন মানসে মধ্যে আসিয়া দুই জনকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়াছে। আত্মতত্ত্বের প্রণালী প্রমাতৃগত (subjective); এবং বিজ্ঞানের প্রমেয়গত (objective) সুতরাং উভয়ে বিষম দ্বন্দ্ব হইয়া আসিতেছিল এবং এ অবস্থাতে বিষম দ্বন্দ্বই সম্ভাবনা। দর্শন প্রমাতৃগত ও প্রমেয়গতের মধ্যবর্ত্তী রহিল; মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত করিবার আশয়ে উভয়কূল সংযুক্ত সেতুস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। পরিবর্ত্তনের নিয়মই এই। কোন একটী সংস্কার বিপরীত সংস্কারে যাইবার মুখে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। তরল পদার্থ যেরূপ জল ও কঠিন পদার্থের মধ্যবর্ত্তী; দর্শন সেইরূপ আত্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যবন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তথাপি কোন মতেই সে পূর্ব্ব বিবাদ আজ পর্য্যন্তও ভঞ্জন হয় নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, দ্বন্দ্ব আর উত্তর উত্তর এখন বাড়িয়া উঠে নাই বরং পূর্ব্বে যেরূপ দ্বেষবিদ্বেষের কালাগ্নি ছুটিয়াছিল, এখন সে পরিমাণে ধরিলে অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, বলিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে আত্মতত্ত্ব আজকাল প্রায় একেবারেই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। এই তিন জনকে তিনটী পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করাই এক্ষণে অনেকে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছেন, এবং সেইরূপে তাহাদের বাদবিসম্বাদ মিটাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। বিজ্ঞান দর্শন পরিণত করা, এবং দর্শনকে ধর্ম্মে পরিণত করাই তাঁহাদিগের প্রধান যুক্তি। মহাত্মা কোঁত একজন ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। তিনি সেই জন্য মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের উদ্ভাবন করেন। ফলে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিবার অবসর নাই। "If the Positive Philosophy be anything, it is a doctrine capable of embracing all that can regulate Humanity; not a treatise on physical science, not a treatise on social science, but a system which absorbs all intellectual activity.....In other words, it aims at creating a Philosophy of the Sciences as a basis for a new social faith." "The future of

Philosophy is in this task of reconciliation."—History of Philosophy, G.H. Lewes. হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও সেই পথের পথিক। তবে তিনি আর একটু অধিক মাত্রায় উঠিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে কোঁতের অনুগমন করিয়াও তদীয় প্রস্তাবনার অনেকটা অন্যায্যতা সম্প্রসারণ করিয়াছেন। "How to find this something—how to reconcile them, this becomes the problem which we should perseveringly try to solve. Not to reconcile them in any makeshift way—not to find one of those compromises we hear from time to time proposed, which their proposers must secretly feel are artificial and temporary; but to arrive at the terms of a real and permanent peace between them. The thing we have to seek out, is that ultimate truth which both will avow with absolute sincerity—with not the remotest mental reservation." -- First Principle, p. 21.

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আত্মতত্ত্বের প্রণালী প্রমাতৃগত (subjective), বিজ্ঞানের প্রমেয়গত (objective), এবং দর্শনের এতদুভয়ের সামঞ্জস্য মাত্র। বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের মিলন করাই সকল অনুসন্ধানের মুখ্য কল্প। প্রমাতৃগত প্রণালীটী সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বা কাল্পনিক; দ্বিতীয়টী বাস্তবিক, এবং তৃতীয়টী আনুমানিক, অর্থাৎ, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। প্রমাতৃগত প্রণালীতে মানসিক ধারণামত সকল সত্যই সংগঠিত করা হয়। ইহাতে মানসিক ধারণানুসারে ঘটনাবলির পরম্পরা নিরূপিত হইয়া থাকে; এবং সেই মানসিক ধারণার পারম্পার্য্যর ছবির সহিত প্রকৃত ঘটনাবলির পারম্পর্য্য প্রতিপদে ঐক্য হউক, আর নাই হউক, মনোগত প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হইয়া সেই বাস্তবিক ঘটনাবলির পারম্পর্য্য স্থির সংকল্পে চিন্তাস্রোত ধাবিত হয়, এবং সেই চিন্তাস্রোত বাস্তবিক ঘটনার অনুশাসনে থাকে না। ইহাতে ঘটনাবলির নিয়মাদি চিন্তারাজ্যে উদ্ভাবন হইয়া সেই চিন্তামার্গেই চলিতে থাকে, এবং বাস্তবিক ঘটনার সহিত তাহার কোন ঐক্য বা অনুশাসন থাকে না। প্রমেয়গত প্রণালী ইহার ঠিক বিপরীত। ইহাতে মানসিক ধারণা বস্তুগত—অর্থাৎ, বাস্তবিক ঘটনামত মানসিক ধারণা সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে বস্তুপরম্পরায় যেমন যেমন ইন্দ্রিয়ানুভূত হয়, মানসিক ধারণাও সেইরূপ প্রতিপদে তাহার অনুগমন করে। এ প্রণালীতে চিন্তাতরঙ্গ ঘটনাতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে তালে তালে চলিতে থাকে। মনে যে পূর্ব্ব ধারণা থাকে তাহাকে প্রতি কথায় বাস্তবিক ঘটনার সহিত বিধিমত ঐক্য

করা হয়। পূর্ব্ব প্রণালীতে ইন্দ্রিয়বোধের অনুমানে পারম্পর্য্যের ধারণা, তৎপরে জাগতিক ব্যাপারকে তদনুরূপ স্তরে স্তরে সাজাইবার আগ্রহই সমধিক। দ্বিতীয় প্রণালীতে ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলির আলোচনা; তৎপরে পারম্পর্য্যের ধারণা। উভয় প্রণালীতে অনুমান আবশ্যক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুমান স্বপ্ন নহে, একটা যা তা ধরিয়া লওয়া নহে। ইহারও বন্ধন আছে—সঙ্কেত আছে। কাস্তে দেখিয়া তুণ্ড অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত। সকল অনুমানের মূলেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ আছে; নতুবা অন্ধের হস্তিদর্শন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তুরই সঙ্গে কতকটা অনুমান থাকে। বস্তুর সকল গুণই সকল সময় একবারে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং আংশিক অনুমান থাকে। বস্তুর দৃষ্ট লক্ষণ দ্বারায় অদৃষ্ট সমবায় লক্ষণ অনুমান করিতে হয়। জ্ঞানের পরম্পরায় এই দুইটি প্রধান অঙ্গ দেখা যায়; দর্শন হইতে অনুমান এবং অনুমান হইতে সপ্রমাণ। দর্শনের প্রমাণ নাই; অনুমানের প্রমাণ অপরিহার্য্য। অনুমান যতক্ষণ না সাব্যস্ত হইতেছে ততক্ষণ সত্য নহে। প্রমাতৃগত প্রণালীতে অনুমান আছে, কিন্তু তাহার আর সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস নাই। ইহা জ্ঞানপক্ষে একপদ ভঙ্গ বলিতে হইবে। যদি জ্ঞানের দুইটী পদ থাকে; যথা দর্শন হইতে অনুমান, এবং অনুমান হইতে সপ্রমাণ; তাহা হইলে ইহার অঙ্গহীন দোষ হইতেছে। ইহাতে জমা আছে খরচ আছে—রেওয়ার মিল নাই; সুতরাং প্রকল্পনাই (hypothesis) ইহার প্রকৃত কার্য্য। প্রমেয়গত প্রণালীতে রেওয়ার মিল আছে; ইহাতে সকল অনুমানই সাব্যস্ত না হইলে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। প্রতিপদে ইহাতে অনুমানকে বাস্তবিক ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। সর্ব্বাংশে অন্যথা হইলে অগ্রাহ্য। প্রথমটি মনের অশিক্ষিত স্বাভাবিক গতি। মন তখন স্বাধীন ভাবে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই ছুটিতে থাকে, এবং এইরূপে ক্রমে বৃথা ছুটাছুটি করিতে করিতে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান জন্মিতে থাকে ও চতুর্দ্দিকে বন্ধন পড়িয়া যায়। পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরের চতুর্দ্দিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, এবং, এমন কি, তাহাতে নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে; ক্রমে দিন দিন যখন দেখিতে পায় যে এরূপ করা নিতান্ত নিষ্ফল—এ বন্ধন এড়াইবার সাধ্য নাই—তখন ক্রমে পোষা হইয়া আইসে; অর্থাৎ, শিক্ষিত হয়, ইহাকেই জ্ঞান বলে, এবং সেই জ্ঞানযোগে ক্রমে আপনিই সে ছটফটীতে ক্ষান্ত পায়। প্রথম চিন্তা অশিক্ষিত বন্য—সে নিজ বেগমত সকলি ভাবিয়া যায়, বা সিদ্ধান্ত করে—বাস্তবিক ব্যাপারে দৃষ্টি রাখে না। তাই আত্মতত্ত্ব চিন্তার প্রাক্‌কালে এত প্রবল। তাই তখন জড়শক্তি বন্ধন এড়াইবার এত চেষ্টা—একবারে

বেগভরে আকাশে উঠিবার বাসনা; দ্বিতীয়াবস্থায় সে বেগ অনেক হ্রাস হইয়া আইসে; তখন বাহ্যিক জ্ঞান ও মনোবেগ সম্যক্ সংঘর্ষণে সাম্যভাবে থাকে; তখন বহির্জগতের ছবি পূর্ব্বমত আর অস্ফুট নাই। তৃতীয়াবস্থায় বহির্জগৎ প্রবল—অর্থাৎ তাহার প্রতিফলিত পারম্পর্য্য চিন্তার পরিমাণ। ইহাতে বিবেক শাসন করিয়া থাকে। প্রথমটীর সারাংশ দর্শন এবং অনুমান; তাহাও দ্বিতীয়াবস্থায় আছে এবং অতিরিক্ত একটী অঙ্গও আছে; যথা প্রমাণ প্রয়োগ। পূর্ব্ব প্রণালীতে যাহা অন্যায্য, অসার বা অসম্পূর্ণ আছে, ইহাতে তাহা পরিত্যাগ বা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িক উভয়েই অনুমানের সাহায্য লইয়া থাকেন বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অনুমানে এবং দার্শনিকের অনুমানে বিস্তর প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক নিজ অনুমানমালা বহির্জগতের কার্য্যপরম্পরায় সপ্রমাণ করিয়া লন—দার্শনিক নিজ চিন্তার উপর নির্ভর করিয়া সে পরীক্ষা করিবার অবসর বা প্রয়াস পান না। বিজ্ঞানের স্বীকৃত তত্ত্ব (datum) একটা যা-তা হইতে পারে না। শুদ্ধ অনুমানের উপর ইহার কোন প্রত্যয়ই নাই, যতক্ষণ না তাহার বাস্তবিক ঘটনাবলির সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, ততক্ষণ তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। প্রমাতৃগত প্রণালীতে সত্য মানসিক ধারণামত স্থিরীকৃত হয়, এবং প্রমেয়গত প্রণালীতে সত্য বস্তুর পারম্পর্য্যে ছাঁচে সংগঠিত হইয়া থাকে। একটীতে বস্তুর পারম্পর্য্য চিন্তামূলক; আর একটীতে চিন্তার পারম্পর্য্য বস্তুর পারম্পর্য্যসম্ভূত। প্রথমটীতে মানসফলকে বহির্জগতের প্রতিবিম্ব অন্তর্জগতের গতিতে পরিষ্কার প্রতিফলিত হইতে পায় না; সুতরাং ভ্রমপ্রমাদাদি স্বতঃই আসিয়া পড়ে; কারণ আমরা সেই বিচ্ছিন্ন ছবিকে সারিয়া লইবার জন্য মনগড়া অনেক বিষয় ফাঁকের ঘরে বসাইয়া দিই, এবং এইরূপে জাগতিক কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকি। এই জন্য এ প্রণালীতে মনে যে সকল ধারণা বা তথ্য স্থির করা যায়, তাহা প্রায়ই ভ্রমাত্মক হইয়া পড়ে। স্বপ্নাবস্থার মত এ অবস্থাতে বহির্জগতের পারম্পার্য্যের সহিত মানসিক ধারণার পারম্পর্য্যের প্রায়ই ঐক্য থাকে না। স্বপ্নেও আমরা চিন্তা করি, বিচার করি, সিদ্ধান্ত করি; কিন্তু তৎসমুদায়ের সহিত বহির্জগতের পারম্পর্য্য থাকে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন স্বপ্নে কি তাহা হইলে আমরা কার্য্য এবং তৎপ্রণালী রচনা করি—তাহার সহিত কি বহিঃর্জগতের কোন সম্বন্ধই নাই? ফলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বহির্জগতের ছবিমাত্র—তবে তাহাতে একের স্কন্ধে অপরের মস্তক আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ বহির্জগতের পারম্পর্য্য থাকে না; এই মাত্র প্রভেদ। স্বপ্নে

দেখিলাম একটী ঘোড়া উড়িতেছে। আমরা জাগ্রতাবস্থায় ঘোড়া দেখিয়াছি, এবং পক্ষিগণকে উড়িতেও দেখিয়াছি; স্বপ্নে পক্ষীর উড়ন ঘোড়ায় নিয়োজিত হইল। এস্থলে ঘোড়া চতুষ্পদ জন্তু, ছুটিতে পারে, উচ্চ এত, দেখিতে এমন, এবং পক্ষী খেচর, পক্ষবিশিষ্ট, দেখিতে এমন, প্রভৃতি, মনে অস্ফুটভাবে প্রতিফলিত হইল, এবং এদুয়ের পারম্পর্য্য মানসিক অবসাদ প্রযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে দূরে অস্পষ্ট হইয়া মিশাইয়া গেল। জাগ্রত অবস্থায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করিলে তাহাকে মিশ্র কল্পনা (compound imagination) বলা যায়। বাতুলের মনে অনেকটা প্রমাতৃগত ভাবই প্রবল? দৃষ্টিভ্রম, বিকারের প্রলাপ, স্বপ্ন, পাগলামী, প্রভৃতি সকলই প্রায় একজাতীয়; অর্থাৎ, এ সকলে মনের প্রমাতৃগত অবস্থাই প্রবল। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়বোধে ভ্রান্তি নাই; ভ্রান্তি অনুমানে। এইবার অনেকে বলিবেন—কেন পাণ্ডুরোগে যে সমস্ত হরিদ্রাবর্ণ দেখায়, তাহা কি দৃষ্টিভ্রম নহে? ইন্দ্রিয়বোধ অর্থে রুগ্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে অভ্রান্ত বলিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য? আমাদিগের তদ্ব্যতীত গতি নাই—আমরা তদতিরিক্ত জানিতে পারি নাই। যদি "আমির" আমিত্ব ভ্রান্তি হয়, যদি আমার ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্ত হয়—তবে আমিই ভ্রম—এবং আমার সত্যও ভ্রান্তি হইবে;—তখন সে মিথ্যা "আমিই" আমরা সত্য "আমি" বলিয়া ধরিব এবং ভ্রমই আমাদের সত্য হইবে—নচেৎ আর উপায় কি? সেই অনুভূতি যখন যাইবার বা সংস্কার হইবার নহে—তখন আর আমরা কি করিব? এস্থলে 'আমি' বা 'আমার' মনুষ্যের সমষ্টিতে প্রয়োগ হইল, কেননা আমাদিগের জ্ঞানকাণ্ড একের উদ্ভাবিত বা কাহার নিজস্ব নহে। 'আমাদের জ্ঞান' অর্থে সমগ্র মনুষ্যের জ্ঞানকে বুঝাইবে। মানুষের একেলার জ্ঞান জ্ঞানই নহে। ইন্দ্রিয়বোধে যে ভ্রান্তি নাই, এ কথা কে বলিল? মনে কর যাহাকে আমরা লালবর্ণ বলি, তাহা হয়ত প্রকৃত হরিদ্রাবর্ণ হইতে পারে, আমাদের লাল বোধ হইতেছে। হরিদ্রা হয়—হউক; আমরা উহাকে লালই বলিব—এবং লাল বলিয়াই মানিব; সেরূপ ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা ধরিয়া লইব না। এস্থলে যে শুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া ধরিব না, এমন নহে—কেমন করিয়া কোন্ অধিকারে ধরিব? ধরিবার যখন উপায় নাই, তখন যেমন ইন্দ্রিয়বোধ হইবে সেই রূপেই জানিব ও মানিব। আমাদের ইন্দ্রিয়ে স্বতঃই অচল বিশ্বাস। তাহাদের অনুভূতি সকল জ্ঞানেরই মূল। আমরা যাহাতে দুঃখ অনুভব করি—অপর জীবে যদি তাহাতে সুখ অনুভব করে—করুক; তাহাতে আর আমাদের উপায় কি? আমরা কখনই তাহাতে সুখ পাই নাই এবং পাইবও না—সুতরাং সুখ বলিবও না। পেঁচক অন্ধকার ভালবাসে—কেননা তাহার চক্ষের সংগঠনে সূর্য্যালোক কষ্টকর বোধ হয়; তাহাতে আমি আমার চক্ষে সেরূপ অনুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারি না; সুতরাং আমি সে অন্ধকারে সুখী হইতেও পারি না। এস্থলে পেঁচার যাহাতে সুখ অনুভূত হয়—আমার তাহাতে দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। আমার মীমাংসা আমি করিব—পেঁচার মীমাংসা পেঁচা করিবে। আমার ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত আমার গতি নাই; পেঁচার ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত পেঁচারও গতি নাই। এস্থলে পরস্পরের ইন্দ্রিয়বোধ সমান না হইলে সমান অনুভূতি কিরূপে সম্ভব? তবে কি আমার অনুভূতি আমি ফেলিয়া দিব,—না পেঁচা পেঁচার অনুভূতি ফেলিয়া দিবে? না এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন একটা কিছু ধরিয়া লইব?—না সুখ দুঃখ একবারে নাই বলিব? আর মুখে বলিলেই বা কি হইবে? ফলতো এড়াইবার উপায় নাই! তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব। আমার যে দৃষ্টিজ্ঞান আছে, অন্ধের তাহা নাই। তবে অন্ধ কি করিবে? সে আপনার জ্ঞান লইয়াই থাকিবে, এবং আমার যে দৃষ্টিসুখ আছে তাহার সে সুখ নাই শুনিয়া দুঃখিত হইবে। এভিন্ন আর উপায় কি? সে নহে উর্দ্ধ সংখ্যায় এই বলিবে যে চক্ষের যাহা সুখ তাহা আমার নাই—তাহা কি, আমি জানি না এবং জানিতে পারিও না; তাহা আমি পরের মুখে শুনিতেছি মাত্র। মনুষ্য অপেক্ষা যদি কোন উচ্চ শ্রেণীর জীব থাকে (আমরা দেবাদি যেরূপ কল্পনা করি) এবং কোন লোকাতীত ইন্দ্রিয়বলে যদি তাহার জগতের নির্গুণ সত্তা উপলব্ধি হয়—হউক; আমি মানুষ, তাহার অধিকার লইয়া কি করিব? আমি আমার মতই চলিব। যেহেতু মনে করিলে সে সত্তা কিছু আমি অনুভব করিতে পারিব না। যত দিন না আমার সেই অতিরেক ইন্দ্রিয়প্রাপ্তি হইতেছে, তত দিন আমি বর্ত্তমান অবস্থামত সকল হিসাবকিতাব করিব। যাহার "হাউস্" আছে—সে প্রকৃত "লেজর" রাখুক; আমি সামান্য ব্যবসায়ী, সংসারের সকল আয়ব্যয় সামান্য "মিমো" বহিতেই সারিব। কবে "হউস" হইবে, এবং হইবে কি না, "হউস" কোথাও আছে কি না, বা "হউস" হয় কিনা, এবং হইতে পারে কি না, কিছুই জানি না, আগে লেজরের মীমাংসা কি করিয়া করি। পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপকেই লোকে পৃথিবী বলিয়া জানিত; কলম্বসের আবিষ্কারের পর লোকের দৃষ্টি বাড়িল। এখন নূতন মহাদ্বীপ পৃথিবীর অর্দ্ধখণ্ড। কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবীর আরও অংশ আছে বলিয়া বিশ্বাস করা বাতুলের কর্ম্ম। ফলে সেই কলম্বসের শুদ্ধ কথাতে কি আমেরিকার অস্তিত্ব, তাহা হইলেও কই কোন উচ্চ শ্রেণীর জীব তো আসিয়া কখন আমাদের

বলে নাই যে "তোমাদের ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্ব আছে;" এবং বলিলেও আমরা সহসা বিশ্বাস করিতাম না যেহেতু আমাদের সে অনুভূতিই নাই—এবং বিশ্বাস করিলেও মনে একটা কোন ধারণা হইতে পারে না। তবে যদি "খুদির মায়" উপর ধ্রুব বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে নয় কথায় কথায় উপস্থিত "ব্যাইকে" সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিতাম "হাঁ হে! তুমি না কি মরেছ?" কেননা "খুদির মা" তো মিথ্যা কথা কহিবার লোক নয়।" একটা বিষয় দশ বার দেখিয়াও সহজে বিশ্বাস হয় না তা শুদ্ধ শুনিয়া কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? সায়ামের রাজার বরফে বিশ্বাস হয় নাই, তাহা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে—তাহা হইয়াই থাকে। সায়ামের রাজা মনুষ্যোচিত কার্য্য করিয়াছিল। পাদ্রী সাহেবের বরফ দেখিয়া চক্ষু পচিয়া গিয়াছিল—তাঁহার তাহাতে হাস্য আসিবে বই কি? তিনিও মনুষ্যোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি মনে করিতে লাগিলেন রাজা কি মূর্খ! এ সামান্য বরফ বিশ্বাস করিতেছে না—আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। পাদ্রী সাহেবও, বোধ হয়, সেইরূপ নির্ব্বোধের মত সায়ামের হস্তিতে বিশ্বাস করিতেন না; এবং বুদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াও বলিতেন "পৃথিবীতে নিরীশ্বর মনুষ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, নিরীশ্বর জাতি নাই,—নিরীশ্বর ধর্ম্ম হয় না—এবং নিরীশ্বরদের নীতি সেশ্বরদিগের নীতির মত স্থায়ী বা বলবতী নহে।" সে যাহা হউক, ইন্দ্রিয় বোধে ভ্রান্তি নাই, অনুমানেই ভ্রান্তি সম্ভব। আমাদের এক সময় বস্তুবোধ একেন্দ্রিয়গত হইয়া থাকে; সুতরাং, তদ্বিষয়ে অন্য ইন্দ্রিয়বোধ আমরা অনুমান করিয়া লই। সকল বিষয়ে ত্বরা কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত রূপই আমরা অনুমান করিয়া থাকি। সম্মুখে অট্টালিকা দেখিলাম—অমনি অট্টালিকার দৃষ্টিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনুমান করিয়া লইলাম—নতুবা কার্য্য-কালে কে আর অট্টালিকার স্পর্শ, ঘ্রাণ, প্রভৃতি অনুভব করিয়া বলে, ইহা অট্টালিকা। আমি একটী ফুল দেখিলাম। দেখিবা মাত্র তাহাকে ফুল বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সেই জ্ঞানটী বিশ্লেষ করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আমার চৈতন্যে (Consciousness) (শুদ্ধ নেত্রবোধ) বর্ণ আসিল, অর্থাৎ একটি বর্ণবিশিষ্ট বস্তু। আমি পূর্ব্বে সেই বর্ণবিশিষ্ট ফুল, অর্থাৎ, তাহার সদৃশ ফুল দেখিয়াছি; সুতরাং সেই বর্ণের ও আকার প্রকারের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ, কোমলত্ব, প্রভৃতি মনে যে ধারণা গাঁথা আছে—তাহারা সকলে ঐ বর্ণের সহিত পরপর সমস্ত মালাই আসিয়া জুটিল; কেননা, ফুলের এ সকল গুণ আমার পূর্ব্বে অনুভূত ছিল। ফুলের ধারণামালা আমার মনে পূর্ণ আছে। এস্থলে প্রত্যক্ষ বর্ণ ও আকার

(আকার স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও পরিশেষে দর্শনে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে) অনুমানের (গন্ধ, কোমলত্ব প্রভৃতির) সমষ্টির নাম ফুল। কিন্তু এ অনুমানও পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের ফল; অভ্যাসবশতঃ সেই পূর্ব্বফল প্রত্যাশায় অনুমান করা হয়। সুতরাং গন্ধ না লইয়া, স্পর্শ না করিয়া, পূর্ব্বজ্ঞান প্রযুক্ত দূরস্থিত দৃষ্ট কুসুমকে কুসুম বলিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন না কোন অনুমানটী ভ্রান্ত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান অভ্রান্ত। দৃষ্ট বস্তু কাপড়ের বা সোলার হইতে পারে। পরে গন্ধ লইয়া ও স্পর্শ করিয়া দেখিলাম ভুল হইয়াছে। কিন্তু ইহা দৃষ্টির ভ্রম নহে; চক্ষে অবিকল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ফুলবর্ণ না দেখিলে আর আমি অন্য অনুমানে যাই নাই। আবার বর্ণ ঠিক হইলেও সুগন্ধ অনুমান ভুল হইয়াছিল। দৃষ্টি কিন্তু সর্ব্বথা অভ্রান্ত রহিয়াছে, তাহাতে ফুল-বর্ণ ঠিক অনুভূত হইয়াছে; তবে একটী অনুমানের ভুলে ফুলভ্রম হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষ প্রতীত হইতেছে যে যখন এত সামান্য বিষয়েও অনুমানে ভুল হয়; তখন প্রমাতৃগতপ্রণালী নিঃসংশয় নহে। প্রমেয়গতই যথার্থ নিঃসংশয়, কারণ ইহাতে প্রতি পদে বস্তুর পারম্পর্য্যের সহিত মানসিক ধারণা পারম্পর্য্যের ঐক্য করিয়া লওয়া ব্যবস্থা; এবং পূর্ব্ব মানসিক ধারণামালা প্রতিবার সেই বাস্তবিক পারম্পর্য্যের সহিত ঐক্য করিয়া দেখাই তাহার প্রকৃতিগত। এরূপ সাব্যস্ত না হইলে ইহাতে সত্য প্রতিপাদন হয় না। প্রমেয়গত প্রণালীর চক্রের ন্যায় গতি—নিয়তই ঘুরিতেছে; যেখান হইতে যেমন পরপর জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, সেইখানেই আবার পুনশ্চ তাহার পরপর যথাযথ সপ্রমাণ করিয়া লইতেছে। ইন্দ্রিয়বোধেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি; আবার সকল জ্ঞানকেই বিশ্লেষ করিয়া সেই ইন্দ্রিয়বোধে মিলাইয়া দেখাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম। এইরূপ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষের পারম্পর্য্যের অবিচ্ছিন্ন ভাবই জ্ঞানের প্রকৃত মূর্ত্তি। কোন একটী ঘটনা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইল; অর্থাৎ, তদ্বিষয়ে মনে একটী ধারণামালা জন্মিল, পুনশ্চ তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইলে পূর্ব্ব ধারণামালার সহিত পরবর্ত্তী ধারণামালার প্রতি পদে সম্পূর্ণ ঐক্য করিয়া মিলাইয়া দেখাই প্রমেয়গত প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপ্রত্যক্ষে কোন বিষয়ে মনে যে ছবি অঙ্কিত হয়, সেই বিষয়ে পরবর্ত্তী প্রত্যক্ষের ছবির সহিত ঐক্য না হইলে, সত্যের ব্যত্যয় জন্মে। যেমন কয়েকটী সীসার অক্ষর পরপর সাজাইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কথা হইল; সেই সাজান ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, এবং পুনশ্চ পূর্ব্বের মত যার-পর-যা সাজাইয়া লইলাম; দেখিলাম আবার সেই নির্দ্দিষ্ট কথাই সংরচিত হইল, কোন ব্যতিক্রম জন্মিল না; তখন মনের ধারণা স্বভাবতঃই

প্রবল হইয়া উঠিল,—যে এই,—এই অক্ষর এই—এইরূপে সাজাইলে এই কথাই পাওয়া যায়—অর্থাৎ এই কথার এই—এই অক্ষরের এইরূপ পারম্পর্য্য আছে। সত্যের অনেকটা এইরূপ ভাব। জ্ঞানের যদি কোন আবশ্যক থাকে, তাহা এই পারম্পর্য্য আয়ত্ত করিবার জন্য মাত্র। যেমন কথাও আমরা অভ্যাস বশতঃ দুই একটা অক্ষর দেখিবা মাত্র অনুমানের সাহায্যে ত্বরায় সমস্ত পড়িয়া যাই; অভ্যাসগুণে সকল বিষয়েই সর্ব্ব সময়েই আমরা সেইরূপ অনুমান খাটাইয়া থাকি। মনে কর পশ্চিমে মেঘ আর বৃষ্টির পারম্পর্য্য যথার্থ আমাদের অবিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহা হইলে পশ্চিমে মেঘ দেখিলেই বৃষ্টি অনুমান স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। বিজ্ঞানের এইরূপ ভাবী দৃষ্টি—ভবিষ্যদ্জ্ঞান। ইহাকেই স্বাভাবিক নিয়ম আয়ত্ত করা বলে। এইরূপ আয়ত্ত করিবার জন্যই আমাদিগের বিদ্যার আবশ্যক। বিজ্ঞানের এই চূড়ান্ত গৌরব! মনুষ্য-বুদ্ধির এই সীমান্ত সাধনা! আমাদিগের জীবনের এই একমাত্র চরম উদ্দেশ্য!—আমাদিগের জ্ঞানপিপাসার এই গূঢ় তাৎপর্য্য। মানুষ যে ভাবে যথায় থাকুক না কেন, সংসারে বা অরণ্যে, সভ্যতার উচ্চতম সমুজ্জ্বল শিখরে, বা বর্ব্বরত্ব এবং অসভ্যতার গাঢ় তিমিরময় কন্দরের অন্তস্তলে; বিলাসের কমনীয় কুসুমময় নিকুঞ্জ ভবনে, বা উৎকট বৈরাগ্যের মরুভূমে, সর্ব্বত্রই তাহার সেই এক আকাঙ্ক্ষা—একই উদ্দেশ্য—একই পিপাসা! স্বাভাবিক নিয়মাদি অবগত হইয়া তাহার কার্য্য পারম্পর্য্য আয়ত্তাধীন করাই জীবনের সার কল্প।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

প্রভাতী।

১

যুগব্যাপী ঘোরতর ঘনঘটা পরিপূর্ণা তিমিরা রজনী—
স্বপ্নে অবসান প্রায়—অই দেখ দেখা যায়—
ঊষার নিশান ধীরে উড়িছে পূরবাম্বরে;
এখন(ও) কু-আশা কিন্তু রেখেছে ঢাকিয়া ভাই! দীপ্ত দিনমণি!
ফুটে ফুটে উঠে অই অরুণ কিরণ, তায় ভাতিছে অবনী!!

২

রাঙ্গা রাঙ্গা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রক্তাম্বুদ পট লেখা ভাসিছে অম্বরে!
গাঢ়তর বাষ্পজালে, ক্ষণে তা ঢাকিয়া ফেলে,
আবার উজলে সব, বিহঙ্গেরা করে রব,

কুয়াশা-বিষিক্ত-ম্লান কমল কলিকাকুল ফুটে সরোবরে।
পল্লবে পল্লবে ঝড়ে শিশির সলিল ধীর প্রভাত সমীরে।

৩

অস্ফুট আলোকে পুনঃ জাগিতেছে ধীরে ধীরে ভারত জননী
আধ আধ ঘুম ঘোরে, আঁখি উন্মীলিত ক'রে,
চাহিছে বিহ্বল মনে, তন্দ্রার আলস্য সনে
কি কথা কহিছে তাহা বুঝা নাহি যায়; চিন্তা ম্লান মুখখানি
বিশুষ্ক কমল যেন অশ্রুর শিশিরে সিক্ত মরিগো জননী!!

৪

এ কি মা? এখনও কেন তন্দ্রা অভিভূত হ'য়ে দেখিছ স্বপন?
পোহায়েছে বিভাবরী, উঠ মা আলস্য ছাড়ি!
তোমার সন্তান মোরা, অন্ন বিনা দিশাহারা
হইয়া সংসার পথে বিলুণ্ঠিত, বিচূর্ণিত এ তৃণ জীবন!
কেন মা! কি পাপে মোরা এত হীন, এত হেয়, হয়েছি এখন?

৫

তব রাজ্য, তব গৃহ, তোমারি সর্ব্বস্ব কিন্তু তুমি নও কেহ;
কোথাকার কেবা এসে, তোমার গৃহেতে "বসে",
হাসে খেলে খায় দায়, যাহা পায় লয়ে যায়,
আবার তোমারি বক্ষে করি পদাঘাত করে বিষম বিদ্রোহ!
রোষ-কষায়িত ভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করে মহা ভয়াবহ!!

৬

শঙ্কায় বিহ্বল তব মৃতকল্প পুত্রগণে করে বেত্রাঘাত!
মর্ম্মান্তিক নিপীড়নে, ভগ্ন দেহ ভগ্ন মনে,
ভুলি মান অভিমান, বাঁচাতে নির্জ্জীব প্রাণ,
ভিক্ষুকের বেশে মোরা ফিরি দেশে দেশে, ভিক্ষা মিলে যদিস্যাৎ
কবলিত গ্রাস শুদ্ধ কেড়ে লয় বলে মাগো! এত সাধে বাদ!

৭

সপ্ত শত বর্ষ আজ পরের পদেতে তুমি গিয়াছ বিকায়ে!
জগতে নূতন অতি, আরাবী, ইসলাম জাতি,
না জানি কি পাপে হায়, প'ড়ে তাহাদের পায়,
লুটাইলে বীরপ্রসূ রাজরাজেন্দ্রাণি! লজ্জা-ঘৃণা-শূন্যা হ'য়ে—
পঞ্চশত বর্ষকাল মাতঃ! কত বজ্রাঘাত সহিলে হৃদয়ে!

৮

অনিবার অত্যাচার কত কাল স'বে আর নীরবে প্রকৃতি !
তাই তব পুত্রগণে, বিপন্ন ব্যাকুল মনে,
হীন ষড়যন্ত্র করি, ক্লাইবের করে ধরি,
বসাইল সমাদরে সিংহাসন'পরে, ধন্য, ধন্য রে নিয়তি !
মা ! তোমার ভাগ্যলিপি সেই হতে অন্য মতে হইল বিকৃতি।

৯

অহো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-প্রমুখ ধীমান্‌গণ ! তোমাদেরি বলে,
পলাশীর ক্ষেত্র পরে, (যুদ্ধ নহে দাঙ্গা ক'রে)
হয়েছে যে বাহাদুরি, ইতিহাসে সে চাতুরী,
সে বিশ্ব স-ঘাতকতা, বাঙ্গালীর সে নীচতা,
কালস্রোতে ধুইবে না—লেখা রবে চিরকাল জলন্ত অনলে !!
লালা কাটি সিন্ধু-স্রোতঃ আনিয়া গৃহেতে নিজে ডুবিলে অতলে।

১০

অজা মেষে বাদ করি কুম্ভীরের কাছে গেল বিচারের তরে।
কুম্ভীর সুযোগ বলে, উভয়েই ধরে খেলে,
মিটে গেল বিসম্বাদ, মিটিল সকল সাধ,
অধিক ডুবিলে মাতঃ চিরকাল তরে, তুমি দুর্ভাগ্য সাগরে।
ডুবিল সকল আশা, জননী গো ! আর তুমি উঠিবে কি ফিরে ?

১১

সেই হ'তে দিন দিন তোমার অদৃষ্ট-চক্র বিচিত্র গতিতে
ঘুরিতেছে অনিবার, এক যায় আসে আর,
তোমার বিধাতা যত, সংখ্যা করি কব কত ?
নিত্য নিত্য শত শত বিধি ব্যবহার ঘোর পরিবর্ত্তনেতে,
ত্রাহি ত্রাহি শব্দে মোরা কাঁদি দিবা রাতি, তাহা কে শুনে কর্ণেতে ?

১২

জলৌকা যেমন ধীরে নীরবে দেহের রক্ত করে আশোষণ,
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতভাবে, শক্তিহীন করে জীবে,
শেষে অচেতন ক'রে, ফেলে ভূমিসাৎ ক'রে ;
সেই মত শত শত "জলৌকা বিধানে" প্রাণ যায় যে এখন।
রক্তহীন, মজ্জাহীন, দেহ ভার বহি, শক্তি নাহিক এমন।

১৩

খই, মুড়ি, মোয়া দিয়া অবোধ বালকদিকে ভুলায়ে অনা'সে,
ঘৃত মধু ক্ষীর সর,—খায় ; মোরা হয়ে পর
চেয়ে দেখি দূর হতে, নিকটে না পাই যেতে,
বলিলে সে কথা ক্রোধে জ্বলিয়া দ্বিগুণ বাঁধি রাখে বিধিপাশে,
প্রবাসী পথিক প্রায় হইয়াছি মোরা, থাকি আপনার বাসে।

১৪

যাহা ছিল তাই ভাল অত্যাচারি বাঞ্ছনীয় আশা আ'ছে তায়,
লর্ড লিটনের মত, গবর্ণর শত শত
আসি, ঘোর বজ্রাগুনে, পোড়াক পতঙ্গগণে,
পুড়িয়া পুড়িয়া খাটী হলে এ পতিত জাতি উঠিবে ত্বরায়।
আসুক আসুক "লর্ড লিটন" আবার "দেব বিপণে" কে চায় !!

১৫

যে চাহে সে বুঝেনাক মানব প্রকৃতি নীতি ; কি হবে তাহাতে ?
থাকুক আঁধার রাশি, চাহি না বিদ্যুৎ হাসি,
কি ফল তাহাতে বল, আঁখি মাত্র ধেঁধে গেল,
সাগর মন্থন হ'ল মহা আড়ম্বরে, কিন্তু কি হইল তা'তে ?
অসুরে অমৃত খেলে ভাগ্য গুণে দেবতার শূন্য ভাণ্ড হাতে।

১৬

সুধাপানে চতুর্গুণ প্রমত্ত হইয়া মাগো ! দানব সকলে
ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার, করে দেশ তোল পাড়,
যুদ্ধে হত দেবগণ, ভাঙ্গিল নন্দন বন,
ভগ্ন শেষ বৈজয়ন্ত ইন্দ্রের অমরাবতী পোড়ালে অনলে !
চক্র, বজ্র, ঐরাবত সকলি কাড়িয়া নিল ছলে বীর্য্য বলে !!

১৭

ভয়ে ভীতা মন্দাকিনী পাতালে পলায়ে গেল, দেব কন্যাগণে—
অনাথা পাইয়া ধ'রে, বলেতে উলঙ্গ ক'রে—
কামুকেরা ক্রীড়া করে, ছিছি মা কহিব কারে,
এ লজ্জার কথা ! অহো !! কি কাজ রাখিয়া এই ধিক্কৃত জীবনে ?
এ দারুণ কার্য্য, এই বীভৎস ব্যাপার, কত দেখিব নয়নে ?

১৮

প্রমও দানবদলে প্রহ্লাদ যে নাই তাহা কে বলিতে পারে?
উদার ধার্ম্মিক ধীর, দয়াবান নীতি বীর,
দেব রিপণের মত, আছে আর শত শত,
কিন্তু সেই দেবতারা প্রচণ্ড দানব দলে কি করিতে পারে?
সম্মুখ সংগ্রামে মাতঃ তাঁহাদের বল বুদ্ধি বুঝেছি এবারে!

১৯

তা'তেই ভরসা কিছু হয় নাক আর, লেখা খণ্ডে কে বিধির?
হিতে আর কাজ নাই, যাঁহা ছিল থাক্ তাই,
বুঝিয়াছি ভালমতে, সুপ্তসর্পে লোষ্ট্রাঘাতে,
জাগাইয়া ভাল কার্য্য হয় নাই, হলাহলে হ'লাম অস্থির।
শান্তির অমৃত দিয়া জননী গো! পুত্রদিগে করহ সুস্থির!

২০

না দাও অমৃত মাগো! ঢাল হলাহল পুড়ে মরি একবারে,
কিম্বা অতি বিষ পানে, আশীবিষ বিষ প্রাণে,—
—জীর্ণ করি অকাতরে, কণ্ঠে বাঁধি ভুজঙ্গেরে,
জননী গো! হ'য়ে মোরা নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় তোমার সংসারে,
জয় জয়! শব্দে গাই তোমার মহিমা বিশ্ববিকম্পিত ক'রে!!!

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র সংগঠন।

যে কোন বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে সেই বিষয়ের শিক্ষা ও চর্চ্চা আবশ্যক। আমরা পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বল লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা বা চর্চ্চার অভাবে উহাদিগের সম্যক বিকাশ কখনই আশা করিতে পারি না। বলত সকলেরই আছে তবে একজন এম্ এ উপাধিধারী বঙ্গীয়যুবক ও একজন বর্ণজ্ঞানশূন্য নির্ব্বোধ কৃষকের মধ্যে বলের এত তারতম্য কেন? একবারে বুদ্ধি নাই এমন লোক পৃথিবীতে কয়জন? কৃষকের যে একবারে বুদ্ধি নাই একথা ত কেহই বলিতে পারিবেন না; তবে এত প্রভেদ কেন? ইহার

কারণ আর কিছুই নহে কেবল শিক্ষা ও চর্চ্চার অভাব। গ্রেডুএট মহাশয় মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়াই মস্তিষ্কের চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আজও তাহাই করিতেছেন, সেই জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক এতদূর সবল—তাই আজ ৫০ জন কৃষক একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে অক্ষম তিনি একক সেই কার্য্য করিতে সমর্থ। কিন্তু একদিকে মানসিক শিক্ষায় ও চালনায় তাঁহার বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম এবং শিক্ষা ও চালনার অভাবে কৃষকের বুদ্ধি যেমন স্থূল সেইরূপ অন্যদিকে শারীরিক শিক্ষা ও চালনার অভাবে সেই যুবকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং শারীরিক চালনার বলে কৃষকের শারীরিক অবস্থা অতিশয় সন্তোষপ্রদ। যুবক পীড়ার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত—একটু রৌদ্র লাগিয়াছে কি অমনি পীড়া, একটু বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে কি অমনি পীড়া, দুই ক্রোশ হাঁটিয়াছে কি সর্ব্বশরীর বেদনায় অস্থির; কিন্তু একবার কৃষকের প্রতি চাহিয়া দেখ, সে কেমন সবল ও সুস্থ—দিন নাই রাত্রি নাই, অনবরতই পরিশ্রম করিতেছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে, শীতের প্রবল বাত্যায় বর্ষার অজস্র বারিধারার মধ্যেও তাহার পরিশ্রমের বিরাম নাই। ইহাতেও যে তাহার পীড়া হয় না ইহার তাৎপর্য্য শারীরিক চালনা। তাই বলিতেছি যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভের ইচ্ছা থাকিলে সে বিষয়ের শিক্ষা ও চর্চ্চা চাই। মানসিক ও শারীরিক উন্নতি যেমন শিক্ষাসাপেক্ষ নৈতিক উন্নতিও ঠিক সেইরূপ শিক্ষা-সাপেক্ষ। শিক্ষা ও চর্চ্চা ব্যতীত নৈতিক উন্নতিলাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু চরিত্র-সংগঠনকার্য্য নৈতিক উন্নতির উপরই সম্যকরূপে নির্ভর করে, সুতরাং চরিত্র সংগঠিত করিতে হইলে নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। জানিনা কি জন্য নৈতিক শিক্ষার দিকে বঙ্গদেশে বড় একটা যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক আর সৌভাগ্য বশতঃই হউক, প্রতিবৎসর অসংখ্য ছাত্র উচ্চতম উপাধিলাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন; তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি যে বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা যে জ্ঞানারণ্যের সুমধুর ফলাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় হইতে পারে না; কিন্তু তাঁহাদের নীতিশিক্ষা কিরূপ হইয়াছে? তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বোধ হয় কিছুমাত্র নীতিশিক্ষা হয় নাই। নীতিশিক্ষা যে বড় সামান্য জিনিষ নয় তাহা কি তাঁহারা অবগত নন? প্রকৃত পক্ষে নীতিশিক্ষা অতি উচ্চ দরের শিক্ষা—শারীরিক বল ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য সম্পাদন অপেক্ষা, এই শিক্ষা অনেক উচ্চ। কৃপানয়া প্রকৃতি দত্ত অসামান্য বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ হইয়া যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে একজন

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করা ততদূর প্রশংসার বিষয় নয়; শরীরে ভীমবল ধারণ করিয়া, যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ হইয়া বীরদর্পে পৃথিবী বিকম্পিত করাও সেরূপ পৌরুষের বিষয় নয়; প্রচণ্ড বায়ু সদৃশ বেগবান্ দুর্জ্জয় মানসিক নীচ প্রবৃত্তিসকলকে নীতিশাসনে প্রশমিত করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা ও তাহাদিগকে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লওয়া যেরূপ প্রশংসার কার্য্য, যেরূপ গৌরব ও পৌরুষের বিষয়। কবি বাইরণ কবিতা লিখিয়া প্রশংসা লইয়া গিয়াছেন। তিনি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিত কবিতা লিখিবেনই; কিন্তু তিনি যদি নৈতিক শিক্ষাবলে আপনার চরিত্র সংগঠিত করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে কবিতা লিখিয়া যে প্রশংসা পাইয়াছেন তদপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিকতর প্রশংসার পাত্র হইতে পারিতেন। প্রথম নেপোলিয়নের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। এক সময়ে তাঁহার প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ যে ত্রস্ত ও বিকম্পিত হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকে ততদূর প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। তাই বলিয়া আমরা যে তাঁহাকে একজন অসচ্চরিত্র লোকবলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছি তাহাও নহে। সর্দাসর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায় নৈতিক শিক্ষা দ্বারা আত্মোন্নতি করিবার তাঁহার বড় অবসর হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই জন্য তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও নৈতিক জগতে একজন সামান্য দীন দরিদ্রের ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে নৈতিক উন্নতি ব্যতীত মনুষ্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ নৈতিক উন্নতি ভিন্ন কাহারও চরিত্র সংগঠন হয় না। এই হেতু মনুষ্যত্বের পক্ষে নৈতিক পরিণতি এক অত্যাবশ্যকীয় প্রধান উপাদান। ইহার অভাবে, গঠিত চরিত্রের অভাবে, মনুষ্য বিবিধ গুণ দ্বারা বিভূষিত হইলেও জনসাধারণের পূজ্য নহেন, ইহার অভাবে তাঁহার অসামান্য কার্য্যকলাপও গুণের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই বলিতেছি যিনি মনুষ্য হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চান তাঁহার পক্ষে কেবল একটি মাত্র জিনিষ অত্যন্ত আবশ্যক। অধ্যাপক ব্লেকি বলিয়াছেন—"One thing is needful. Money is not needful; power is not needful; cleverness is not needful; fame is not needful; liberty is not needful; even health is not the one thing needful; but character alone is that which can truly save us."

সেই জিনিষ কি? সেই জিনিষ ঐশ্বর্য্য, যশ, চতুরতা বা স্বাধীনতা নহে, সেই জিনিষ শারীরিক স্বাস্থ্যও নহে, সেই জিনিষ গঠিত চরিত্র। এই গঠিত চরিত্র ব্যতীত তাঁহার জীবনযাত্রায় বহুবিধ ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপমানের দাবানলে পুড়িতে হইবে, নিরাশার কুজ্ঝটিকায় ক্লেশ পাইতে হইবে, ক্রোধের প্রবল ঝড়ে বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে। এই সকল বিপদের হস্ত হইতে তিনি কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। একা স্বার্থই যে তাঁহাকে কত বিপদে ফেলিবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

নৈতিক শিক্ষা দ্বারা যে চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে এবং সেই চরিত্রই যে মনুষ্যজীবনে মহামূল্য সামগ্রী, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহাই বলিয়া আসিলাম। এক্ষণে চরিত্র কি একবার তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বর্ত্তমান সময়ের আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত পণ্ডিত চরিত্রের তিনটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১ম) "কোন লোকের সহিত মিলিয়া কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে ঐ ব্যক্তির দোষ গুণ সম্বন্ধে আমাদিগের মনে যে সংস্কার জন্মে ঐ সংস্কারই তাহার চরিত্র"। মনুষ্য-হৃদয়ে মনুষ্যহৃদয় প্রতিফলিত হয়। দুই জন লোকে দুই দণ্ড ধরিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিলেই এক জনের হৃদয়ের ছায়া অপরের হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, অমনি এক ব্যক্তি অপরকে চিনিয়া লয়। এই প্রকারেই লোকের চরিত্রজ্ঞান হইয়া থাকে। তবে চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সকল সময়ে একবারে অভ্রান্ত না হইতে পারে; আমি একজনের সহিত কিছুদিন ব্যবহার করিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা করিলাম, হয়ত সেই ধারণা তাহার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ মানুষে চাতুরীর আবরণে আপনার প্রকৃত চরিত্র গোপন করিতে সক্ষম; কিন্তু তাই বলিয়া সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হইয়াছে সেই জ্ঞানকে উহার চরিত্রজ্ঞান ভিন্ন আর কি বলিব? (২য়) "মানব-প্রকৃতির অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই চরিত্র। আমরা লোকের সহিত কথায় ও কাজে যতটুকু সাধুতার পরিচয় পাই তাহার পশ্চাতে যে অব্যক্ত ও গভীর কূপ সমান সাধুতার উৎস থাকে যাহা হইতেই ঐ কথা ও কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, মানব-প্রকৃতির সেই গূঢ় শক্তিই চরিত্র।" আমরা চরিত্রবান লোকের প্রত্যেক কার্য্যে যে অসাধারণ তেজ দেখিতে পাই এবং যে তেজের বলে চরিত্রবান ব্যক্তি মানবমনে একাধিপত্য করিতে সক্ষম হন সেই তেজও ঐ অন্তর্নিহিত গূঢ়শক্তি-প্রসূত। যাঁহার এই শক্তির অভাব তিনি চরিত্রবান এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তিনি কোন কার্য্যেই কখন সজীবতা, উৎসাহ এবং সত্যাশ্রয়ে ক্ষমতা, দেখাইতে পারেন না। (৩য়) "মানব যেরূপ ধর্ম্ম নিয়মের দ্বারা

আপনাকে চালিত করে ও যদ্দ্বারা আপনাকে শাসিত করে সেই ধর্ম্ম নিয়ম ও সেই আত্মশাসন শক্তিই চরিত্র।" এই চরিত্রকে আদর্শ-চরিত্র করিয়া গড়িতে হইলে কিরূপ নীতিশিক্ষার আবশ্যক, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মের সহিত নীতির এবং ধার্ম্মিকের সহিত চরিত্রবানের কিরূপ সম্বন্ধ দেখা যাউক। নীতির বশ্যতা স্বীকার করিলেই ধর্ম্মের আধিপত্য মানিতে হইবে কি না? নীতিবান হইতে হইলেই তাঁহাকে হিন্দু, মুসলমান, কি খ্রীষ্টান এমন কোন বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে কি না? বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয় লওয়াও দূরে থাকুক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার না করিলে কোন ক্ষতি আছে কি না? আমরা বলি না—বিশিষ্টরূপ ধর্ম্মাবলম্বনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই—পরমেশ্বরের অস্তিত্ব না মানিলেও চলিতে পারে (এস্থলে বলা আবশ্যক আমরা নাস্তিকতার পোষকতা করিতেছি না, তবে নাস্তিকের পক্ষ হইয়া এই কথা বলা যায় বলিয়াই এরূপ বলা গেল) কিন্তু এই কথা কয়জনের পক্ষে খাটিতে পারে? নাস্তিক হইয়াও চরিত্রবান এরূপ লোকের সংখ্যা যে পৃথিবীতে অতি বিরল তাহার আর কোন সংশয় নাই। সে যাহা হউক ঈশ্বরে বিশ্বাস যে চরিত্র সংগঠনের যথেষ্ট সহায়তা করে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে মন যেরূপ সতেজ, বলশালী ও দৃঢ় হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা কোন রূপ ধর্ম্মভয় না থাকিলে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিসকলকে সংযত রাখা ও আপন চরিত্রের উন্নতি সাধন করা সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যিনি শিক্ষিত তিনি হয়ত শারীরিক অসুস্থতার ভয়ে, পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার ভয়ে, সামাজিক অনিষ্টাপাতের ভয়ে বিশেষরূপ বিবেচনা করতঃ কার্য্য করিয়া আপন চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে সক্ষম হন; কিন্তু একবার একজন অশিক্ষিতের বিষয় ভাবুন দেখি। যখন নানাবিধ প্রলোভন আসিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে সবলে টানিতে থাকিবে তখন কি সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে, তখন সে কি কিছু ভয় করিবে না কাহারও অপেক্ষা রাখিবে? তখন সে কেবল আপনার ক্ষণিক সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, সে সমাজের দিকে দেখিবে না, পরিবারের প্রতি চাহিবে না, অধিক কি সে আপনার শরীরকেও অগ্রাহ্য করিবে। অতএব এরূপ লোকের পক্ষে ধর্ম্মভয় অগ্রে। অপর যে কোন যুক্তি তাহাদের পাপস্রোতের বাধা দেওয়া দূরে থাকুক মনের মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না কিন্তু একা ধর্ম্মভয় সব করিবে।

এক্ষণে নৈতিক উন্নতি দ্বারা চরিত্র সংগঠিত করিতে হইলে কোন কোন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহাই দেখা যাউক।

আত্মশাসনশক্তি।—চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যাহাতে সর্ব্বপ্রথমে মনের প্রবৃত্তিগুলিকে আত্মশাসনে রাখিতে পারা যায় সেই চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসন-শক্তি চরিত্রগঠনের মূলভিত্তিস্বরূপ। চরিত্রগঠনের জন্য যতই কেন চেষ্টা করা যাউক না আত্মশাসন-শক্তি না থাকিলে সকলই বিফল হইবার সম্ভাবনা। সকল প্রকার বাষ্পীয় যন্ত্রেই বাষ্পের পরিমাণ-নিয়ামক অংশবিশেষের অস্তিত্ব যতদূর প্রয়োজনীয় মানসিক প্রবৃত্তিসকলের মধ্যে আত্মশাসন-শক্তিও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। বাষ্প-নিয়ামক অংশবিশেষের অভাবে বাষ্পীয় যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমঞ্জসীভূত কার্য্য হওয়া দূরে থাকুক বাষ্পের অসামান্য তেজে সমগ্র যন্ত্রটীর যেমন এককালে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা সেইরূপ আত্মশাসন-শক্তির অভাবে চরিত্র সংগঠিত হওয়া দূরে থাকুক চরিত্র বরং অধিকতর কলুষিত হইবারই সম্ভাবনা। প্রবৃত্তি যাহাতে মনকে ক্রমাগত নীচ-পথে লইয়া যাইতে না পারে এই জন্যই আত্মশাসন-শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি প্রকৃত চরিত্রবান ব্যক্তিতে বিলক্ষণ বিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিসকল তাহাদের মনের উপর কখনই আধিপত্য করিতে পারে না; তাঁহাদিগের উন্নত মন কখনই আত্ম-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করে না। মনে যে ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ সেই ইচ্ছামত কার্য্য করিতে হইবে, কার্য্যকরণে কোনরূপ বাধা পড়িলেই মন একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িবে ইহা চরিত্রবানের লক্ষণ নহে। চরিত্রবান ব্যক্তি যখন বলিবেন যে না এই প্রবৃত্তিকে এখন প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, তখন সেই প্রবৃত্তির এমন কোনরূপ প্রলোভনই থাকিতে পারে না, এমন কোনরূপ সাধ্যই হইতে পারে না, যাহাতে সে তাঁহার মনকে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাইয়া লওয়া দূরে থাকুক কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত করিতে সমর্থ হয়। তখন তাঁহার মন এরূপ উচ্চে উঠিয়া যায় যে সেই প্রবৃত্তি বহু আয়াসেও ততদূর উঠিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে আপনা আপনি পদতলে লুটাইয়া পড়ে। ফলতঃ চরিত্রবান ব্যক্তিগণের আত্মশাসন-ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং আমরা যদি চরিত্র গড়িতে চাই তাহা হইলে আমাদিগেরও আত্মশাসন-ক্ষমতা অগ্রে আবশ্যক। প্রবৃত্তি লইয়া প্রবৃত্তির কার্য্য লইয়াই ত চরিত্র। তবে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিতে পারে না, যাহার মনের স্বাধীনতা নাই, যাহার মন প্রবৃত্তির ক্রীতদাস, সে ব্যক্তি আবার

চরিত্র গড়িবে কি প্রকারে? যাহাকে লইয়া চরিত্র সংগঠন করিতে হইবে তাহারই উপর যদি আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা না রহিল তবে চরিত্র গঠন কার্য্য কি অসম্ভব নহে? তাই বলিতেছি যিনি চরিত্রবান বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিতে চান তিনি আত্মসংযম শিক্ষা করুন, ক্ষণিক সুখের আশা ও স্বার্থের মায়া একটু একটু ত্যাগ করিতে শিক্ষা করুন, তিনি আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া ধরুন।

মানসিক দৃঢ়তা।— সাংসারিক কার্য্যের প্রবল তরঙ্গে নিপতিত হইয়াও যিনি স্রোতে অঙ্গ ঢালিতে না চান, যিনি আপনাকে নিরাশার ক্রীড়ার বস্তু করিতে চান, তাঁহার পক্ষে মানসিক দৃঢ়তাই প্রধান অবলম্বন। এই দৃঢ়তা-বলে সকল প্রকার বিঘ্নতরঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আমরা সকল সময়েই যে চরিত্রবান ব্যক্তিগণকে সফলতার উজ্জ্বল মুকুটে বিভূষিত দেখিতে পাই তাহার কারণ উহাদিগের মানসিক দৃঢ়তা অত্যন্ত প্রবল। তাঁহারা সামান্য বাধাকে কখনই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের মন এত দুর্ব্বল নহে যে একবার প্রতিহত হইলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহারা একবার বিফল-মনোরথ হইলেই একেবারে নিরাশার গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন, সোপান-বিবর্জ্জিত, সুগভীর কূপে নিপতিত হইয়া আত্মঘাতী হন না। তাঁহারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক সম্মুখে রাখিয়া মানসিক দৃঢ়তার সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক আপন কার্য্যক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার অন্তরায়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সুতরাং চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে এই দৃঢ়তা অভ্যাস করা উচিত। যিনি যে কার্য্যই করিতে যান না কেন প্রথমে সকলই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উপেক্ষা করিয়া যদি সেই কার্য্য পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে আর কার্য্য করা হয় কোথায়? আত্ম উন্নতিই বল, কোন সমাজের উন্নতিই বল, আর দেশের উন্নতিই বল কোন উন্নতির পথই বড় সরল ও পরিষ্কার নহে; কিন্তু উন্নতির পথ সরল ও পরিষ্কার নহে বলিয়া কি উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না? অবশ্যই দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু নানা কারণে আমরা দৃঢ়তা শিক্ষা করিতে পারিতেছি না। আত্ম-সংযম শিক্ষা আমাদের কাহারও বড় হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাল্যকাল হইতে প্রবৃত্তিসকলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া আসিতে আসিতে আমাদের মন এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে উপযুক্তরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তখন আর আমরা প্রবৃত্তিকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারি না এবং প্রবৃত্তি কোন প্রকারে বাধা পাইলেই আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি; তখন

আমাদের মনে যাহা ইচ্ছা হয় আমরা তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চাই; এইরূপে দৃঢ়তা অবলম্বনও তখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমাদের মধ্যে আবার কাহার কাহার মনের অবস্থা এরূপ যে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে জলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আপনার অসাধারণ কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দেন এবং অপর মুহূর্ত্তেই শিথিলতা ও ঔদাস্যে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ প্রকৃতির লোকের দৃঢ়তা অভ্যাস সহজে ঘটিয়া উঠে না। দৃঢ়তা অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে সামান্য সামান্য বিষয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়। এই প্রকারে দুই একবার কার্য্য করিলেই মন আপনা আপনিই সমস্ত সাধুকার্য্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়, তখন সামান্য তাড়নায় বা মিথ্যা ভয় প্রদর্শনে কিছুতেই আপনার ঈপ্সিত কার্য্যে পরাঙমুখ হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ধর্ম্মভয় থাকিলে মন বিলক্ষণ দৃঢ় হয়। ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একমনে সত্যের অনুসরণে ধাবমান হন। তাঁহার হৃদয় অসীম বলে বলীয়ান, তিনি বাধা মানিবেন কেন?

সত্যপ্রিয়তা।—পৃথিবীতে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু প্রকৃত, তাহারই আদর ও মর্য্যাদা, মিথ্যার আদর কোন কালেই দেখা যায় না। তথাপি লোকে মিথ্যা কহিতে ছাড়ে না, ইহাই আশ্চর্য্য। মিথ্যা ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়েরই নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সত্যবাদিতা যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা আমরা বালকেই উপলব্ধি করিতে পারি। বালক স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয়; মিথ্যা কাহাকে বলে সে জানে না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই বালক যখন স্বার্থ প্রভৃতিতে আপনাকে জড়াইয়া ফেলে তখন হইতেই সে মিথ্যার সাহায্য লয় এবং তখন হইতেই তাহার নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রের অবনতির সূত্রপাত হয়। এই অবনতি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আর মানুষে নিজে মিথ্যাবাদী হইলেও যে মিথ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহার প্রমাণ আমরা প্রাত্যহিক ঘটনাতেই যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই। মিথ্যা কথা প্রমাণীকৃত হইলে লোকে মনে মনে যে লজ্জা ও অপমান বোধ করিয়া থাকে সেই লজ্জা ও অপমান বোধই কি বলিতেছে না যে মিথ্যা কহা অনুচিত। লোকে যখনই কোন মিথ্যা কহে তখনই কি তাহার মন হিতাহিত বিবেচনার পক্ষপাতশূন্য শাসনে শাসিত হয় না? কিন্তু কই তবু লোকে মিথ্যা কহিতে ছাড়ে কই? মিথ্যা কহিবে পাপের ভরা পূর্ণ করিবে, সেই পাপ-জর্জ্জরিত দেহ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইবে, তথাপি সামান্য শাস্তির ভয়ে, সামান্য অপমানের ভয়ে, সামান্য

স্বার্থনাশের ভয়ে মানবের সম্মুখে সত্য কহিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বিখ্যাত ফরাসী লেখক মনটেন্ বলিয়াছেন—"A liar is brave towards god but a coward towards men. For a lie faces god and shrinks from man." কি কারণে যে লোকে মিথ্যা কথা কহে তাহা যদি একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা, লাভেচ্ছা, আলস্য ও দণ্ডভয় এইগুলিই মিথ্যার জনক। সত্যাশ্রয়ীকে বাধ্য হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে বলিয়াই যে লোকে সহজে সত্যাবলম্বন করে না এরূপ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। সত্যের অনুরোধে যখন যে কার্য্য করিতে হয় তাহাই যে ক্লেশকর এমন নহে, তবে মধ্যে মধ্যে আত্মসম্বন্ধে মিথ্যা দূর করিতে গিয়া নিজেরই পীড়া উৎপাদন করা হয়; কিন্তু সে পীড়াও ভাল তথাপি আপনাকে পাপের অবতার করা কিছু নহে। পূর্ব্বে যেগুলিকে মিথ্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অনেক সময়ে সেগুলি অনুপস্থিত থাকিলেও লোকে মিথ্যা কহিয়া থাকে, সেটা শুদ্ধ অভ্যাসের জন্য। যখন দেখিতেছে একটা মিথ্যা কথা বলিলেই ইষ্টলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা অমনি অসঙ্কোচে মিথ্যা কথা কহিল, যখন দেখিতেছে বিদ্যার ভাণ করিলে, ধনের ছায়ায় আশ্রয় লইলে, যথেষ্ট সমাদর পাইতে পারিবে অমনি মিথ্যা কথা কহিল; যখন দেখিতেছে কোন কর্ম্ম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও আলস্য বা ঔদাস্য বশতঃ সেই কর্ম্ম নিয়মিত সময়ে সুসম্পন্ন করিতে পারে নাই অমনি মিথ্যা কথা কহিল। যখন দেখিতেছে কোন নিষিদ্ধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাহাকে দোষ স্পর্শ করিয়াছে এবং সেই দোষ স্বীকার করিলে শাস্তিও অপ্রতিবিধেয় অমনি নিজ দোষ স্খালনার্থ মিথ্যার সাহায্য লইল। এইরূপে সকল কার্য্যে মিথ্যা কহিয়া লোকের মিথ্যা অভ্যাস হইয়া যায়; তখন আর উপলক্ষ না থাকিলেও মিথ্যা বলা ছাড়িতে পারে না; এমন কি মিথ্যা লইয়া সময়ে সময়ে আমোদও করিয়া থাকে। মিথ্যা আর একটি মহদনিষ্টকর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। মিথ্যা অভ্যাস করিতে করিতে মন এতদূর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে যে অবশেষে নৈতিক সাহসিকতা বলিয়া মনের যে এক প্রধান বল আছে তাহা এককালে লোপ পায়। নৈতিক সাহসিকতার সহিত সামাজিক উন্নতির বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অতএব যিনি ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া জগতের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া আপনার ও সমাজের মঙ্গল করিতে চান তিনি যেন সত্যের পথ হইতে কখন বিচলিত না হন। তবে 'প্রিয় অথচ সত্য কথা কহিবে, অপ্রিয় সত্য ঘটনা বলিবে না' বলিয়া যে কথা আছে তাহা কোন স্থলে

প্রযোজ্য? যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ লইয়া কথা, যখন দেখিতেছি এই কথাটি বলিলে অমুক ব্যক্তির মনে ক্লেশ দেওয়া হইবে তখনই না হয় সত্য বলিলাম না; কিন্তু যখন দশ জনকে লইয়া কার্য্য, যখন সমস্ত সমাজ লইয়া কার্য্য, তখন অপ্রিয় অথচ সত্য এমন কথা না বলিলে চলে কই? যখন সমাজবিরুদ্ধ এমন কোন বিষয়কেও আমি সত্য বলিয়া জানি তখন সেই বিষয় সমাজে না বলিয়া গোপন করিয়া মিথ্যাকে কেমন করিয়া প্রশ্রয় দিব?

উদারতা।—চরিত্র সংগঠিত করিতে হইলে মনকে উদার করিতে চেষ্টা করা উচিত; যাহাতে মন হইতে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা এককালে বিদূরিত হইয়া যায় সেই চেষ্টা করিতে হয়। অমুক ব্যক্তি বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, তবে উহার সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই বৃথা, উনি একজন ঘোর ভণ্ড; এই ব্যক্তি সমাজের অন্য এক সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে ইনি যেমন কার্য্যই করুন না কেন তাহাতে আমি সহানুভূতি দেখাইব কেন? সেই কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি করিব কেন? যিনি এরূপ ভাবেন তিনি 'চরিত্রবান' এই বাক্যে অভিহিত হইবার অযোগ্য। চরিত্রবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় প্রশান্ত ও উদার, তাহাতে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের হৃদয় প্রেমময়, পরের সুখে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠে, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। তাঁহারা তিক্ত সামগ্রীতেও মধুরতা আস্বাদন করিতে সমর্থ—সে কেবল উদার হৃদয়ের গুণে। তাঁহারা শত্রুরও গুণ দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হন। চরিত্রবান্ লোকের হৃদয়ের এই ভাব অতীব সুন্দর।

আত্মশাসনশক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, সত্যপ্রিয়তা ও উদারতাকেই গঠিত চরিত্রের প্রধান উপাদান বলা যাইতে পারে; সুতরাং এগুলির দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চরিত্রসংগঠনের জন্য আর যে যে শিক্ষার আবশ্যক সেই সমস্তই বোধ হয় প্রাগুক্ত উপাদানচতুষ্টয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।*

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

দেহাত্ম-বাদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বপ্রস্তাবোল্লিখিত উৎপত্তির নিয়ম ভারতীয় বেদ, সাংখ্য ও জৈমিনি দর্শনের অনুমোদিত। বৈজ্ঞানিকপ্রবর ঋষিগণও ঐ ক্রমোন্নতির নিয়ম স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশ

* আহীরীটোলা উন্নতি-বিধায়িনী সভার ত্রয়স্ত্রিংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুষ্মবিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহ্যমানাতু বীজত্বং প্রতিপদ্যতে ॥
তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তানাম্ভসা
পুনঃ।
উচ্ছূনত্বং মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং প্রযাতি চ ॥
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাত্মকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং
পুনঃ ॥"

—রাঘবভট্ট।

জল দ্বারা ভূমি আর্দ্রভাবাপন্ন ও আভ্যন্তরিক উত্তাপে বিপাক প্রাপ্ত হইয়া বীজত্ব হইতে অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হয়।

"স্বেদজঃ স্বিদ্যমানেভ্যো ভূবহ্ন্যম্ভাঃ
প্রজায়তে।
যূকমৎকুণকীটাদ্যা যে চান্যে ক্ষণ-
ভঙ্গুরাঃ ॥"

—প্রপঞ্চসার।

স্বিদ্যমান ভূমি, বহ্নি ও জল হইতে উকুন, ছারপোকা ও কীটাদির উৎপত্তি হয়।

গৃধ্রোবাচ।

"ইয়ং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা
উত্থিতৈরাবৃতাঃ সর্ব্বাস্তদা প্রভৃতি মে
গৃহং।"
"উলূকশ্চাত্রবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা
যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে
গৃহং।"
"নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেম-
বিভূষিতে।
সতু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা
মহাপ্রভুঃ ॥
সিসৃক্ষুর্বায়ুং পৃথিবীং সপর্ব্বতমহীরুহান্
তদন্তরং প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সরীসৃপসহাণ্ডজাঃ
জরায়ুজাঃ সমনুষ্যাঃ সসর্জ্জ স মহাতপাঃ ॥

—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৬৪ সর্গ।

রামায়ণের উক্ত গৃধ্রোলূক-সম্বাদে রাম জীবের উৎপত্তির ক্রমনিয়মানুসারে উলূকেরই পূর্ব্ববাসস্থান প্রমাণ করেন। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডারবিন সাহেবেরও এই মত। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণও ঐ মতেরই পোষকতা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েক পঙ্‌ক্তি প্রদর্শিত হইতেছে,—

"Electricity is then the great primal atomic principle engendering and regenerating all the molecular constitutions of the whole of the universe."—*Man and God.*

বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রমবিকাশেই পরমাণুসমূহ পরিণত হইয়া ক্রমান্বয়ে পৃথিবী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

অনুমান-প্রামাণ্য-বাদীরা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর বৈসাদৃশ্য দর্শনেই শরীরাতিরিক্ত মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবধারণ করেন। কিন্তু দেহাত্মবাদীরা বলেন যে তাদৃশ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও দেহাতিরিক্ত আত্মা বা মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ভৌতিক জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ ও প্রাণি-জগৎ সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ হইলেও

উহাদের অভ্যন্তরে একটি অত্যাশ্চর্য্য অপরিবর্ত্তনীয় ক্রমোন্নতির নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত ক্রমোন্নতিই ঐ বৈসাদৃশ্যের কারণ। ভূতসমূহের রাসায়নিক-সংযোগ-জনিত গতি, উদ্ভিজ্জ-সমূহের প্রাণ এবং প্রাণিসমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট প্রাণিগণের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি ও উৎকৃষ্ট প্রাণিগণের চেতনাই ধর্ম্ম। অত্যুৎকৃষ্ট প্রাণী মানবের বিবেকই ধর্ম্ম। দেহের ক্রমবিকাশেই চৈতন্যের ক্রম-বিকাশ। তাহা হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। এই মতের সত্যত্ব প্রদর্শনের জন্য অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী অর্থাৎ উন্নতির অপেক্ষাকৃত দূর-সীমা-প্রাপ্ত মানব জাতিরই বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এবং অসভ্যতা ও সভ্যতা ভেদে ঐ চৈতন্যের যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইতেই ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। বলা বাহুল্য যে মানব-জাতির যে কয়েকটি শ্রেণী প্রদর্শিত হইল তাহার মধ্যে একটিকে বিবেক-শক্তির আধারস্বরূপ-আত্মাবিশিষ্ট বলিলে অপরটিকে তদভাববিশিষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজন বিবেকশালী যুবককে আত্মাবিশিষ্ট বলিলে একটি সদ্যজাত শিশুকে কিম্বা পর্ব্বতগুহাবাসী অসভ্য মানবকে ঐ আত্মাবিশিষ্ট বলিতে সাহস হয়? জড় জগৎ যেরূপ ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে ক্রমে উন্নত হইয়া উদ্ভিদ-রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ উদ্ভিদ-জাতিও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া কেবলমাত্র অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-শক্তি-সমন্বিত কীটানুকীট মৎস্য শম্বুক সরীসৃপাণ্ডজ জরায়ুজ ক্রমে আদৌ পশুভাবে পরে উৎকৃষ্ট জীব বা মানব-রূপে পরিণত হইয়াছে।

"But we can affirm with certainty and this is a great point gained that one rock system is younger than another; that those rock systems follow in the order above given; that according to our present knowledge invertibrate life preceded the vertibrate; that fishes preceded reptiles, reptiles preceded birds and birds mammalia. We can also affirm what is the object of the present sketch to prove as there has been an ascent in time from lower to higher forms of life, so man being the highest known creature, comes latest on the geological stage, and that evidences of his existence are to be found only in the most recent and superficial formations."

—*Geology by David Page.*

আত্মা যে শরীর হইতে অতিরিক্ত নহে, তৎসম্বন্ধে আর অধিক কি প্রমাণ বা যুক্তি থাকিতে পারে? এই সূক্ষ্ম ক্রমোন্নতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া শরীরাতিরিক্ত স্বতন্ত্র চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসাপন্ন ব্যক্তিরা যে 'জড়

শরীর হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব' বলিয়া অপর একটি কূটতর্কের অবতারণা করেন, দেহাত্মবাদিগণ তাহার উত্তরে 'চেতন আত্মা হইতে জড় শরীরের উৎপত্তিই বা কিরূপে সম্ভব হয়?' এইরূপ প্রতিকূল তর্কের উত্থাপন পূর্ব্বক বিপক্ষ মতের উপর অপরিহার্য্য দোষের আরোপ করেন। অধিকন্তু বলেন যে, আমাদিগের মতের যৌক্তিকতার প্রতি প্রত্যক্ষই প্রমাণ কিন্তু প্রতিপক্ষীয় মতের প্রামাণ্যসংস্থাপনে অজ্ঞেয় অনুমানবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ বিপক্ষীয় মতে অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা। তবে যে অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরা চেতনকর্ত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন সে কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুরোধে। অহং-জ্ঞানাত্মক বিবেকান্তর্ভূত স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অবয়ব-সমূহের অদ্ভুত সংযোগের ফলমাত্র। অহংজ্ঞানাত্মক স্বত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান মানবের স্বভাবসিদ্ধ সহজ জ্ঞান নহে। জ্ঞানমাত্রই সংস্কারসাপেক্ষ। বিশ্বের ক্রমোন্নতিই ঐ জ্ঞানের হেতুভূত। চেতন-কর্ত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নাই। বিশেষতঃ আমাদের জ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে যখন কোন জ্ঞানই লব্ধ হয় না, তখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সমগ্র মানবজাতি যে বিষয় প্রত্যক্ষ করে নাই সে বিষয়ের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্মাদি বিষয়সকল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। ঐ কল্পনা কালক্রমে ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া কুসংস্কার-জালে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত ঈশ্বরেরও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অতি প্রাচীন কালে মানব-জাতি যখন প্রথম বন্য হইতে সভ্য মানবভাবে পরিণত হইলেন তখন সেই সমাজে আধুনিক উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তৎকালে তাঁহারা পদার্থসমূহের আদি কারণ অনুসন্ধানে রত ও সময়ে সময়ে সৃষ্টিকৌশলে বিমোহিত হইয়া নদী, পর্ব্বত, ভূমি, জল, আকাশ, অগ্নি, উদ্ভিদ, বজ্র, তড়িৎ, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির পূজা ঈশ্বরজ্ঞানেই সম্পাদন করিতেন। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানবগণ প্রকৃতিকে তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচরে কার্য্য সাধন করিতে ও তাঁহাদিগের অভাবনীয় সুখ দুঃখ বিধান করিতে দেখিয়া অজ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তিকেই ঈশ্বরভাবে পূজা করিতেন। কালক্রমে ঐ শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে পূজিত হইতে লাগিল। এই-রূপেই সপুত্রপরিজন, মহাভোগবিলাসী, যুদ্ধবিগ্রহাদিনিরত, কামাদিপরিপীড়িত দেবগণের উৎপত্তি হইল। কুসংস্কারের

সঙ্গে সঙ্গে সর্পাদিদেবাদিনিবাস সকল নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সমালঙ্কৃত হইল। ক্রমে যৌক্তিক ও তার্কিক লোক সকল আবির্ভূত হইলে দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল।

"It is thus that since the first period of the world's history man believed he saw the first cause in all that struck him with astonishment or admiration. Perhaps he sought to account for this first cause, and he would naturally see it in every thing he did not understand.

Since that time these ideas have become modified in proportion to instinctive and intellectual progress, and with them the different aspects under which the divinity has been interpreted."

—*Man and God.*

ঈশ্বর যে মানবের মনঃকল্পিত ও ধর্ম্মাদি যে তাঁহাদিগের সমাজশাসনের নিমিত্ত উদ্ভাবিত উপায় তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীত হয়। মানবের প্রকৃতি ও তদ্গত বৈষম্য ও বিশ্ব-প্রকৃতির পর্য্যালোচনাই মানবমনে ঐ সকলের অসারত্ব ও কল্পিতত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দেয়।

মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন যে মানবের পশুভাব হইতে দেবভাবে পরিণতি কেবলমাত্র ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহাদিগের ঐ উন্নতি শিক্ষা-সাপেক্ষ এবং ঐ শিক্ষা ঈশ্বরপ্রেরিত বা তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের অধীন। অনুমান-প্রামাণ্য-বাদিগণের ঐ যুক্তি কতদূর সঙ্গত তদ্বিষয়ের বিচার কামনায় দেহাত্ম-বাদিগণের প্রাকৃতিক সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির অর্থ বস্তুশক্তি। জগতের প্রত্যেক ঘটনাই ঐ বস্তুশক্তির প্রকাশেই সঙ্ঘটিত হয়। প্রত্যেক কার্য্যই বস্তুশক্তির অনুগত। জীবমাত্রই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জীবের কতকগুলি কার্য্য আপাততঃ স্বভাবের বিরোধী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, সমস্তই প্রকৃতির নিয়মানুসারেই হইতেছে। স্বভাবের একটী অপেক্ষাকৃত হীনবল নিয়ম অপর একটী প্রবল নিয়মের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার বা বৈলক্ষণ্য অনুমিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিয়মের ব্যভিচার বা বৈলক্ষণ্য ঘটে না। মানবগণ নিজ বিবেকশক্তিবলে প্রকৃতির সরল নিয়ম সকল অবগত হইয়া তদনুরূপ আচরণ পূর্ব্বক অপরাপর নিয়মের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম, এই জন্য মানব উন্নত। ঐ বিবেকশক্তিই মানবের উন্নতির নিদান। মানবের উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ

বৈষম্যময়ী নানাপ্রলোভনশালিনী প্রকৃতি, অথবা মানবের মনঃকল্পিত ঈশ্বরকে শিক্ষক বলা নিতান্তই ভ্রান্তির কার্য্য। বৈষম্যময়ী প্রকৃতি যদি মানবের শিক্ষয়িত্রী হয়, তাহা হইলে মানবজাতি পশুজাতি মধ্যে পরিণত হয়। মনঃকল্পিত ঈশ্বর হইতেও শিক্ষালাভ নিতান্ত অসম্ভব। মানব-প্রদত্ত গুণরাশির কল্পিতসমষ্টি কি শিক্ষক হইতে পারে? জ্ঞানিমাত্রেই স্বীকার করেন যে, জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। আমরা যে কোন জ্ঞান লাভ করি, তাহাতেই ইন্দ্রিয় অনুস্যূত রহিয়াছে। অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরা যেগুলিকে সহজ জ্ঞান বলেন তাহাও ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না এবং ধারণা করাও যায় না। সুতরাং মানবমনঃকল্পিত ঈশ্বর মানবীয় গুণে ভূষিত হইয়াছে। ঐ সকল গুণ আবার ঐ কল্পিত ঈশ্বরে এত অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাহাদের সামঞ্জস্য হয় না, একত্র অবস্থানের সুবিধা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী গুণের বিষয় লিখিত হইল;—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহা কি সম্ভবপর কথা? বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত। এক অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করিলেও যখন শূন্য হয় না এবং অসংখ্য শূন্য একত্রিত করিলেও যখন এক হয় না তখন বিশ্বকে অবশ্যই অনাদি ও অনন্ত বলিতে হইবে। বিশ্ব অনাদি; সুতরাং উহার সৃষ্টিকর্ত্তাও অসম্ভব। যদি শক্তির উদ্বোধনকেই সৃষ্টি বলেন, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বই সম্ভব হইল। কিন্তু ইচ্ছাময়-ত্বাদি গুণের সামঞ্জস্য কোথায়? তাঁহারা ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বলেন, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য বিনা ইচ্ছা থাকে না তখন ঈশ্বরের কোন না কোন উদ্দেশ্য স্বীকার না করিলে তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলা যাইতে পারে না। উদ্দেশ্য স্বীকার করিলে পূর্ণকামত্ব থাকে না। আমাদের উদ্দেশ্যই যদি তাঁহার ইচ্ছার কারণ হয় তবে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়, যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের পরিমিত শক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিলে তাঁহার করুণাময়ত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য হয়। বিশেষতঃ যিনি স্বয়ং এই অমঙ্গলময় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ সুখসচ্ছন্দ ভোগের অনধিকারী করিয়াছেন তিনি কি তাঁহার ঐ অসম্পূর্ণ কার্য্যের জন্য ভক্তির পাত্র হইতে পারেন? অধিকন্তু তাঁহাকে উপাসনাপ্রিয় বলিলে তাঁহার নির্ব্বিকারত্বও সম্ভব হয় না। এইরূপ বিচার করিলে ঐ ঈশ্বরকে মানবের মনঃ-কল্পিতই বলিতে হয়। এই সকল দোষের পরিহার বাসনায় কেহ কেহ পরলোক স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু দেহের অবসানে যখন তদুৎপন্ন আত্মারও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী তখন পরলোকও স্বীকার করা যায় না। তর্কবিশ্রান্তির

জন্য পরলোক স্বীকার করিলেও যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও করুণাময় তিনি কি কারণে আমাদিগকে অসম্পূর্ণ শক্তি ও অসৎপ্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক এই অসীম যন্ত্রণা ভোগের পাত্র করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে। তৎকৃত কর্ম্মের জন্য আমরা দায়ী হই কেন? যে কষ্ট নিবারণের অদৃষ্টাশ্রুতাচিন্ত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে তাঁহা দ্বারা সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয় কি প্রকারে?

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর কেন হইল? এই সকল দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? একাল পর্য্যন্ত যে বিষয়ের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হইল না তখন কেনই বা লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার করেন? কেহ কেহ বলেন যে, মানবের অসম্পূর্ণতা ও সম্পূর্ণত্বের আকাঙ্ক্ষাই সচ্চিদানন্দ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাহাই বা কিরূপে স্বীকার্য্য হয়? ক্রমবিকাশী জগৎ যখন ক্রমশঃই উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখন এমত সময় আসিতে পারে যখন মানব নিজের বাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। মানব স্বতঃই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সুখ সচ্ছন্দতা অনুভব করিবে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বতঃই অন্তর্হিত হইবে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হর্বর্ট স্পেন্সর এক স্থলে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—

"The adaptation of man's nature to the conditions of his existence cannot cease until the internal forces which we know as feelings are in equilibrium with the external forces they encounter. And the establishment of his equilibrium is the arrival at a state of human nature and social organization, such that the individual has no desires but those which may be satisfied without exceeding his proper sphere of action, while society maintains no restraints but those which the individual voluntarily respects."

উপসংহারকালে অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাক-পদ্ধতির সার কথা দুই একটির ভাবার্থ বলিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব। ভবিষ্যতে ঐ সকল মতের খণ্ডনার্থ আমাদিগের দেশের দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে কোন খানিতে কিরূপ যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইবে।

প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, বিশ্বাতিরিক্ত ঈশ্বর নাই। বিশ্ব স্বতঃ-সিদ্ধ অনাদি অনন্ত। জড়ের পরিণতি হইতেই চেতন জীবের উৎপত্তি। দেহাতিরিক্ত আত্মা, সর্গ, মুক্তি ও পর-লোকের প্রমাণ নাই। বুদ্ধিপৌরুষ-বিহীন ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বেদ ও তল্লিখিত আচার ব্যবহারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যসৃষ্ট বেদাদি শাস্ত্রসমূহের পরোক্ষবাদ

প্রামাণ্য নহে। মনুষ্য প্রকৃতির নিয়মের অবিরোধে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচালনে যে কার্য্যই করিবেন তাহাই তাঁহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি স্বয়ংই একদিন স্বকপোল-কল্পিত ঈশ্বরের অনুরূপ হইবেন, ইহাই সত্য।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই ভারতের উপযোগী চিকিৎসা।

আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, জগতে উন্নতির স্রোত প্রবল বেগে চলিতেছে; সকলেই আত্মস্বত্ব-সংরক্ষণে, আত্মোৎকর্ষ সাধনে, স্বদেশের, স্বজাতীর উন্নতি চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। জগতে যেন হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত। এই কোলাহল পতিত নিদ্রিত ভারতের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, ভারত দীর্ঘকালের নিদ্রিত চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের নিদ্রিতাবস্থায় অপহৃত রত্ন সকল উদ্ধার জন্য তাঁহার প্রিয় সন্তানগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ভারতের জীবনরত্ন। আয়ুর্ব্বেদ হারাইয়া আজ ভারতবাসী দুর্ব্বল, অল্পায়ুঃ, হীনসাহস, পরমুখাপেক্ষী এবং শারীরিক অবনতির নিম্নসোপানে পতিত। অধিক দিনের কথা নয়, কিঞ্চিদূন দেড় শত বৎসর বিজাতীয় চিকিৎসা আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে; এই অল্পকাল মধ্যে ভারতের শারীরিক অবনতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভারতের ভাবি উন্নতির আশা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইবে। সত্য বটে মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতি সাধন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে সকল বাদসাহ কি নবাবই যে আয়ুর্ব্বেদে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন এমন নয়। মুরসিদাবাদবাসী ভট্ট চিকিৎসকগণ তাহার প্রমাণস্থল। ইহাঁরা মুরশিদাবাদের নবাবদিগের চিকিৎসক ছিলেন। নবাবগণ ইহাঁদিগের বিস্তর সম্মান করিতেন এবং যত্নপূর্ব্বক ইহাঁদিগের ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, দশ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্রের বহু পূর্ব্ব পুরুষ মনুর সময়ে আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছিল। আর সেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতি যদি মুসলমান রাজাদিগের প্রারম্ভকাল হইতেও ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাও ছয় শত বৎসরের কম নয়। ভারতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এমনি বদ্ধমূল ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ছিল,

যে এত দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও তাহার যে একাঙ্গ আছে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে যেমন উপযোগী ও ফলপ্রদ অন্য কোন চিকিৎসাই তাহার সমতুল্য নয়, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত।

আয়ুর্ব্বেদ এক জনের, এক দিনের চিন্তার ফল নয়। ইহা বহু শতাব্দী-পরীক্ষিত পরোপকার-নিরত আত্মোৎসর্গী ভারতীয় বহুসংখ্যক আর্য্য ঋষিগণের চিন্তাপ্রসূত। কথিত আছে কতিপয় পরম দয়ালু ঋষি-তনয় ভারতীয় জনগণের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, তাহার নিরাকরণচিন্তায় হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অনুগাঙ্গ্য প্রদেশে সমবেত হয়েন। তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থ মহামুনি ভরদ্বাজকে প্রেরণ করেন। ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া লোকহিত-কামনায় তাহা পৃথিবীতে প্রচার এবং অগ্নিবেশ প্রভৃতি একাদশ জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করান। আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায় ইন্দ্র স্বর্গ প্রভৃতিকে কাল্পনিক অংশ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিবেন; তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা বোধ হয় স্বীকার্য্য যে, অদ্য হইতে বহু সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় কৃপালু মহর্ষিগণ হিমালয়ের আরণ্য প্রদেশে সমবেত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। ঋষিগণ বনময় প্রদেশে বাস করিতেন, বনফল ভক্ষণ করিতেন, বনজ দ্রব্যের প্রকৃতি পরীক্ষা তাঁহাদের নিকট অতি সহজ ছিল। তাঁহারা বনজ দ্রব্যের ক্রিয়া বা শক্তি বারম্বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। এক একটী ঋষির আশ্রম এক একটী ঔষধোদ্যান (Botanical garden) ছিল। তৎকালে স্কুল বা কলেজ ছিল না, তাঁহাদিগকে আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া শিক্ষা দিতে হইত না। অধ্যয়নার্থী ছাত্র গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। এই ছিল সাধারণ নিয়ম। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা শুনা যায় না। সশিষ্য ঋষিগণ কখন কখন অন্য তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে শাস্ত্রালোচনার ফল আদান প্রদান করিতেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকের পরীক্ষিত তত্ত্বসমূহ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যঋষিগণ ভারতে বাস করিতেন, ভারতজাত দ্রব্যের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া তাহা ভারতবাসীর শরীরেই প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারা ভারতীয় রোগসমূহের নিদান, প্রকৃতি, গতিসমূহ সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার সহিত জ্ঞাত-গুণ ঔষধের সামঞ্জস্য করিয়া বহুকাল পরীক্ষার ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই আমাদের রোগোপশম ঔষধ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্যক্

আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইবে যে, একদেশোদ্ভব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থের মৌলিক প্রকৃতি অনেক অংশে এক-ভাবাপন্ন। পরস্পর-নিকটবর্ত্তীদিগের প্রাকৃতিক একতা যত অধিক, পরস্পর-দূরবর্ত্তীদিগের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা তত অধিক। এই জন্যই বঙ্গদেশবাসী আমাদিগের সহিত পঞ্জাববাসীদিগের যেটুকু প্রাকৃতিক অসাম্য; তদপেক্ষা বহুদূরবর্ত্তী রুষিয়া, জর্ম্মনী, ইংলণ্ডবাসী-দিগের সহিত প্রাকৃতিক পার্থক্য অনেক অধিক। এই প্রকার পার্থিব পদার্থ সকলের গুণসমূহ স্থানিক প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশোৎপন্ন বৃক্ষাদি প্রধানতঃ শীতপ্রধান দেশে জন্মে না। যত্নপূর্ব্বক জন্মানর চেষ্টা করিলে তাহা হয়ত অসম্পূর্ণ বা ভিন্নগুণাবলম্বী হয়। মানব-গণের জীবন রক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম বলবৎ। দুরন্ত শীতপ্রধান লাপ্লাণ্ড-দেশবাসিগণের পক্ষে যে আলু মৎস্য মাংস নিয়ত ভোজন স্বাস্থ্যকর ও জীবনরক্ষক; গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসী আমাদিগের পক্ষে তাহা কখনই সুফল-প্রদ নহে। আবার আমাদিগের দেশের মুনি ঋষিগণ যে প্রকার ফলমূলাশী নিরামিষভোজী ছিলেন কি আমাদিগের দেশের হিন্দু বিধবাগণ নিরামিশ ভোজন করিয়া যে প্রকার সুস্থ শরীর ও দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হন; লাপ্লাণ্ডবাসিগণ হয়ত সে প্রকার নিরামিষ ভোজন করিয়া অনন্তিকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদিগের সহিত আমাদিগের খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্নতা জন্মিবারও ইহাই কারণ। তাঁহারা সর্ব্বদা মৎস্য মাংস মদ্য ব্যবহার করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরী হয়েন, আমাদের পক্ষে তাহা অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। এই প্রকার স্থানিক প্রকৃতির সহিত মনুষ্যপ্রকৃতির নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

জল, বায়ু, খাদ্য যেমন জীবন রক্ষার অবলম্বন; ঔষধ তাহার অন্যতম। পীড়িত শরীরে ঔষধ সেবন ব্যতীত জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই। একটী ঔষধই জন্মস্থানের প্রকৃতি-প্রসূত প্রণালীর বিভিন্নতা, ও প্রযোগনিয়মের পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রকাশ করে। একটী ঔষধ একাধারে পরীক্ষিত হইলে সেই ঔষধ তত্তুল্য বা তন্নিকট সম্বন্ধীয় অন্যাধারে যাদৃশ উপকারী হইবে, অন্যত্র কখনই তাদৃশ ফলপ্রদ হইবে না। আপাততঃ কুত্রাপি কুফল প্রদান না করিতে পারে বটে, কিন্তু সময়ানুসারে পরিণাম বিষময় হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। ভারতবর্ষ ইহার প্রত্যক্ষ ফল ভুক্তভোগী। বহুকাল হইতে ভারতবাসী প্রাচীন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয় চিকিৎ-সার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; তাই আজ ভারতবাসী রুগ্ন, অসুস্থ, দুর্ব্বল,

কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট! ঔষধসেবাই রোগ-প্রতীকারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। রোগ, রোগী ও ঔষধের পরস্পরের মৌলিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক উপ-যোগিতা স্থির করাই পীড়া-প্রতীকারের পক্ষে প্রকৃত কারণ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকল আমাদের এক জন্মভূমিতে জন্মিয়াছে; আমাদিগের এই শরীরের স্রষ্টা পূর্ব্বপুরুষগণ—আমরা যাঁহাদের রক্ত মাংসের উত্তরাধিকারী, যাঁহাদের শরীরের অংশপরম্পরা চলিয়া আসিয়া আজ আমাদের এই শরীর; সেই সকল আয়ুর্ব্বেদ-আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় আর্য্য-ঋষিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত আপনাপন শরীরে পরীক্ষা করিয়া, যে রোগের পক্ষে যে সমস্ত ঔষধ, তাহার যে প্রকার প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী এবং মাত্রা ও পথ্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; তাহাই আমা-দিগের শরীরের অধিক উপযোগী? না সেই শতযোজন-দূরবর্ত্তী শীতপ্রধান-দেশবাসী—যাহাদের সহিত আমাদের শোণিত সম্বন্ধ আছে কি না তর্কস্থল; এ হেন পাশ্চাত্যগণ সেই শীতপ্রধান দেশে মদ্যমাংসভোজী শরীরে পরীক্ষা করিয়া, যে রোগের পক্ষে যে ঔষধ, তাহার যে প্রকার প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী এবং মাত্রা ও পথ্য নির্ণয় করিয়াছেন; তাহাই আমাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী? আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মাত্রা ও পথ্য এবং এলোপেথি ঔষধের মাত্রা ও পথ্য কত অন্তর! পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। যাঁহাদের শরীরে আমাদের শরীর, তাঁহারাই আপন শরীর পরীক্ষা করিয়া যে স্থলে উপবাস বা লঘুপথ্য ও অনৌষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; এলোপ্যাথি ডাক্তারগণ সেই স্থলে প্রায়শঃ উপবাসে লঘু পথ্য, লঘু পথ্যে গুরু পথ্য ও অনৌষধে পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার পরিণাম ভারতবাসীকে আর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হইবে না। এলোপ্যাথি শীতপ্রধান দেশে আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত চিকিৎসা; সুতরাং তাহার বীর্য্য অতি তীক্ষ্ণ ও মাত্রা অতি অধিক। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; শীত ও গ্রীষ্মে পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ; সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে পরিণাম মঙ্গলজনক নয়; ইহাও প্রত্যক্ষ পরি-দৃশ্যমান। এলোপ্যাথি ঔষধের অধিকাংশ অরিষ্ট (Tincher), তাহাতে সুরাসার (Spirit) মিশ্রিত। একে ত সুরা গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশবাসীর পক্ষে সুসঙ্গত ব্যবস্থা নয়; বিশেষ সেই শীতপ্রধান দেশোৎপন্ন সুরা অতীব তীক্ষ্ণবীর্য্য। তাহাতে আবার ডাক্তারেরা দুগ্ধের ব্যবস্থা অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দুগ্ধ ও মদের মিলন কি প্রকার অনিষ্টকর, তাহা আমাদের দেশে যাঁহারা বর্দ্ধিত যকৃতের যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত তাঁহারা কিয়দংশে অনুমান করিতে পারিবেন। আমরা আবার অনেক সময় দেখিতে পাই অনেকে ডাক্তার-

দিগের অবস্থা মত পোর্ট (Port) সেবন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভয়ানক সুরাপায়ী হইয়া অবশেষে দুর্লভ মানবজীবনের সীমা সঙ্কুচিত করিয়া বসেন। ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলনের পূর্ব্বে বোধ হয় ঈদৃশ মদ্যপায়ীর সংখ্যার অভাব ছিল।

যে সমস্ত উপায়ে বৈদেশিকগণ ভারতের অর্থশোষণ করিয়া আপনাদের উদর প্রতিপালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন, যে সমস্ত কারণে ভারতবাসী আজ দরিদ্র উদরান্নের জন্য লালায়িত! বৈদেশিক চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব তাহার অন্যতম। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় চিকিৎসা, রাজা তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সম্যক যত্নশীল। তাহার উন্নতির জন্য (অবশ্য দেশের উপকার) স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ স্থাপন, স্থানে স্থানে দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের মহোপকার সাধন করিতেছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ পরোক্ষে তাহা আমাদের ইষ্টের না হইয়া পরমানিষ্টের কারণ হইয়াছে। একটী স্কুল বা কলেজের জন্য প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে, এ ব্যয়ভার কে বহন করে? রাজা কি তাঁর ইংলণ্ড হইতে এত টাকা আনিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের উপকার করিয়া থাকেন? না ভারতের টাকা দিয়াই ভারতবাসীর এই সমস্ত উপকার করিতেছেন? অন্ততঃ স্কুল কলেজ বা চিকিৎসালয়ে যে টাকা ব্যয় হয় তাহা যদি আমাদের ভারতবাসীর ঘরে আসিত তাহাতে ক্ষতি ছিল না। স্কুল কলেজের যত স্থূল বেতনের পদ সমস্তই ইংরেজদিগের দখলে। বড় বড় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার সমস্তই ইংরেজ ডাক্তারদিগের হস্তে অর্পিত। ভারতের চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োজন সকলই বিলাত হইতে আসিতেছে। আবার আজ কাল সাহেবদিগকে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করা আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, এই সকল কারণে ভারতের কত অর্থ পরোক্ষ ভাবে বিদেশে যাইতেছে। ভারত এবম্বিধ উপায়ে দিন দিন কেমন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহুল প্রচলন থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যায়, আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, আমাদের পরিণাম কত সুখজনক হয়। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সমূহ আমাদের পক্ষে এত সুলভ, যে প্রতি দিন আশু ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সকল আমাদের বাটীর চতুষ্পার্শ্বে ও গৃহপ্রাঙ্গণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ডাক্তারি চিকিৎসার সম্পূর্ণ

আশ্রিত সুতরাং ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত অনায়াসলব্ধ আশুফলকারক ঔষধের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা জন্মিয়াছে। আমরা এক্ষণে আর প্রাচীনগণের ন্যায় তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞানে যত্নশীল নহি। প্রতিদিন এই সমস্ত মহোপকারী ঔষধ সম্মার্জ্জনী আঘাতে প্রতি পদক্ষেপে দলিত করিতেছি। আবার পরক্ষণেই হয় ত সেই সকল ঔষধের জন্য, বা কপর্দ্দকব্যয়সাধ্য রোগে, একজন সিবিল সার্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার দর্শনী এবং তাহার ব্যবস্থা অনুসারে কত বহু মূল্যবান ঔষধ ক্রয় করিয়া, আমাদিগকে পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইতেছে। আমরা গৃহপ্রান্তস্থিত ঔষধের গুণাবলি পরিজ্ঞাত থাকিলে অনেক সময় ঈদৃশ ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। তাহা হইলে আমাদিগকে গৃহপার্শ্বস্থ আদা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশাগত জিঞ্জারের অনুসন্ধান করিতে হয় না। কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি অনাদরই কি আমাদের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণামের কারণ নয়? ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! কোন সহৃদয় ভারতবন্ধু এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে অব্যথিত হৃদয়ে কালযাপন করিতে পারেন?

আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মনের সংস্কার এই যে, "'এলোপ্যাথি চিকিৎসা' প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাদের যে প্রকার অনিষ্ট করিতেছিল 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা' প্রচলন হওয়ায় সে অনিষ্টের আর আশঙ্কা নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অতি মৃদু, সুতরাং আমাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাঁহারা আরও বলেন যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অনুপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় তাহাতে কোন অপকারের আশঙ্কা থাকে না।" দুঃখের বিষয় আমরা অনেক শিক্ষিত মহাত্মার এ প্রকার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মৃদু সুতরাং আমাদের পক্ষে কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উপযোগী হইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। বিশেষ যে ঔষধ বা দ্রব্যের গুণ বা শক্তি আছে, যাহা মানবশরীরে প্রযুক্ত হইলে ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ, যাহা উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে রোগোপশমের কারণ হয়, তাহা অযথা প্রযুক্ত হইলে কেন যে অপকার করিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যাহার গুণ, ক্রিয়া বা শক্তি আছে তাহা স্থলবিশেষে উপকার অন্যত্র অপকার করিবে। ঔষধ সকল আধার বিশেষে পতিত হইয়া যে বিভিন্ন ফল প্রদান করে তাহা বোধ হয় কাহাকেও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। মানবসকল

একই উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও দেশ, কাল ও পিতা মাতার প্রকৃতি ভেদে অনেকাংশে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত। প্রত্যেক মনুষ্য অন্য মনুষ্য হইতে ন্যূনাধিক ভিন্ন প্রকৃতির। কি শারীরিক কি মানসিক, সর্ব্বাংশেই ন্যূনাধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন ঘৃতাক্ত তৃণ-সমষ্টি জ্বলন্ত অগ্নির দাহিকা শক্তিকে সতেজ ও বর্দ্ধিত করে, আবার জল-সিক্ত তৃণসকল সেই অগ্নির দাহিকা শক্তিকে নিস্তেজ ও খর্ব্ব করিতে পারে, সেই প্রকার যে ঔষধ এক শরীরে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগোপশমের কারণ; অন্য শরীরে অযথা প্রযুক্ত হইলে তাহা রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়। হোমীয়প্যাথিক ঔষধ সকল কেন যে এই ঐশ্বরিক স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। তবে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধসকল যেমন অবিলম্বে তাহার অপকারিতা দেখায়, মৃদুবীর্য্য ঔষধ তত শীঘ্র তত পরিমাণ না দেখাইতে পারে। আমাদের সামান্য বিবেচনায় ইহাই আইসে। হোমীয়-প্যাথিক চিকিৎসা এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা হইতে আধুনিক—অত্যল্পকাল মাত্র আবিষ্কৃত। ইহা এখনও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও, আজও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যাহা অবশিষ্ট আছে, হোমীয়প্যাথিক চিকিৎসা উন্নতিপ্রবণ হইলেও এখনও তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অভাব আয়ুর্ব্বেদে যাহা ঘটিয়াছে, হোমীয়প্যাথিকে তদ-পেক্ষা অনেক অধিক এখনও বিদ্যমান। হোমীয়প্যাথিক চিকিৎসা নবজাত শিশু, আয়ুর্ব্বেদ জরাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। শিশু সংসারে কেবল মাত্র প্রবেশ করিতেছে, বৃদ্ধ সংসারতত্ত্বে পরিপক্ক। তবে কোন বিষয় বিস্মৃত কিন্তু স্মরণ করাইয়া দিতে পারিলে এখনও মনে হয়—এখনও উপদেশ-কারিতা শক্তি বিদ্যমান। শিশুর পরিণাম অপরীক্ষিত—ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে নিহিত। বৃদ্ধ পরীক্ষোত্তীর্ণ। পাঠক আজ আপনি কোহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন?

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

অনিলের প্রতি।

অনিল!
কোথা হ'তে এলে ভাই
বলনা আমায়;
পৃথিবীর কীট আমি,
ধূলাতে মগন,
তব সনে উড়িবারে চাই।

তরু লতা গুল্ম আদি
প্রকৃতির মেয়ে
করিবে আমায় কত
আদর সম্ভাষ,
তুমি যেন পাও ভাই—
তাই আমি চাই।
ওই যে ঝরিণী রাণী
কত কথা কয়
স্বরগ ভাষায়,
যেই তুমি তার কাছে যাও।
আমি তার কাছে গেলে
বারেক না চায় হেলে
আপনা মনেতে বালা
যায় নেচে নেচে।
আমি যদি সাধি তারে
ফিরে নাহি হেরে মোরে
কেন সে কহিবে কথা
আমি তার পর।
বনমাঝে তুমি গেলে
বিটপিরা বাহু মেলে
ডাকে তোমায় চারিদিক হতে।
সবুজ ঘোমটা খুলি
যত ফুল সবে মিলি
ডাকে তোমায়
সহাস্য বদনে।
যেমন হেরিলে ভায়ে
কত যুগান্তর পরে
কুলবধূ শ্বশুরের ঘরে।
আমি কিন্তু গেলে বনে.
ভুলেও কেহ না বলে,
'কতক্ষণ আইলে হেথায়।"
অনিল!
উন্মুক্ত তোমার হিয়া
সারা জগতের সুখ নিকেতনে
বাঁধিয়াছ আপনার ঘর;
সারা জগতের ভাই বোনে মিলি
খেলিবে কতই খেলা।
সে খেলা খেলিতে আমি
শিখিবারে চাই।
তুমি ভাই দয়া করে
আমারে আপন ভেবে
হাত ধ'রে শিখাও সে খেলা।
যেখানে যাইবে তুমি
আমারে করিও সাথে
সকলে ভাবিবে মোরে অনিলের ভাই,
খেলিতে খেলিতে যবে
জঠরের জ্বালা হবে
প্রকৃতি মায়ের কাছে
ছুটিয়া যাইব;
কোমল কোলেতে তাঁর
বসিয়া হরষে
পিবি তোমার মত
সুধা প্রাণ ভ'রে।

শ্রীশ—

রঙ্গলাল বাবু ও যোগাঙ্গ সন্ধ্যা।

গত আষাঢ় মাসের আর্য্যদর্শনে শ্রীযুক্ত কালীকমল সার্ব্বভৌম মহাশয় যোগাঙ্গ-সন্ধ্যা নামক একটী প্রস্তাব লেখেন। মাঘ মাসের আর্য্যদর্শনে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা দুইটী প্রস্তাবই বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। রঙ্গলাল বাবু যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ দিয়াছেন তাহার উপর আর কথা নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তবে একটী কথা বলি, রঙ্গলাল বাবুর সুরস প্রবন্ধ পড়িতে সকলেরই বিশেষ কৌতূহল জন্মে; কিন্তু এ প্রকার গম্ভীর বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি যে পরিহাস করিয়াছেন, তাহা আদৌ বিবেচনাসঙ্গত হয় নাই।

আর্য্যদর্শনে শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঙ্গলাল বাবুর মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ প্রস্তাবটীও মন দিয়া পাঠ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঙ্গলাল বাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া পদে পদে বরং তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সে কথা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে। আর্য্যদর্শনের বিজ্ঞ পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি সাবধান হইয়া পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গলাল বাবু আপনার প্রতিবাদে দুইটী প্রধান আপত্তি দেখাইয়াছেন। একটী আপত্তি এই যে, 'ধ্যা' ধাতুর উত্তর ক্ষিপ্ প্রত্যয় বিধান করিলে ধী এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, পূর্ব্বতন মুনি ঋষিরা সন্ধ্যা শব্দে সময়ের সন্ধিস্থলে দেবারাধনাদি যে সকল দৈবানুষ্ঠান আছে, তাহাই বুঝিতেন। সেই আরাধনায় বাহ্য ক্রিয়াই থাকুক আর আধ্যাত্মিক ক্রিয়াই থাকুক, তদ্বিষয়ে রঙ্গলাল বাবু কোন আপত্তি করেন নাই।

ধ্যা ধাতুর উত্তর ক্ষিপ্ প্রত্যয় করিলে 'ধ্যা' এ প্রকার রূপসিদ্ধি দুর্ঘট, শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ভ্রমের সাফাই করিবার নিমিত্ত তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যাকরণ অতি খল শাস্ত্র। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি, জানি না। ব্যাকরণকে খল বলিয়া কেহ যদি 'অহং গচ্ছতি' লেখেন, সে দোষ লেখকের উপরেই পড়িবে, ব্যাকরণ কখন দোষী হইবে না। এ পর্য্যন্ত যে সকল শব্দ ও ব্যাকরণের নিয়ম সাধুসম্মত বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শেষ শ্লোকটী অপ্রাসঙ্গিক, তাহা কাহারও অনুকূলে বা প্রতিকূলে নহে। আর দুইটী শ্লোক রঙ্গলাল বাবুর অনুকূলে। যথা—

শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগো যস্মিন কালে প্রবর্ত্ততে
সা সন্ধ্যা যোগযুক্তানাং সমাধিস্থৈঃ প্রণীয়তে।
শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগঃ সন্ধ্যায়াং কার্য্য এবহি।

লেখক এস্থলে 'কার্য্যমেবহি' এই প্রকার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

উপরের শ্লোক দুইটীর অর্থ কি, পাঠক দেখুন। প্রথম শ্লোকের মর্ম্ম এই— যৎকালে শিবশক্তির সমাযোগ হয়, যোগযুক্তদের তাহাই সন্ধ্যা। সমাধিস্থ ব্যক্তিরা এই কথা বলিয়া থাকেন।

পাঠক দেখুন, রঙ্গলাল বাবু প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, এ শ্লোকের মর্ম্মও তাহাই। ইহাতেও আমরা একটী নির্দ্দিষ্ট কালের নাম পাইতেছি; অর্থাৎ "যৎকালে" * * "তাহাই সন্ধ্যা"

দ্বিতীয় শ্লোকের মর্ম্ম এই—

সন্ধ্যাকালে শিবশক্তির যোগ করা কর্ত্তব্য। এটীও রঙ্গলাল বাবুর মতের পরিপোষক। সন্ধ্যা শব্দে চিন্তা করা বুঝায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিরুদ্ধে। অতএব এ প্রকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীরামনাথ বিদ্যানিধি।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই ভারতের উপযোগী চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা আয়ুর্ব্বেদের উপযোগিতা ও এলোপ্যাথির অনুপযোগিতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, হোমীয়প্যাথিতেও তৎসমস্ত বিদ্যমান। হোমীয়প্যাথিও আমাদের স্বদেশীয় চিকিৎসা নয়, বহুদূরবর্ত্তী দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক কর্ত্তৃক বিভিন্ন শরীরে পরীক্ষিত। সুতরাং তাহা আমাদের শরীরের কতদূর উপযোগী, পাঠক বিবেচনা করিবেন। হোমীয়প্যাথিক চিকিৎসা "সমঃ সমং শময়তি বা বিষস্য বিষমৌষধং" (Simelia semilibus curantor) মূলসূত্র অবলম্বনে আবিষ্কৃত। উহা ভারতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের একদেশ মাত্র।

"উপশয়ঃ পুনর্হেতুব্যাধি বিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণাং চৌষধাহারবিহারাণাং সুখানুবন্ধ।"

—চরক নিদানস্থান।

"হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাং। ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহং। বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ"

—মাধব নিদান।

১। হেতু বিপরীত ঔষধ, আহার, বিহার। ২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ, আহার, বিহার। ৩। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত, ঔষধ, আহার, বিহার। ৪ হেতু বিপরীত অর্থকরী ঔষধ, আহার, বিহার। ৫ ব্যাধি বিপরীত অর্থকরী ঔষধ, আহার বিহার। ৬ হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত অর্থকরী ঔষধ, আহার, বিহার। ভূতপূর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই গুলিকে রোগ প্রতীকারের প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হেতু বিপরীত অর্থকরী ঔষধ আহার বিহার হোমীয়প্যাথিক আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূল সূত্র।

১। রোগোৎপত্তির হেতু যদ্‌গুণ ক্রিয়া বিশিষ্ট, তদগুণ ক্রিয়ার বিপরীত গুণক্রিয়া বিশিষ্ট ঔষধ আহার বিহার হেতু বিপরীত ঔষধ আহার বিহার।

২। রোগ যে গুণক্রিয়া বিশিষ্ট, সেই গুণ ক্রিয়ার বিপরীত গুণ ক্রিয়া বিশিষ্ট ঔষধ আহার বিহার ব্যাধি বিপরীত ঔষধ আহার বিহার।

৩। হেতু ব্যাধি উভয় যে গুণ ক্রিয়া যুক্ত, তাহার বিপরীত গুণ ক্রিয়াযুক্ত যে ঔষধ আহার বিহার তাহাই হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধ আহার বিহার।

৪। রোগোৎপত্তির হেতুর সমানধর্ম্মী ঔষধ আহার বিহার যদি স্বভাব বশতঃ রোগোপশমকারী হয়, তবে তাহাকে হেতু বিপরীত অর্থকরী ঔষধ আহার বিহার বলা যায়। ইহাই হোমীয়প্যাথিক আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূলসূত্র।

৫। রোগের সমানধর্ম্মী ঔষধ আহার বিহার যদি আপন প্রভাবে রোগোপশমক হয়, তাহাকে ব্যাধি বিপরীত অর্থকরী ঔষধ আহার বিহার বলে।

৬। হেতু ব্যাধি উভয়ের সমানধর্ম্মী যে ঔষধ আহার বিহার আপন প্রভাবে রোগ নিবারণ করিতে পারে তাহাকে হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত অর্থকরী ঔষধ আহার বিহার বলে।

আর্য্যগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে এই প্রধান ষড়ংশে এবং অষ্টাদশ অণু-অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা পীড়া বিশেষে ইহার প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া পীড়া প্রতীকার করিতেন। আমরা আজ প্রসঙ্গাধীন তাহার কতিপয় দৃষ্টান্তের মাত্র উল্লেখ করিব।

১। হেতু বিপরীত চিকিৎসা যথা। শীত বীর্য্য শ্লেষ্মা জনিত জ্বরে শুণ্ঠ্যাদি উষ্ণবীর্য্য ঔষধ। ১ ঔষধ। শ্রমজনিত বাত বৃদ্ধ জ্বরে, সরস পথ্য। ২ আহার। স্নিগ্ধ দিবানিদ্রা জনিত কফ বৃদ্ধ জ্বরে রুক্ষকর রাত্রিজাগরণ। ৩ বিহার।

২। ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসা। রুক্ষগুণ বাতবৃদ্ধ রোগে দেবদার্ব্বাদি স্নিগ্ধ ঔষধ। ১ ঔষধ। অতিসারে মসুর যূষাদি স্তম্ভনকর পথ্য। ২ আহার। রৌক্ষগুণ বায়ু বৃদ্ধিতে স্নিগ্ধ গুণ দিবানিদ্রা। ৩ বিহার।

৩। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত চিকিৎসা। শীত গুণ বাত জনিত শোথে উষ্ণ দশমূলাদি। ১ ঔষধ। বাত শ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণী রোগে লঘু অল্পোষ্ণবীর্য্য তক্র। ২ আহার। স্নিগ্ধ দিবা নিদ্রা জনিত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হেতু তন্দ্রায় উভয় বিপরীত রুক্ষকর রাত্রিজাগরণ। ৩ বিহার।

৪। হেতু বিপরীত অর্থকরী চিকিৎসা। কটুরসাতিযোগজনিত শুক্রক্ষয়ে কটু-রস-প্রধান শুক্রকর পিপ্পলী, পিত্ত প্রধান পচ্যমান ব্রণ শোথে পিত্তকর উষ্ণ প্রলেপ। ১ ঔষধ। রুক্ষ আহারাতিযোগজনিত শুক্রক্ষয়ে রুক্ষগুণ শুক্রকর শুষ্ক গোধূম। ২ আহার। ভয় জন্য বাতোন্মাদের ত্রাসন। ৩ বিহার। হেতু বিপরীত অর্থ-করী চিকিৎসা হোমীয়প্যাথিক আয়ু-র্ব্বিজ্ঞানের মূলসূত্র।

৫। ব্যাধি বিপরীত অর্থকরী চিকিৎসা। ছর্দ্দিরোগে বমনকারক মদন ফলাদি। ১ ঔষধ। শ্লেষ্মপ্রধান প্রমেহে যব গোধূম মধু প্রভৃতি কফ-প্রধান পথ্য। ২ আহার। স্নিগ্ধ পিত্তবৃদ্ধি-জনিত অগ্নিবৃদ্ধি রোগে স্নিগ্ধ দিবা নিদ্রা। ৩ বিহার।

৬। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত অর্থকরী চিকিৎসা। কটু-অম্ল-উষ্ণ আহারজনিত অম্লপিত্তে অম্ল-আমলকী; অগ্নিদগ্ধ সন্তপ্ত স্থানে অন্তর্ব্বাদি উষ্ণ প্রলেপ। ১ ঔষধ। মদ্যপানজনিত মদাত্যয় রোগে মদ-কারক মদ্য। ২ আহার। ব্যায়ামাতি-যোগজনিত বাতরোগে বাতবর্দ্ধক সম্যগ্‌ব্যায়াম। ৩ বিহার।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ পীড়ার অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে

চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে হোমীয়-প্যাথিক চিকিৎসাকে এখনও বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনেক অংশে অপরি পুষ্ট বলিয়া বোধ হইবে। অনেক স্থানে তাঁহাদের "সমঃ সমং শময়তি" রক্ষা করিতে গেলে রোগীর জীবন রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উচ্চ হইতে পতিত, হস্ত-পদাদি-ভগ্ন রোগীকে পুনরায় উচ্চ স্থান হইতে ফেলিয়া দিলে, তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পায় না। অতিভোজনজনিত অগ্নিমান্দ্যে উদরাধ্মানে পুনর্ব্বার বহুভোজন ইষ্টের কারণ অপেক্ষা অনিষ্টের কারণ অধিক হয়। এবম্বিধ ও অন্যবিধ বহু স্থলে "সমঃ সমং শময়তি" রক্ষা করা কষ্টকর। তবে "সমঃ সমং শময়তি" যে চিকিৎসা বিষয়ক মূল সূত্রের কোন এক অংশ তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদকারগণ যে বহু সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে এতদপেক্ষা বহু গুণ বিস্তৃতরূপে আয়ুর্ব্বেদের মূল সূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না।

অর্থশোষণকারিতা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় যে পরিমাণে রহিয়াছে, হোমীয়প্যাথিক চিকিৎসায়, বিরল প্রচলন হেতু, তত পরিমাণ না থাকিতে পারে কিন্তু এককালে অভাব দৃষ্ট হয় না। হোমীয়প্যাথিক চিকিৎসা প্রচলনেও বহু পরিমাণে অর্থ ভারত হইতে পরোক্ষ ভাবে বিদেশে গমন করিতেছে। এলোপ্যাথিক ও হোমীয়প্যাথিক ভিন্ন হাকিমি প্রভৃতি আরও কতিপয় চিকিৎসা প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাহার প্রচলন এত অল্প যে বহু জনের মধ্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। এ জন্য আমরা আর তাহার সমা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

যদিও বিদেশীয় চিকিৎসা ভারত-ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পরীক্ষিত ও বারম্বার পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল সহকারে ভারত-বাসীর পক্ষে উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও কত অনিষ্ট একবার ভাবিয়া দেখিলে আর সে উপকারিতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না। একেত পরীক্ষিত ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা শরীরের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে; এ পরীক্ষা-সময়ের অনিষ্ট কত প্রকার পাঠক ভাবিয়া দেখুন। আমরা আজ কাল বিদেশীয় চিকিৎসার পরীক্ষাক্ষেত্র, তাই আজ আমাদের শরীর ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন। আরও শত বৎসর এই প্রকারে বিদেশীয় চিকিৎসাকে আমাদের শরীরে পরীক্ষা করিলে আমাদের আর পরীক্ষার ফল দেখিয়া যাইতে হইবে না। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের অস্তিত্ব লোপ হইবে। যদি বিদেশীয় চিকিৎসা আমাদিগের উপযোগী রূপে গঠিতও হয়, তথাপি আমাদিগকে চিরকাল তাহার জন্য

পরমুখাপেক্ষী হইয়া বাস করিতে হইবে। আমরা যে কত কালে বিদেশীয় ঔষধসকলের সর্ব্বতত্ত্বে সুপণ্ডিত, উপাদান সংগ্রহে অভিজ্ঞ ও প্রস্তুত করণে কৃতকর্ম্মা হইতে পারিব, তাহা ভাবিয়া ইয়ত্তা করিতে পারি না। আর যে পরম করুণাময় জগদীশ্বর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব্বে স্নেহময়ী জননীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া, জীবন রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন; তিনিই যে আমাদের পীড়া প্রতীকারার্থে দুস্তর সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, সীমান্তরিত বহুযোজনদূরবর্ত্তী দেশে ঔষধ স্থাপন করিয়াছেন ইহা কখনই সম্ভাবিত নয়। এ প্রকার হইলে তাঁহার করুণাময় নামে কলঙ্কারোপ করা হয়। বস্তুতঃ ভারতীয় বহুদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ভূয়োদর্শনে আমাদের দেশ কাল ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুবার পরীক্ষা পূর্ব্বক যে সমুদায় ঔষধ আমাদিগের উপযোগী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের একান্ত অনুকূল ও একমাত্র মঙ্গলের নিদান। তাই বলিতেছি যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই ভারতের উপযোগী চিকিৎসা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে অর্দ্ধাঙ্গ। আমরা তদুত্তরে বলিতে পারি যে, পঁচিশ কোটী ভারত-বাসী মনোযোগ করিলে অসম্পূর্ণ অর্দ্ধাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুষ্টি সাধন ও পূর্ণাবয়ব করিতে কতক্ষণ লাগিবে? আর নবাগত বিদেশীয় চিকিৎসাকে ক্রমে পরীক্ষা করিয়া আমাদের উপযোগী করিয়া লওয়া অপেক্ষা বোধ হয় পরীক্ষিত চিকিৎসার লুপ্ত অঙ্গের পুনরুদ্ধার করিয়া লওয়া লাভজনক ও সঙ্গত। আজ কাল ইংরেজ প্রসাদাৎ ডাক্তারি চিকিসার প্রাদুর্ভাবে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তাঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি ও শিক্ষার স্থল রহিয়াছে। অস্ত্র চিকিৎসার অভাবে অচিকিৎসার সম্ভব নয়; আয়ুর্ব্বেদেও অস্ত্রচিকিৎসা ছিল না এমন নয়; তবে তাহা অধুনা প্রচলিত ডাক্তারি অস্ত্রবিদ্যা হইতে অনুন্নত ও লুপ্তপ্রায়। যদি কোন স্বদেশবৎসল, আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী ব্যক্তি আন্তরিক একাগ্রতা সহকারে যত্ন করেন, তাহা হইলে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে যে অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী অসংস্কৃত ভাবে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, পাশ্চাত্য অস্ত্রবিদ্যার সহিত তাহার একতা সম্পাদন পূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের অভাব পূরণ করিয়া এই রোগ-শোকপরিপূরিত ভারতের জরা-ব্যাধি-অকালমৃত্যুর অনেক লাঘব করিতে পারেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

আত্মোৎসর্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

রবার্ট ব্রুস্।

এ তীর্থ পর্য্যটন শেষ করিবার পূর্ব্বে চল পাঠক! একবার দেখিয়া যাই ওয়ালেসের মৃত্যুর পর স্কট্‌লণ্ডের কি দশা ঘটিল। জন্মভূমির যে স্বাধীনতার জন্য ওয়ালেস্ প্রাণোৎসর্গ করিলেন, দেখিয়া আসি স্কট্‌লণ্ডবাসী ওয়ালেসের তিরোভাবে সে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির জন্য কি উদ্যোগ করিতেছেন। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও ভীমপরাক্রম ওয়ালেস্ ও তদীয় বীরদল যে অমূল্য ধন লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, দেখিয়া আসি কোন্ বীরচূড়ামণি স্কট্‌লণ্ডকে সেই অমূল্য দেবদুর্লভ ধনে ধনী করিতে সক্ষম হইলেন।

পাঠক! ঐ শুন রণবাদ্য বাজিতেছে। ঐ দেখ ব্যান্‌কবরন্ নদীতীরে দুইটী মহতী সেনা পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য যেন পরস্পরের সম্মুখীন হইতেছে। ঐ যে আজানুলম্বিতবাহু, বৃষস্কন্ধ, মনোমোহনরূপ, লৌহকঞ্চুক-পরিবৃত বীরপুরুষ দেখিতেছি—যিনি কখন অশ্বপৃষ্ঠে, কখন পাদচারে রণাঙ্গন আলোড়িত করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? যাঁহার শাণিত খড়্গ, লেলিহমান তরবারি, ও অগ্নি-উদ্গারী বর্ষাফলক চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিস্তার করিতেছে, ঐ মহাপুরুষ কে? যিনি অগ্নিময়ী উদ্দীপনার বলে আপনার সৈন্যগণের নির্ব্বাণোন্মুখী বীর্য্যবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিতেছেন, ঐ দিব্যাকৃতি পুরুষ কে? যিনি 'উহাদের উপরে'—'উহাদের উপরে'—'ঐ পলায়' —এইরূপে বাক্যে পলায়মান শত্রুসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইবার জন্য নিজ সৈন্যকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং যাঁহার ভীষণ আক্রমণে শত্রুসেনা শতধা বিভক্ত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতেছে, ঐ ভীমপরাক্রম পুরুষ কে? যাঁহার প্রচণ্ড অসি-প্রহারে সপ্তবিংশ শত্রু-সেনাপতি সসৈন্য বর্ণস্থলে ধরাশায়ী হইয়াছেন, যাঁহার অনুসরণকারিণী সেনার অস্ত্রাঘাতে হত সৈন্যের দেহে ঐ নদী বুজিয়া যাইতেছে, কালান্তকযমোপম ঐ বীরপুরুষ কে? কে যেন অন্তরীক্ষ হইতে উত্তর দিলেন ইনিই স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতার উদ্ধারকর্ত্তা রাজর্ষি রবার্ট ব্রুস্। ঐ দেখ! স্কট্‌লণ্ডের বক্ষে জ্বলদক্ষরে তাঁহার ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে। আমি সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিয়া তোমায় শুনাইতেছি শুন:—

যে দ্বাদশ জন রাজা রাণী মার্গেরেটের মৃত্যুর পর স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া দাবী করেন, রবার্ট ব্রুস্ ও বেলিয়ল্ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। অধিকার বিষয়ে বিবদমান রাজবৃন্দ

মীমাংসার জন্য ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বেলিয়লেরই দাবীর সমর্থন করেন। বেলিয়ল্ কিন্তু নামমাত্র স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন। কারণ তাঁহাকে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া এড্‌ওয়ার্ডের পেশনভোগী হইয়া লণ্ডনেই অবস্থিতি করিতে হইল। হণ্টিংডনের আরল্ ডেভিডের জ্যেষ্ঠ কন্যার পৌত্র বেলিয়ল্, আর তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র এ প্রস্তাবের নায়ক রবার্ট ব্রূস্। সম্বন্ধে ব্রূস নিকটতর হইলেও জ্যেষ্ঠাধিকার বিধি-অনুসারে বেলিয়লই স্কটিশ সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া এড্‌ওয়ার্ডের হস্তাবলম্ব প্রাপ্ত হন কিন্তু কুচক্রী এড্‌ওয়ার্ড অধিক দিন বেলিয়লকে এ অবস্থায় লোকের নয়নসমক্ষে রাখিতে সাহস করিলেন না। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলিয়ল্‌কে কৌশলে ফ্রান্সে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেই অবধি বেলিয়লের নাম ইতিহাস হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। অধীন স্কট্‌লণ্ডের রাজসিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। স্কট্‌লণ্ডকে স্বাধীন করিয়া সেই সিংহাসনে আরূঢ় হইবার আশা ও ইচ্ছা এই সময়েই ব্রূসের মনে প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

একদিন ওয়ালেস্ ব্রূসকে এই শূন্য সিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং ব্রূসের নিকট তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই, সে প্রতিজ্ঞাপালনের সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ওয়ালেস্‌কে বধ করেন। স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের ভার তাহার পর হইতে ভগবান্ ব্রূসের হস্তেই সমর্পিত হয়।

ওয়ালেসের সেই নিদারুণ হত্যাসম্বাদে সমস্ত স্কট্‌লণ্ড অগ্নিময় হইয়া উঠে। সেই স্কট্‌প্রাণ বীরের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রত্যেক স্কট্‌লণ্ডবাসী প্রাণপণ করেন। ব্রূস্ এই সময় লণ্ডনে ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ডের হস্তে তাঁহার জীবন সংশয় শুনিয়া তিনি বেগবান্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গোপনে লণ্ডন হইতে স্কট্‌লণ্ডাভিমুখে পলায়ন করেন।

ব্রূস্ একশ্বাসে লণ্ডন হইতে ডম্‌ফ্রিজ্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। অথায় স্কট্‌লণ্ডের প্রধান ভূম্যধিকারী এড্‌ওয়ার্ড-দাস জাতীয় বিশ্বাসহন্তা কোমিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রূস্ তাঁহাকে দেখিয়া কাতর ভাবে বলিলেন 'দেখ কোমিন্! স্কট্‌লণ্ডের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় ভাবিলে ও ভবিষ্যতে কি হইবে মনে হইলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক সময়ে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডের অধীন একটী উপরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। তুমি ও আমি সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে আবার

ইহাকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিতে পারি। অতএব আইস! হয় আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত লইয়া তাহার বিনিময়ে স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন পুনরুদ্ধারকরণবিষয়ে আমার সহায়তা কর, নয় তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমায় দাও, আমি তদ্বিষয়ে তোমার সহায়তা করি'। কোমিন্ ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি এড্‌ওয়াডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্রূস্ বলিলেন—'তুমি আমার সমস্ত গুপ্ত কথা এড্‌ওয়ার্ডকে বলিয়া দিয়া জাতীয় বিশ্বাস নষ্ট করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হও নাই, কিন্তু এড্‌ওয়াডের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে বড় ব্যস্ত দেখিতেছি!' ব্রূসের এই বিদ্রূপোক্তিতে কোমিন্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন 'তুমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলিতেছ'। সহসা ব্রূসের রক্তস্রোত ধমনীমণ্ডলে প্রবাহিত হইল। তাঁহার করস্থিত ভুজালী সেই তাড়িতবেগে কোমিনের উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। উদরপ্রবিষ্ট ভুজালী যেমন তুলিয়া লইলেন অমনি রক্তস্রোত আসিয়া তাঁহাকে আপ্লুত করিল। তিনি সেই রুধিরাক্ত বেশে বাহিরে আসিয়া অনুচরবর্গেকে বলিলেন—'আজ কোমিন্‌কে হত্যা করিয়াছি।' এই বলিয়াই তিনি উন্মত্তের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

ডম্‌ফ্রিজ্ নগরের গ্রেফেয়ার্স গির্জ্জায় ব্রূস্‌ও কোমিনের এই কথোপকথন হয়। এড্‌ওয়ার্ডের একমাত্র আশাস্থল কোমিন্ গ্রেফ্রায়ারস্ গির্জ্জায় মৃত্যুশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, এ সংবাদ এড্‌ওয়ার্ডের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি অবিলম্বে অসংখ্য সৈন্য সহ স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিবেন, ব্রূসের মনে সহসা এই চিন্তা উদিত হইল। সুতরাং তিনি আর ভাবিবার সময় নাই দেখিয়া একেবারে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। স্কট্‌লণ্ডের বীরদল এই সংবাদে নাচিয়া উঠিলেন। তিনি লচ্‌মেবেন্ দুর্গে গিয়া জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দকে পত্রদ্বারা আহ্বান করেন। এই আহ্বানে আরল্ ডগলাস্ প্রভৃতি ওয়ালেস্-সহচর দেশহিতৈষিদল তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন।

ব্রূস্ এই ক্ষুদ্র বীরদল লইয়া প্রথমে গ্লাস্‌গো নগরে ও পরে তথা হইতে স্কোন নগরে গমন করেন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ মার্চ্চ শুক্রবার স্কোনের যে শিলাপট্টে স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নরপতিগণ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই শিলাপট্টেই ব্রূস গ্লাস্‌গোর বিসপ্ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। স্কট্‌লণ্ডের রাজমুকুট, রাজচ্ছত্র ও রাজপরিচ্ছদ এড্‌ওয়ার্ড সমস্তই ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন। স্কোনের মঠে যে রাজদত্ত স্বর্ণমুকুট ছিল, সেই মুকুট মঠস্বামী তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন, গ্লাস্‌গোর

বিসপ্ নিজ বস্ত্রাগার হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র লইয়া তাঁহাকে রাজপরিচ্ছদে সাজাইলেন। স্কটলণ্ডের অধিকাংশ যাজক, আরল ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক এই অভিষেকস্থলে উপস্থিত থাকিয়া এই জাতীয় উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন, এবং অভিষেকান্তে প্রকাশ্যে ব্রুসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

অভিষেকের পর দিন বুকানের কাউণ্টেস ইজাবেলা স্কোনে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফাইফের আরলের ভগিনী। ফাইফের আরলেরাই আবহমান কাল অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। ইজাবেলা সেই বংশের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রুসকে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। ব্রুস এই মনস্বিনীর সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার অভিষিক্ত হইলেন—দ্বিতীয়বার রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে অর্পিত হইল। কিন্তু এই কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য এই বীর রমণীকে চারি বৎসর পিঞ্জরবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। যখন ব্রুস এডওয়ার্ড-ভয়ে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন এডওয়ার্ড তাঁহার অনুকূলে যে যে ব্যক্তি ছিল সকলকেই কোন না কোন দণ্ড দিয়াছিলেন।

অভিষেকের পর ব্রুস স্কটলণ্ডের সর্ব্বত্র একবার পরিভ্রমণ করিলেন। গিরিদুর্গ সকল ক্রমে ক্রমে সমস্তই তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। নূতন নূতন লোক তাঁহার দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। ইংরাজেরা ভয়ে স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার করতলস্থ হইল। কিন্তু তিনি এত সহজে কাহারও উপর প্রসন্ন হইবার নহেন।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী একবার তাঁহার দিকে কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। কোমিনের আত্মীয় স্বজন ব্রুসের বিজয়ে ভীত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কোমিনের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আবার দেশের লোকসাধারণ সহসা এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত না থাকায়, তাঁহার সাহায্য না করিয়া বরং তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিল। এদিকে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ব্রুসের স্পর্দ্ধা দমন করিবার নিমিত্ত মহতী সেনা লইয়া স্কটলণ্ডাভিমুখে অভিযান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই সংবাদ ব্রুসের কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুতরাং পার্ব্বত্যপ্রদেশে বা গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় প্রতীক্ষা করা ভিন্ন ব্রুসের আর উপায়ান্তর রহিল না।

এই সময় হইতে ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রুসের কষ্ট যন্ত্রণার আর সীমা ছিল না। তিনি রাজা হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। ফলমূল তাঁহার আহার

সামগ্রী ও বৃক্ষপল্লব তাঁহার শয্যা ছিল। তিনি নিজের রাজ্যেই চোরের ন্যায় ছদ্মবেশে ও গুপ্তাবাসে অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শত্রুরা অবিরাম তাঁহার অনুসরণ করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। এইরূপ দুরবস্থাতেও তাঁহার বীর সহচরবৃন্দ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। সুখে ও দুঃখে ছায়ার ন্যায় তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিতেন। এদিকে ইংরাজেরা তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীপতি ও অন্যান্য কুটুম্ববর্গকে ধরিয়া আনিয়া ভীষণ নৃশংসতার সহিত বধ করিতে লাগিল। তদীয় মহিষী কন্যাসহ প্রাণভয়ে সেণ্ট ডুথাকের মঠে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু পামরেরা তাঁহাদিগকে তথা হইতে ধরিয়া আনিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করে। তথাকার কারাগারে তাঁহারা আট বৎসরকাল অবরুদ্ধ থাকেন।

১৩১০ খৃষ্টাব্দ হইতে আবার সৌভাগ্যস্রোত ফিরিতে আরম্ভ হইল। অনিয়মিত স্বাধীনতা-সমরে দীক্ষিত হওয়ায়, নিয়মিতরণদীক্ষিত ইংরাজ সৈন্যকে ব্রুস্ সহজে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া পার্ব্বত্য স্কটেরা তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। যে সকল গিরিদুর্গ তাঁহার হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, আবার সে সকল ধীরে ধীরে তাঁহার করতলস্থ হইতে লাগিল। স্কটলণ্ড আবার ইংরাজরাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইল।

এই সময় দ্বিতীয় এডওয়ার্ড এক লক্ষ সৈন্য লইয়া স্কটলণ্ডের অভিযানে নির্গত হইলেন। এই মহতী সেনা ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন ব্যনক্‌বরন্ নদীতীরে আসিয়া ব্রুসের সৈন্যের সম্মুখীন হইল। পরদিন প্রত্যূষে উভয় সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করিল। ভীষণ সংগ্রামের পর বিজয়লক্ষ্মী ব্রুসের গলে বরমাল্য অর্পণ করেন। সেই এক লক্ষ ইংরাজ সৈন্য, নিমেষমধ্যে যেন কোথায় উড়িয়া গেল। সেই সৈন্যের কিয়ৎ পরিমাণ সমরপ্রাঙ্গণে, কিয়ৎ পরিমাণ নদীগর্ভে ও অবশিষ্টাংশ পলায়নপথে সমাধি-নিহিত হইল। এডওয়ার্ড স্বয়ং ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এই পরাজয়বার্ত্তা স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট রহিলেন।

এতদিনে ওয়ালেস্ ও ব্রুসের শরসাধনার ফল ফলিল। স্কটলণ্ডে স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদিত হইল। ইংলণ্ড এ আঘাতের পর আর শীঘ্র মাথা তুলিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে স্কটলণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে হইল। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড অল্প বিস্তর পরিমাণে স্কটলণ্ড আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রতি বারই প্রতিহত হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্রুসও সসৈন্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠনলব্ধ ধনে

স্কটলণ্ডের শূন্য কোষাগার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ অবস্থা উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনায় উক্ত বৎসরের ২৩ জুন ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য একটী সন্ধি হইল। বহুদিনের পর স্কটলণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইল। গর্ব্বিত ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া এখন স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা ও ব্রুসের রাজত্ব স্বীকার করিতে হইল। দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তৃতীয় এডওয়ার্ড এই সন্ধি চিরস্থায়ী করিবার জন্য ১৩২৮ খীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইয়র্ক নগরে নিজ পার্লেমেণ্টকে এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিতে বলেন। তদনুসারে পার্লেমেণ্ট যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—'ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন যে অতঃপর স্কটলণ্ড স্বাধীন রাজা ব্রুস ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণেরই থাকিবে; ইহা ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে; ইংলণ্ড ইহার উপর সমস্ত দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করিলেন; যদি এই স্বাধীনতা স্বত্বের বিরোধী কোন প্রকার লিখনাদি থাকে তাহা অদ্য হইতে নামঞ্জুর হইল।' এডওয়ার্ড ১৭ই মার্চ্চ এডিন্‌বরা নগরে এই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন ও এপ্রিল মাসে ইংলিশ পার্লেমেণ্ট দর্হামটন নগরে এই সন্ধির অনুমোদন করেন। সেই জন্য এই সন্ধি নর্দ্যাম্‌টন্ সন্ধি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এখন হইতে স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইল। সেই অবধি স্কট-লণ্ডকে আর কখন অধীনতা-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। রাজ্ঞী এলিজেবেথের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জেম্‌সই প্রথম জেমস নামে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরূঢ় হন। সেই অবধি এই দুই রাজ্য একীভূত হইয়া গিয়াছে।

ধন্য ওয়ালেস! ধন্য ব্রুস! ধন্য তোমাদের বীরত্ব! ধন্য তোমাদের অধ্য-বসায়! ধন্য তোমাদের স্বদেশানুরাগ! তোমাদের শরসাধনার বলে অভাবনীয়-রূপে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হইল। দেব! আশীর্ব্বাদ কর, যেন পতিত ভারত তোমাদের ন্যায় স্বাধীনতা দেবীর প্রকৃত উপাসক হয়। যেন অতঃপর আমরা দেবদুর্ল্লভ এই রত্নের পূর্ণ মূল্য বুঝিতে শিখি। আর কি চাহিব দেব? আর কি আছে ইহার তুল্য?

রমণী।

রমণি, তুমি সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির লীলাময়ী ছবি। সংসার আকাশে পূর্ণ চন্দ্রিমা। সুকুমারি নারি, তুমি স্নেহের ভাণ্ডার, ভালবাসার আধার, ভক্তির আকর। বিকট শ্মশানে বিশ্ব সমাধি-কালে তুমিই অভয়া দেবী। তুমি তাপময়ী ছলনায় চির-বিরাম-দায়িনী। রমণি, তুমি ঈশ্বরের আদরের কন্যা। জগতে যাহা ছিল না, জগতে যাহা থাকিবে না, তোমাতেই তাহা দেখি। তোমারই মুখে স্বর্গীয় প্রেমের আভাস, তোমারই হৃদয়ে কি যেন কি-ময় অদ্ভুত ভাব। রমণি, তুমি এ জগৎ হইতে চলিয়া গেলে প্রেমের আধিপত্য যায়, তুমি প্রেমময়ী। কি রূপে, কি লালিত্যে, কি মধুস্বরে প্রকৃতি তোমার পরিচর্য্যায় নিয়ত ব্যাপৃতা, ভবঘোরচক্রের তুমি কেন্দ্র, তুমি অবলম্বনের আশ্রয়, তুমি মাধুর্য্যের প্রতিমা। শোকার্ত্ত পরিবারে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। ভগ্নহৃদয়ে তুমি বিচিত্র দিব্য-কুসুম। তুমি জীবন-তোষিণী, সংসারপালনী, বিঘ্নবিনাশিনী, শান্তি-বিধায়িনী। এ পরিদৃশ্যমান নর জগতে যাহা দেখি তাহাই বুঝি, জগৎ-অতীত কিছু আমার ধারণা হয় না। আমি জানি না স্বর্গ আছে কোথায়, আমি জানি না স্বর্গ দেখিতে কেমন, আমি দেখি তোমার হৃদয় স্বর্গ, আমি দেখি তোমায় হৃদয়স্বর্গে প্রেম-পারিজাত বিকশিত হইয়া বিমল সৌরভে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। এই আমার চূড়ান্ত দেখা, আর আমার কল্পনা উচ্চে উঠিতে পারে না, কল্পনা তোমারই নিকট অবধি গিয়া ফিরিয়া আইসে, তোমাকে ঠেলিয়া অধিক অগ্রসর হইতে জানে না, তোমার বিস্তৃত হৃদয়ে যে সুধাধারা অবিরাম বহিতেছে তাহাতেই আমরা জীর্ণ জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছি। রমণি, তুমি হৃদয় খুলিয়া যাহার হৃদয়ে সুধাধারা ঢালিয়াছ সে এ বিশ্বে আর কিছুই চায় না। তুমি এত গুণের আকর, তোমাকে কেবল উপভোগ্যা ক্রীতদাসী যে ভাবে তাহার হৃদয়ে হৃদয় নাই, সে হৃদয়শূন্য।

বঙ্গে ঘরে ঘরে যখন প্রতিমা পূজা হয় তখন আমি প্রতিমার রূপ দেখিতে ভালবাসি বটে, কিন্তু যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমার প্রতিমা দেখি, যখন দেখি তুমি জড়-পিণ্ড নও, তুমি প্রেম ঢালিতে পার, তুমি জীবন্ত দেবী, তখন তোমাকে দেখিতে বড় ভাল বাসি, গতিশক্তিবিহীন কেবলমাত্র কাষ্ঠ-লোষ্ট্রখণ্ড আমার প্রাণাকর্ষণ করিতে পারে না। সুন্দর দেখিতে ভাল বটে কিন্তু জড়-সৌন্দর্য্য কে চায়? আমরা জড় নহি—জড় খেলানা লইয়া খেলিতে পারি বটে কিন্তু তাহাতে প্রাণের খেলা হয় না। জড়খেলানা যত্নের সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী নহে। সুন্দর জড় খেলানা ভাঙ্গিয়া গেলে প্রাণের নিকট দিয়া শোক সরিয়া যায়, প্রাণে শোকের বাতাস লাগে মাত্র, কিন্তু এ রত্ন ভাঙ্গিয়া গেলে প্রাণে শোক মিশিয়া যায়, হৃদয়ে ক্লেশের গভীর কালিমযী রেখা পড়ে।

জগতের একটু একটু সৌন্দর্য্য লইয়া সকল সৌন্দর্য্যের সমাবায়ে আমরা মত্ত

হইয়া স্বর্গ গড়িতে যাই, সকল সৌন্দর্য্যের সমন্বয় রমণী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াও দেখিতে পাই না। অকিঞ্চিৎকর মণি মাণিক্য প্রবালাদি মহারত্ন বুঝিয়াছি, প্রেম দয়ার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই, মণিমাণিক্যাকর ধরিত্রীকে তোমরা রত্নগর্ব্ভা বলিয়া পূজা কর, আমি রমণীগর্ব্ভা বলিয়া ধরিত্রীকে পূজা করি, আমাদের আশে পাশে যে রত্ন পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, জহুরী নাই যে বাছিয়া লইবে। আমরা মহাসৌন্দর্য্যের রত্নের উপরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ করিতে করিতে ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য ভিক্ষা করিতেছি, আমরা রত্ন চিনিলাম না, রত্নের ব্যবহার শিখিলাম না, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি আমাদের স্ফূর্ত্তি পাইল না, কে বলিয়া দিবে কোন্ রত্ন বক্ষে ধারণ করিব? কুটিল পুরুষ! তুমি নিয়তই পাপচক্ষে রমণীরূপ সন্দর্শন করিতেছ, রমণীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই তোমার বড় ভাল লাগে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে তোমার দৃষ্টি নাই। তোমার দৃষ্টির স্থূলতা যায় নাই। তুমি মনুষ্য হইলেও জড়। যন্ত্রগুণে যেমন পুত্তলিকা ছুটাছুটি করে, রঙ্গ ভঙ্গি করে, তুমি তেমন রাসায়নিক ক্রিয়া বলে আহার নিদ্রায় পরিতৃপ্ত হইতে এ জগতে আসিয়াছ, মানুষের যাহা আবশ্যক সে মনুষ্যত্ব তোমাতে নাই। সৃষ্টির প্রধান সামগ্রী রমণী কেমন তাহা তোমার ধারণা হইল না। তুমি আপনি কে আত্মতত্ত্বও খুঁজিলে না। কুটিল পুরুষ! তোমার হৃদয়ে অমিত-পরাক্রম নাই, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মায়ায় তোমার দুর্ব্বল হৃদয় সদাই মুগ্ধ। দুর্ব্বল পুরুষ! তুমি শোকের ক্ষুদ্র বাত্যা সহ্য করিতে পার না, প্রবল বাত্যা সহ্য করিবে কেমন করিয়া? একটু সৌন্দর্য্যে তুমি আত্ম-হারা হইয়া গলিয়া পড়, গভীর সৌন্দর্য্যে ডুব দিবে কেমন করিয়া? তোমার হৃদয় নিকষ নহে, রমণীরত্নের দাগ তাহাতে পড়িবে না। যাঁহারা বলেন রমণী রতীর প্রতিকৃতি, তাঁহারা জননীর স্নেহ, ভগিনীর প্রেম, জায়ার ভালবাসা, নন্দিনীর সেবা কিছুই দেখেন নাই, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। স্নেহময়ী জননীর বিরাট হৃদয় হইতে যখন স্নেহধারা শত ধারে নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে অপত্যশিরে বর্ষিত হয়, তখন কি ভাবি না সে স্নেহের প্রতিদানে কোটি কোটি সৌর-জগৎ কুলায় না। যখন নিঃস্বার্থ স্নেহ জননীর হৃদয় হইতে একবেগে চিরকাল সমভাবে সন্তানের প্রাণে ছুটিতে থাকে তখন কি ভাবি না জননী দেবী ভব-সংসারে জননী বি-সদৃশ—পরমেশের পূর্ণ বাসনা? প্রেমময়ী জীবন-সহচরী যখন জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে পতিহিত-সাধনে অনাহারে অনিদ্রায় আত্মোৎসর্গ করে তখন কি ভাবিব রমণী উপভোগ্যা, পাশবৃত্তি চরিতার্থের আদর্শ? আদরিণী নন্দিনী যখন যথাবিধ

সৎকারে পিতৃপদ সেবা করেন, কুটিল পুরুষ, বলিয়া দাও তখন এ হৃদয়ে সে ভাবনা আসে কি রমণী কাম পিপাসার নীর, ভোগের বিলাসসামগ্রী? মুমূর্ষুর নিকটে বসিয়া যখন জননী হৃদয়-বিদারক তাপে দ্রবীভূত হইয়া প্রাণের এক এক অংশ এক এক সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বাহির করিয়া বিশ্ব আঁধার দেখিয়া মুমূর্ষু পুত্রের মলিন মুখ শেষ সন্দর্শন করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়েন, তখন কোন্ নরাধম বলিবে জননী দেবী নহে? পুত্রের হাসিমুখ দেখিলে যখন জননীর প্রাণ হাসিয়া উঠে তখন ভাবিব কি জননীর স্নেহ স্বার্থপরতার অঙ্গ? নারীনিন্দুক! যখন তুমি ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিলে তখন কি আত্মতৃপ্তির কোন উপায় জানিতে? বল দেখি, জননী অভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিতে কি? রমণীর মধ্যে একজন এক সময়ে আপন হৃদয়ের রস পান করাইয়া রক্ষা করিয়াছিল তাই আজ যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছ রমণী আরাধ্য কিসের? আজ সে দিন নাই, সে সময় নাই বলিয়া বাধ্যতাও কি আবশ্যক নাই? তুমি জননীর কোন উপকার করিতে পার না, না করিতে চাও না? গর্ব্ভাবস্থায়, জন্মাবস্থায়, পালনাবস্থায় পদে পদে জননীর হৃদয়ে কি শোচনীয় যাতনাই না দিয়াছ! এত উপদ্রবেও কি পাপমুখে একবার স্নেহময়ী জননী উচ্চারণ করিয়া জননী শব্দের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রাণ সঙ্কুচিত হয়? মূর্খ, তুমি স্বার্থপরতাও শিক্ষা করিতে পার নাই। এত স্বার্থেও প্রতিদান জান না। স্বার্থসাধনের প্রতিদানের জন্যও যদি জননীকে ভক্তি কর তাহা হইলেও অমন ভক্তি আর জগতে কুত্রাপি ন্যস্ত করিতে পার না। নারীনিন্দুক! তুমি ত পরার্থপরতা জানই না, স্বার্থপরতাও জান না, তুমি জান কেবল জড়তা।

রমণীহৃদয়ে গুণও আছে দোষও আছে, বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে দোষ দেখিতে হইবে না। জীবননাশক মহাবিষ যখন ব্যবহারযোগে জীবন রক্ষা করে তখন মধু ব্যবহার যোগে তীব্রতাশূন্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? শিক্ষামন্দিরে রমণীজাতিকে প্রবেশ করিতে দাও, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির পরিণতি হউক; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি পরিণত হইলে পাপবৃত্তি সংযত হইবে, বৃত্তি পরস্পরে অসামঞ্জস্য থাকিবে না। যে মহিলা শিক্ষা পাইয়াও বৃত্তির সামঞ্জস্য করিতে পারে না তাহার শিক্ষা মৌখিক শিক্ষা, সে শিক্ষা আন্তরিক নহে। যে শিক্ষায় নৈতিক জ্ঞান নাই, যে শিক্ষায় কর্ত্তব্য পালন ধারণা হয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। গ্রন্থাবলী গতিশক্তিবিশিষ্ট নয়, নারীতে বিন্যস্ত হইয়া গ্রন্থাবলী ভিন্নাকারে গ্রন্থাবলীই রহিয়া যায়। গ্রন্থাবলী পাঠে যে জ্ঞান পায় না সে গ্রন্থপাঠে পাইল কি, তাহার শিক্ষা বিড়ম্বনা নহে ত কি? শিক্ষিত অধার্ম্মিক গ্রন্থের জড়ত্বই

শিক্ষা করে আর কিছু শিক্ষা করিতে পারে না; শিক্ষিত অধার্ম্মিক কি মূর্খ যখন অননুষ্ঠেয় কর্ম্মানুষ্ঠান করে তখন তাহার জন্য অনুতাপ নিষ্ফল, তাহার মনুষ্যত্ব পাপাচরণে আচরিত হইয়া, তাহার এক রকম জড়ত্ব উপস্থিত হয়। যদি তাহাকে বিশেষ নিন্দা করিতে যাও মাটিতে পড়িয়া গেলে ধরিত্রীকেও পদাঘাত করিও। যাহার মনুষ্যত্ব নাই তাহার অমানুষিক ব্যবহারে সন্তাপ কেন, তাহার মনুষ্যত্ব অভাবের জন্য বরং পরিতাপ কর, তাহার অভদ্র-জনোচিত ব্যবহারে ব্যথিত হইও না। আর এক কথা—রমণীহৃদয়ে নাই কি, রমণীহৃদয়ে প্রেম আছে প্রতারণা আছে, যত্ন আছে তাড়না আছে, সহানুভূতি আছে পরশ্রীকাতরতা আছে, ভাব আছে মায়া আছে, রমণীহৃদয় দুস্তর সাগর। সাগরে নানা অমূল্য রত্ন আছে, নানা ভয়াল জলচর আছে, রমণীহৃদয়ে নানা আশ্রয় আছে, নানা দুরন্ত রিপু আছে। এ সংসারে শোক দুঃখ পাপ নাহি কোথায়? দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকে না। সংসার বিড়ম্বনাময়!

রমণীহৃদয় বড়ই উর্ব্বর! রমণীহৃদয়ে শুভ বীজ নিহিত হইলে সুফল প্রদান করে, অশুভ বীজ নিহিত হইলে অশুভ ফল প্রদান করে। এ অদ্ভুত সংযোগ! এ যেন একদিকে স্বচ্ছ নীলাকাশে হীরক খণ্ড তুল্য অগণ্য তারারাজি পরিবেষ্টিত শরতের কলাধর, অন্যদিক গভীর অন্ধকারময় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। এ যেন এক দিকে বিস্তৃত সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা সূর্য্যকরে প্রতিবিম্বিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে, অন্য দিকে উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবল ঝটিকায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে অন্ধকারগর্ভ বিদার করিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়াছে। এযেন নির্জ্জন কাননের একদিকে লক্ষ্মীরূপা মহাদেবী অভয়া অন্য দিকে বিপরীত-ভূষা দিগম্বরী ভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা, এ যেন প্রমোদ উদ্যানের একদিকে কুসুমবৃষ্টি অন্যদিকে অগ্নিবৃষ্টি। এ সংযোগ বিচিত্র! এ সংযোগ ভয়ঙ্কর!

নারীচরিত্র পাঠ করিতে বিশেষ সময় লাগে, সংসারাশ্রমে থাকিতে গেলেই নারীচরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য মধ্যে কর্ত্তব্য। যাহাদের সমভিব্যাহারে এ জীবন কাটাইতে হয় তাহাদের চিনিতে না পারিলে অনেক দুঃসহ যন্ত্রণাভোগে হৃদয় ছারখার হইয়া যায়, উঠিতে বসিতে শয়নে যে রমণী সহায় তাহাকে না চিনিয়া তাহার সহবাস করা শোচনীয় বিড়ম্বনা। নারীচরিত্র না বুঝিয়া যে নারীকে হৃদয়ার্পণ করে সে অন্ধকারগর্ভে ডুব দেয়, যে রমণীর গুণের তত্ত্ব না লইয়া কেবল রূপে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপন অদৃষ্টকে চরিতার্থ জ্ঞান করে সে বিপদসাগরে স্বেচ্ছায় গা ভাসাইয়া দেয়, তাহার অদৃষ্ট কখন সুখ কখন দুঃখ। নারীচরিত্র পাঠ সামান্য ব্যাপার নহে, মানবপ্রকৃতি পাঠে জ্ঞান জন্মিলে নারী প্রকৃতিতে

জ্ঞান জন্মিবার সুবিধা হয়, দীর্ঘকাল নারীসহবাসে নারীচরিত্র উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা কেবল আপেক্ষিক ভাব। কি দ্বীপে, কি কাননে, কি আশ্রমে, যাহারা নারীর সহিত দিন কাটাইতে পারে তাহারাই নারীচরিত্র বুঝিতে পারিবে, অপরাপরে নারীচরিত্রের দোষ গুণ কি বুঝিবে? যাহার সহিত বাস করিতে হইবে তাহার চরিত্র জানিলে আমার সাংসারিক ঘটনার অনেক কল্যাণ হয় বটে, কিন্তু নারী জাতির চরিত্র বুঝিতে পারিলে সামাজিক ঘটনার অনেক কল্যাণ হয়। স্বার্থপরতায় বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়াছ বলিয়া আমার আমার করিয়া জীবনান্ত করিও না, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গলদেশ হইতে ভীষণ আত্মম্ভরিতার শৃঙ্খল নামাইয়া ফেল, হৃদয় প্রশস্ত করিয়া দাও, দেশের মঙ্গলে কৃতসংকল্প হও। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া যে এ ধরাধামে আসিয়াছ, আসিয়াই কি মিলাইয়া যাইবে? দুই দিনের জন্য আসিয়াছ বলিয়া কি দুই দিনের খেলা খেলিয়া যাইবে? দুই দিনে কি দীর্ঘকালের খেলা হয় না? বিশ্বহৃদয়ে অসীম অমর কীর্ত্তিবীজ রোপণ কর, তোমার অবর্ত্তমানে তোমার রোপিত কীর্ত্তিবীজ ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া, ভবিষ্যতে কত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কোটি কোটি সংসার-যোদ্ধাকে শীতল ছায়া প্রদান করিবে।

নারীহৃদয়ে যেমন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই তেমন আবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে, মনোমত পতি পাইলে নারী আমরণ সুখে থাকে, কিন্তু নারীর ভোগ-কামনা কখন পরিতৃপ্ত হয় না। নারী যেমন সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবে কেহ আর সৌন্দর্য্য অমন বাছিয়া লইতে পারিবে না। নারীহৃদয়ে যে অমূল্য অলঙ্কার আছে তাহারই প্রভায় পুরুষ হৃদয়ের রাশি রাশি অন্ধকার নাশ হইয়া যাইতেছে। আঁধার হৃদয়ে আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। যে বাহ্যিক অলঙ্কারে নারীকে বিভূষিতা করিতে চাহে সে মূর্খ। যে সরোবরের বিকচ নলিনীতে মণিমাণিক্য লাগাইতে চাহে, যে শিখি-রাজকে সুভূষণে ভূষিত করিতে চাহে, যে যৌবনচক্ষে চসমা লাগাইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে চাহে সে অধম নহে ত কি? মাধুর্য্যই যাহার অলঙ্কার, ব্রীড়াই যাহার পরিধেয় বসন, তুচ্ছ স্বর্ণালঙ্কার তাহার উপযুক্ত নহে। যে আশ্রমনিবাসিনী শকুন্তলার ছবি দেখিয়াছে, যে হরপার্শ্বে সতীর ভোগ-রাগবিরহিতা সুন্দর মূর্ত্তির ছবি দেখিয়াছে সে স্বর্ণালঙ্কারের গুরুভারে আক্রান্ত বঙ্গবামাকে দেখতে চাহিবে না। সুন্দরী বঙ্গবামা অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া যদি তোমার সম্মুখে দাঁড়ায় তুমি কি নির্নিমেষ নয়নে তাহার মধুময়ী কান্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হও না?

আজ বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীজাতি

সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতেছি না, আমি সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের বামাজাতির স্তাবকতা করিতে চাহি না। যে দেশের রমণীর গুণ দেখিব সেই দেশের রমণীরই পূজা করিব। আপনি শক্তি ভারতবর্ষে ললনা-জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ভাবিয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কীর্ণ পরিধি আরো অধিকতর সঙ্কুচিত করিতে চাহি না, দেশ বিশেষে বিশেষ বিশেষ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সমাজের রমণী এক সমাজের নিন্দনীয়া তাহা আমি জানি কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও এক সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠানের শিরে পাদচারণ করিয়া, এক সমাজের ধারা শুভধারা বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহি না। অপরাপর দেশের জন্য ভাবিবার আবশ্যক নাই, অপরাপর দেশে পুরুষ আছে, অপরাপর দেশে রমণী পদদলিতা হয় না। বঙ্গসমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এ সমাজে পুরুষ নাই, এ সমাজের সর্ব্বত্রই কালপুরুষ বিদ্যমান। বঙ্গদেশের যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, বঙ্গভূমির যদি হৃদয় থাকিত, ঘরে ঘরে অবলা বালাদের এ ভয়ানক যন্ত্রণাও লাঞ্ছনা দেখিয়া বঙ্গভূমি আত্মহত্যা করিত। অথবা কে বলিতে পারে, আমাদের সমাজের রমণীজাতির দুর্গতির উপক্রমণিকা দেখিয়া বঙ্গভূমি জীবন হারাইয়া কেবল মাটিতে পরিণত হইয়া বসিয়া আছে। হয়ত এ ভারতে পূর্ব্বে দেবদেবীগণ আসিয়া বিচরণ করিতেন, বঙ্গবামার দুর্গতি দেখিয়া তাঁহারাও নিথর পাষাণ হইয়া গিয়াছেন। কত অত্যাচার, কত সদাচার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পর আসিল চলিল, বঙ্গবামার দুর্ভাগ্য ঘুচিল না। আহা! বঙ্গবামার জীবন ধারাবাহিক দাসত্বের সংঘটনা। অশ্রুরাশি সম্মিলিত হইয়া যেন এদেশে রমণীরূপ ধারণ করিয়াছে! আহা! অনুতাপের আধার, শোকের সহচরী বঙ্গবামা কাঁদিবার জন্যই যেন এ ধরাধামে আসিয়াছে! আহা অশিক্ষিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধা বঙ্গবামা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাইবার পথ পাইতেছে না। আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে বিধবাললনার, কুলীন কন্যার হৃদয়বিদারক সকরুণ বিলাপধ্বনি উঠিতেছে, কাহারও চৈতন্য নাই, শোক অবমানিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িতেছে, আর সাড়া দিতেছে না। জগতে যত রকম সমাজশাসন, শাস্ত্রপীড়ন আছে সকলই কি বঙ্গবামার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে?

বঙ্গঘরে প্রসূতী কন্যা প্রসব করিলে মহাপাতকিনীপদে অধিষ্ঠিত হন। জানি না কন্যা অভাবে ভবিষ্যতে সমাজরক্ষা হইবে কিসে! বঙ্গসমাজে কন্যার উপরে সকলেই বীতরাগ, কেহই কন্যার মুখ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন না। অপ্রিয় যাতনা মূর্ত্তিমতী হইয়া বঙ্গঘরে কন্যারূপ ধারণ করিয়াছে। বঙ্গঘরে

জনক মহা অপ্রিয় ধন দেখিতেছি ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইয়া শঙ্কিত মনে কন্যার মুখ পরিদর্শন করেন। যে সমাজে শিশু কন্যার প্রতি এত অনাদর, বালবিধবার প্রতি ঘোর লাঞ্ছনা, কঠোর যাতনা ব্যবস্থা, কুলীনবালাবৃন্দের নিদারুণ নিগ্রহ সে সমাজের উন্নতি কোথায়? যে সমাজে স্ত্রীজাতি পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে পায় না, পরকুৎসাচর্চ্চাব্রতধারিণী প্রৌঢ়াদের সহবাসে তাহাদের কুটিল স্বভাব অনুকরণ করে, সে সমাজে এ অবস্থায় নারীজাতির দুর্গতি কখনও যে ঘুচিবে তাহা ভাবিতেও ভরসা হয় না। বঙ্গসমাজে স্ত্রীজাতি যেন গচ্ছিত সম্পত্তি, যেখানে রাখিবে সেইখানেই থাকিবে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সাধারণের রাজ্যে এ পক্ষপাত কেন? তুমি স্ত্রীজাতির অপেক্ষা শারীরিক বলে বলীয়ান বলিয়াই কি পাপ ব্যবস্থা করিয়াছ? বঙ্গীয় পুরুষ, তোমার ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, হৃদয় নাই। স্বাধীনতাই অধীনতা তাহা জানি কিন্তু জড়তা স্বাধীনতা নয় তাহাও জানি। স্ত্রীজাতি পুরুষের সম যোগিনী নহে তাহাও জানি কিন্তু সমযোগিনী হইতে দাও না তাহাও জানি, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলেই যে যথেচ্ছাচার দেওয়া হয় তাহা জানি না, স্ত্রীজাতির উপযোগি যাহা তাহাই স্ত্রীজাতিকে দাও, স্ত্রীজাতির উপযোগী যাহা তাহা অর্পণ করা ত দূরের কথা; স্ত্রীজাতির উপযোগী যাহা আছে তাহাই কাড়িয়ালইতেছ। বঙ্গীয় পুরুষ তোমাদের দয়া নাই, জ্ঞান নাই, তোমরা জ্ঞানের কার্য্য কর, জড়পুঞ্জ জলদ রাশি বারিবর্ষণ করিয়া পাষাণ হৃদয় অভিষিক্ত করিতেছে আর বঙ্গবামার অশ্রুরাশি কি তোমাদের কঠিন হৃদয় অভিষিক্ত করিতে পারিল না। হা বৈচিত্রময়ি প্রকৃতি! তুমিও কিরূপে বিমুখ, ফিরিয়া চাহিতেছ না।

যেদেশে রমণীচক্ষে জল শুকায়না সে দেশে পুরুষ চক্ষেও জল শুকায় না; যে দেশের রমণীহৃদয় অপ্রসন্ন সে দেশের ভাগ্যও অপ্রসন্ন। এই সমাজে এমন স্ত্রীজাতি হইতে কেমন সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না; এই সমাজ লইয়া এমন নারী লইয়া আমরা আবার স্পর্দ্ধা করি আমাদের ভবিষ্যতের গর্ভ সুখময়! জানিনা আরও কতকালে এ সমাজে স্ত্রীজাতি দগ্ধ হইবে! জানি না এ পাপ সমাজে কবে পুণ্যের প্রভা বিরাজ করিবে! জানিনা কবে বঙ্গীয়া মহিলারা আর্য্য মহিলাগণের পূর্ব্বযশ বৃদ্ধিকরিবে! এদিন কি আসিবে? বঙ্গসমাজের কি ঘোর দুঃখবিভাবরীর অন্ত আছে, আবার সুখ সূর্য্য সমুদিত হইবে? *

শ্রী নরেন্দ্র নাথ বসু।

* আহীরীটোলা উন্নতি বিধায়িনী সভার দ্বাত্রিংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

শাস্ত্রতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের বিষ্ণুপুরাণের প্রদর্শিত বচন গুলি শাস্ত্রবিদ্বেষী লোকদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। যদি বেদপাঠে রুচি হইবে, ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তবে বেদব্যাস এরূপ শাস্ত্র রচনা করিলেন কেন? আর শাস্ত্র বিদ্বেষীরা মনে মনেও জানিতে পারিয়াছেন, স্ব স্ব প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, বেদব্যাসের বচন গুলি কখনই যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যদি কলিকালে বেদব্যাসের কথার অপহ্নব হয়, তবে শাস্ত্র মানিবে কেন? তবে শাস্ত্রের এত মহিমা কেন? আমরা দুই বেলা শাস্ত্রোক্ত অবৈধকার্য্যের, এবং ব্যাসোক্ত কলি মাহাত্ম্যের পাণ্ডা হইয়া কি করিয়া মুখ দিয়া বলিব যে, শাস্ত্র মানিব না? শ্বশুরের কথায় পিতাকে পদাঘাত করিয়া কোন লজ্জায় বলিব যে, "শ্বশ্রূ শ্বশুর-ভূয়িষ্ঠা গুরবঃ" ব্যাসের এ কথা অসার, ব্যাসের এ কথা অলীক। অনুভব করিয়া অনুভূত পদার্থের অপহ্নব করা কদাচ মানব জন্মের কার্য্য নহে।

আমরা মুক্তকণ্ঠে চিরকাল স্বীকার করিব, সময় পাইলে বলিতে ছাড়িব না; দোষ দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অকলঙ্কিত করাই শাস্ত্র চর্চ্চার উদ্দেশ্য। আমরা যে শাস্ত্র বুঝি না, তাহার জন্য উদাহরণ দেখান অকর্ত্তব্য। কারণ, সপ্ততারা বা সপ্তর্ষিগণ যে মঘা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিলে, ও অকৃত্রিম ক্ষত্রিয়বংশ জাত মহারাজ নন্দরাজ সবংশে উৎসন্ন হইলে কলিকালের বৃদ্ধি অনুভূত হইয়া থাকে। এ স্থানে আলোচ্য এই—মঘা নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিতে সপ্তর্ষি বা সপ্ততারাদের সহস্র বৎসর লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে গমন করিতে সপ্তর্ষিদের একশত বৎসর লাগিয়া থাকে। আর যখন সপ্তর্ষি মণ্ডলী মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, তখন কুরুপাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল। এ কথাও পণ্ডিত প্রবর কহ্লণ "রাজতরঙ্গিণী" অথবা কাশ্মীর দেশীয় রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক শতাব্দীতে সপ্তর্ষিদিগের অপর নক্ষত্রে গমনের কথা, অথবা এরূপ অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরিচয়ের কথা, কৈ আর কিছুতেই দেখা যায় না, আর কুত্রাপি এরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। শাস্ত্র না থাকিলে আমাদের এরূপ বিষম সমস্যার স্থলে যে কিরূপ উপায় হইত, তাহা কিছুতেই স্থির করা যায় না, স্থির করিবার ক্ষমতাও কাহার দেখি না।

"তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটীচ রোমাণি ব্যবহারিকে।
সপ্ত লক্ষাণি কেশাঃ স্যু র্নখাঃ প্রোক্তাস্তু বিংশতিঃ॥" (গরুড়পুরাণ) (১৫।৪৭।)

মনুষ্যের দুই প্রকার রূপ, ব্যবহারিক পারমার্থিক। ব্যাবহারিক অবস্থায় মনুষ্য-শরীরে সাড়ে তিন কোটি রোম, ও সাত লক্ষ কেশ এবং কুড়িটী নখ থাকে। রোম আর কেশে যে প্রভেদ আছে, তাহা এই বচনে দেখান হইয়াছে। সাড়ে তিন কোটি রোম না গণনা করিলে সত্য বাহির হইবে না, অথচ কোন মনুষ্য দ্বারা একটী, দুইটি, তিনটি করিয়া সাড়ে তিন কোটি রোম গণিত হইবে না। সুতরাং হিন্দু শাস্ত্র অসার অগ্রাহ্য। কিন্তু কত পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে যে ঋষিরা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হইবারও ক্ষমতা কাহার দেখা যায় না।

"ষষ্ঠ্যুত্তরঞ্চ ত্রিশতমস্থাং দেহে প্রকীর্ত্তিতম্।" ১৫০।

দেহে সর্ব্বশুদ্ধ তিনশত ষট অস্থি আছে। (গরুড়পুরাণ)

"নাড্যঃ স্থূলাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ কোটিশঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" ১৫১।

শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ কোটি কোটি নাড়ী আছে। (গরুড়-পুরাণ)

তবে যাঁহারা অধুনা ডাক্তারী শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিয়াছেন, শরীর তত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা হয় এই মতের সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিবেন, নয় ঋষিদের সূক্ষ্মতার দিকে অগ্রসর না হইয়া কাযেই ঋষি বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন। তাঁহাদের মতে যে পদার্থ অস্থি পদবাচ্য, আধুনিকদের মতে রুচিভেদে, বুদ্ধিভেদে, বিদ্যাভেদে, শাস্ত্রভেদে, অবশ্য তাহার ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতকাল পূর্ব্বে, বনের মধ্যে ঋষিগণ ফলমূলাশন করিয়া যোগশক্তি বা সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি দ্বারা যে নূতন পদার্থ ও গভীর তত্ত্বের তত্ত্বাবিষ্কার করিয়া ভ্রান্তগণের সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, তাহার প্রতি কয় জনের লক্ষ্য আছে? অথবা লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা আছে বল?

"চতুষ্কিষ্কুশ্চতুর্দ্রংষ্ট্রঃ শুক্লকৃষ্ণস্তথৈবচ।
চতুর্গন্ধশ্চতুর্হ্রস্বঃ সূক্ষ্মদীর্ঘশ্চপঞ্চসু॥"২৪২।৫ (অগ্নিপুরাণ।)

কিরূপে শুভ লক্ষণ থাকিলে পুরুষ সুখী হয়, বেদব্যাস তাহা দেখাইবার জন্য কতকগুলিন চিহ্ন উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে আমিও সামান্য গুটিকতমাত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ১ম চতুষ্কিষ্কু, ২য় চতুর্দ্রংষ্ট্র, ৩য় শুক্ল কৃষ্ণ, ৪র্থ চতুর্গন্ধ, ৫ম চতুর্হ্রস্ব, ৬ষ্ঠ পাঁচটী স্থানে সূক্ষ্ম দীর্ঘ।

"ষণ্ণবত্যঙ্গুলোৎসেধশ্চতুষ্কিষ্কু-প্রমাণতঃ।" ২৪২।১৪।

যাহার দেহের দৈর্ঘ্য ছিয়ানব্বই অঙ্গুলি উন্নত হয়, তাহার শুভ চিহ্ন। প্রত্যেক চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক কিষ্কু হয়।

"দংষ্ট্রাশ্চতস্রশ্চন্দ্রাভাশ্চতুঃ কৃষ্ণং
বদামিতে।
নেত্রতারৌ ভ্রুবৌশ্মশ্রুঃ কৃষ্ণাঃ
কেশাস্তথৈবচ ॥"২৪২।১৫।
অগ্নিপুরাণ।

প্রথম চারিটী দন্ত অত্যন্ত শুক্ল হইলে চতুর্দ্দংষ্ট্র বা চতুঃ শুক্ল। চক্ষের তারা, ভ্রূ শ্মশ্রু (দাড়ি) আর কেশ অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ হইলে চতুষ্কৃষ্ণ। এই দুইটিই পুরুষের সুচিহ্ন।

"নাসায়াং বদনে স্বেদে কক্ষয়ো র্বিড়
গন্ধকঃ।
হ্রস্বং লিঙ্গং তথা গ্রীবা জঙ্ঘেস্যাদবেদ-
হ্রস্বকম্ ॥ ১৬।
সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্ব্বাণি নখকেশদ্বিজত্বচঃ।
হনূনেত্রে ললাটেচ নাসা দীর্ঘা
স্তনান্তরম্ ॥ ১৭।"
(অগ্নিপুরাণ। ২৪৬। অধ্যায়)

নাসিকা, মুখ, ঘর্ম্ম ও কক্ষদ্বয়ে গন্ধ হইলে চতুর্গন্ধ, লিঙ্গ, গ্রীবা ও দুইটী জঙ্ঘা হ্রস্ব হইলে চতুর্হ্রস্ব, অঙ্গুলির পর্ব্ব সকল সূক্ষ্ম, নখ, কেশ, দন্ত ও গাত্রীয় চর্ম্ম সূক্ষ্ম হইলে পঞ্চ হ্রস্ব, এবং হনু, নেত্র, ললাট, নাসিকা ও স্তনমধ্য দীর্ঘ হইলে পঞ্চদীর্ঘ হয়। এই সকল চিহ্ন বিশেষ দ্বারা পুরুষের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। এই সকল উক্ত চিহ্নের মধ্যে অবশ্য সমুদয় না হউক, দুই একটী সুচিহ্ন কোন না কোন পুরুষের অবশ্য আছে দেখা গিয়া থাকে। সুচিহ্ন থাকিলে সুফলও তাঁহার কিছু না কিছু ফলিয়া থাকে। তবে যিনি আমার সুচিহ্ন থাকাতে শুভফল দেখিয়াও মানিবেন না তাঁহাকে আর আমরা কি বলিব। কিন্তু শরীরের সহিত সুচিহ্নের শুভফলের যেরূপ কেন সম্বন্ধ হউক না, আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে কতদূর সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের এই সকল সামান্য কথায় জানিতে পারা যায়। এখন তাঁহাদেরও বিড়ম্বনা সার হইয়াছে মাত্র। পিতার ধর্ম্মের, কার্য্যের সহিত পুত্রের যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহাতেই পিতৃগুণরাশি যে পুত্রে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের জানা ছিল। তাহাতেই পুত্রগণ পিতার শুভাশুভ চিহ্নের শুভাশুভ ফল পাইয়া থাকে।

এক উপনিষদে আছে—

"পুরুষে হবা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি
যদেতদ্রেত ইতি।"

এই উপনিষদের ভাষ্যে আছে—

"যোঽয়ং শরীরং জিঘৃক্ষু র্জীবাত্মা সোঽয়ং পুরুষে পিতৃশরীরে প্রথমতঃ গর্ভো ভবতি। ন চাত্র স্ত্রীগর্ভবদুদরবৃদ্ধ্যা সোঽভিব্যজ্যতে। কিন্তু যদেতৎ পিতৃশরীরে সপ্তমধাতুরূপং রেতঃ অস্তি তদেব গর্ভ ইত্যুচ্যতে।"

এই যে শরীর গ্রহণেচ্ছু জীবাত্মা আছেন, তিনিই পুরুষে অর্থাৎ পিতৃশরীরে প্রথমতঃ গর্ভ হয়েন। কিন্তু স্ত্রীলোকের গর্ভের মতন উদরবৃদ্ধি দ্বারা এ গর্ভের প্রকাশ হয় না। তবে পিতৃশরীরে যে সপ্তম ধাতু স্বরূপ রেত আছে, তাহাই গর্ভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পুরুষশরীরস্থিত রেতোরূপ আত্মা স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট হইলেই পুত্র হয়। তবে পিতার সমুদয় গুণাগুণ, শুভাশুভ পুত্রের হইবে না কেন? অথচ পিতার বা পিতামহের রোগ পুত্রে সংক্রান্ত হইয়া থাকে, একথা আমাদের দেশীয় মূর্খেরাও বলিয়া থাকে। তাহার মধ্যে যে এই সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম, বা বৈজ্ঞানিক লীলা রহিয়াছে, তাহা অনেকের মস্তিষ্কে আসে নাই।

অন্য উপনিষদে আছে—

"এষবৈ পুত্র আত্মা"

এই পুত্রই পিতার আত্মা স্বরূপ।

অপর স্থানে আছে—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্র নামাসি সজীবঃ শরদঃ
শতম্ ॥"

তুমি উভয়ের অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ আত্মা তুমিই পুত্র নামে কথিত হইয়াছ। অতএব তুমি শতবৎসর বাঁচিয়া থাক। তবে কেন পুত্র পিতার শুভাশুভ ফলভাগী হইবে না। তবেসুচিহ্ন ধারণে শুভফল দেখিয়াও কেন যে তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

"অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্র
বচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পংক্তি-
পাবনাঃ ॥" । মনু। ৩।১৮৪।

চারিবেদ এবং বেদের ছয়টি অঙ্গ যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাহার দশ-পুরুষের মধ্যে বেদ অধ্যয়নের বিচ্ছেদ হয় নাই, তাহাদিগকে পংক্তিপাবন; বা তাহাদিগকে লইয়া একপংক্তিতে বসিয়া ভোজন করা যাইতে পারে।

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নি স্ত্রিসুপর্ণঃ
ষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রাহ্ম্যদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ
এবচ ॥" ঐ ।৩। ১৮৫।

যাজ্ঞিকদের বেদভাগ ও যাজ্ঞিকদের ব্রতকে ত্রিণাচিকেত বলে। যে পুরুষ উহাতে লিপ্ত থাকেন, তাহাকেও ত্রিণাচিকেতা বলা যায়। পঞ্চাগ্নিশব্দের অর্থ অগ্নিহোত্র যাগকারী ব্রাহ্মণ।

"পবনঃ পাবনস্ত্রেতা যস্য পঞ্চাগ্নয়ো গৃহে।
সায়ং প্রাতঃ প্রদীপ্যন্তে সবিপ্রঃ
পংক্তিপাবনঃ ॥"—(হারীত)

পবন শব্দে আবসথ্য অগ্নি, পাবন শব্দে সভ্য অগ্নি, অর্থাৎ শীত অপনয়ন করিবার জন্য বহু দেশে যে অগ্নির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর ত্রেতা অগ্নি, এই তিন প্রকার পঞ্চাগ্নি যাহার গৃহে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রদীপ্ত হয়, তাহার নাম পংক্তিপাবন। ত্রিসুপর্ণ শব্দের অর্থ ঋগ্বেদিদিগের বেদভাগ, ও তাহাদের ব্রত, যে পুরুষ ঐ বেদভাগের এবং ঐ ব্রতের আচরণ করেন তাহার নাম ত্রিসুপর্ণ। শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ

প্রভৃতি বেদের ষড়ঙ্গ যিনি ব্যাখ্যা করেন, তাহার নাম ষড়ঙ্গবিৎ। আর "সর্ব্ব-প্রবচনেষু চ,, এই উক্ত বচনে ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করেন তাহার কথা বলা হইয়াছে। এখানে যিনি ষড়ঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম মতে যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, তাহার পুত্রের নাম ব্রাহ্ম্য দেয়াত্মসন্তান। আর আরণ্যক উপনিষদে যে জ্যেষ্ঠ সাম বেদ আছে, যে ব্যক্তি ঐ জ্যেষ্ঠ সাম গান করিয়া থাকেন, এই ছয় জনের নাম পংক্তি পাবন ব্রাহ্মণ।

"বেদার্থবিৎ প্রবক্তাচ ব্রহ্মচারী
সহস্রদঃ।
শতায়ুশ্চৈব বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পংক্তি-
পাবনাঃ॥,,। মনু।৩।১৮৬।

যে ব্যক্তি বেদ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু গুরুর উপদেশে সমুদয় বেদার্থ অবগত হইয়াছেন। যিনি বেদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, যিনি ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ প্রথম আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সহস্রদ, এই স্থানে বিশেষ্য না থাকিলেও "গাবো হ বৈ যজ্ঞস্য মাতরঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যিনি গো সহস্রদান অথবা বহুদান করিতে সক্ষম। আর শতবর্ষ পর্য্যন্ত যাঁহার জীবিতকাল, এই সকল ব্রাহ্মণের নাম পংক্তিপাবন।

মনুর এই সকলগুলি বচন দেখিলে সত্যই পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে নিমন্ত্রণ করিবার ব্রাহ্মণ মিলেনা। আমরা বলি কলিকালে যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, এবং তদুপলক্ষে যে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, উভয়ই সমান। প্রথমতঃ কাহার কুলশীল না জানা থাকিলে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা অবিধি। হয়ত একজনের এমন কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধি থাকিতে পারে, হয়ত একজন গুরুদারাপহারী ও তস্কর, ও গোব্রহ্ম ঘাতী পংক্তির মধ্যে থাকিতেপারে, তাহার শারীরিক বৈদ্যুতিক উত্তাপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গাত্রে আসিলে কুষ্ঠব্যাধি হইতে পারে তাহার মতন কুপ্রবৃত্তিসকল, অথবা গোব্রহ্মবধ করিবার প্রবৃত্তি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে পংক্তিতে বসিয়া আহার করা অকর্ত্তব্য।

মনুর মতে সকলকার্য্যে কুশাসনে বসিয়া জপ তপ করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও অত্যন্ত বিজ্ঞান পূর্ণ। অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা কুশের পিত্ত দমন, শ্লেষ্মানাশ প্রভৃতি কয়টি উৎকৃষ্ট গুণআছে। ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৈদ্যগ্রন্থে কুশের গুণ সকল পরীক্ষিত হইয়াছে। ঋষিরা অনেক জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মকার্য্যের আরম্ভে চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত কুশাসন ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুদ্ধ আসন নয়, অধ্যয়ন, স্নান, পূজা, ভোজন, শয়ন, প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমুদয় সুব্যবস্থা দ্বারা ভারতীয় মানবদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন।

যে পিতার ঔরসে ও যে মাতার গর্ভে জন্মিয়া যে দিন ভূমিষ্ঠ হওয়া যাইবে, তাহার পরদিন হইতে বর্ণ বিভাগে জাত

কর্ম্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার, অনন্তর বেদপাঠ হইতে গৃহস্থাশ্রম প্রবিষ্ট সমস্ত কার্য্যকলাপ, যুবাকালে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, তিথি নক্ষত্র বিশেষেও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া তাহাতে পুত্র উৎপাদন করা, অশন, বসন, ভোজন, শয়ন, আসন, ভ্রমণ, অধিক কি প্রতিপদক্ষেপে ঈশ্বর লগ্নচিত্ত হইয়া বর্ণ ও আশ্রম সমুচিত কার্য্যসকল, শেষকথা সংসার সম্বন্ধীয় যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই শাস্ত্রসঙ্গত। এমন মধুর শাস্ত্রের দোষ উদ্ভাবন করিয়া পশু প্রবৃত্তির পরিচয় দেওয়া যে কতদূর মূর্খতার কর্ম্ম, তাহা বলাও অশাস্ত্র।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা আনুপূর্ব্বিক শাস্ত্রীয় নিয়মাচার ব্যবহারাদি সকল না দেখিলেও, সম্পূর্ণভাবে পূর্ণমনোরথ না হইলেও যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শাস্ত্রের উপকারিতা, উপযোগিতা, বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ছায়া দেখিতে পান, তাহা হইলেই আমার প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য সফল হয়, আমিও স্বয়ং আশাতীত আনন্দাতিশয় অনুভবকরি। তবে বর্ণাশ্রম বিভাগে দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য ও স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, ভোজন, শয়ন, ও বিবাহাদির বিষয় বিশদরূপে বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগ বাহির করিবার চেষ্টা করিব। আমি একাকী নয়, এবং আমার শুদ্ধ অল্প জীবনেও সম্ভাবনা নয় যে, শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের কণামাত্র সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।

কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রারির গত বার্ষিক অধিবেশনে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার উপরি উক্ত শীর্ষক ১টী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ নবজীবনে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে উহা আলোচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। অক্ষয় বাবু বহু বাগাড়ম্বর সহকারে প্রবন্ধটী শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করেন, শ্রোতাদিগের মধ্যে কয়েকজন কৃতবিদ্য ও গণ্য লোকে মতে মত দিয়াছেন। আমি এই প্রবন্ধ ও অক্ষয় বাবুর পৃষ্ঠপোষক দিগের বক্তৃতা পাঠ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি।

মাননীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার পুস্তক প্রচারিত হইবার পর হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়

মধ্যে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য পক্ষে কাহারও যে সংশয় বিদ্যমান আছে ইহা আমি জানিতাম না। কয়েক বৎসর গত হইল আমি "হিন্দু বিবাহ সমালোচন" নামক একখানি গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রচার করি, ইহার এক পরিচ্ছেদে বিধবা বিবাহ আলোচিত হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে বিধবার পুনরায় বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত এবং সামাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ঐ পুস্তক যখন প্রকাশিত হয় তখন সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা উহা সমালোচনা করিয়া পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। সাধারণী সম্পাদক অক্ষয় বাবুও আমার প্রথম খণ্ড সমালোচনা করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়খণ্ড (যাহার এক পরিচ্ছেদে বিধবা বিবাহ আলোচিত হইয়াছে) তিনি সমালোচনা করিয়াছিলেন কিনা জানিনা; ফলতঃ আমার বিশ্বাস, তিনি কি আর কেহ এ পর্য্যন্ত আমার ঐ গ্রন্থর প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাতে আমার সংস্কার এই হইয়াছিল যে, শিক্ষিত মণ্ডলী মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রতিকূলমত কাহারও নাই। এতদ্ভিন্ন আমি বঙ্গদেশের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিষয়ী ও শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, আমাদের বালবিধবার পুনরায় পরিণয় হওয়া সকলেরই অভিপ্রেত; কেবল চির প্রচলিত দেশাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ বিবাহ দিতে সাহসী হয় না। বাস্তবিক এক্ষণে অনেকেরই সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের আদর্শ বিস্তৃত হইলে দেশাচারের ভয় ক্রমশঃ সামাজিকদিগের মন হইতে তিরোহিত হইয়া উপযুক্ত স্থলে বিধবা বিবাহ সাধারণ্যে অবাধে সম্পন্ন হইবে। দেখাও যাইতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং বিধবার বিবাহ কিছু দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজের কতকগুলি গতানুগতিক প্রকৃতির লোক বিধবা বিবাহের বিপক্ষে পুনরায় তর্ক উপস্থিত করিয়া যাহাতে বিধবা বিবাহের স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইয়াছেন। অল্প দিন হইল যশোহর হিন্দু রক্ষিণী সভা নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আহ্বান করিয়া বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করাইয়াছিলেন, আবার সে দিন সাবিত্রী পুস্তকালয়ের সভ্যগণ অক্ষয় বাবুকে ধরিয়া ঐরূপ একটী প্রবন্ধ পাঠ এবং কয়েকজন শিক্ষিত লোক দ্বারা তাহা অনুমোদিত করিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ এরূপ চেষ্টায় কি ফল হইবে তাহা বলা যায় না, কেননা বিদ্যমণ্ডলী ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই ঐ সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধের অসার বত্ত্বা অনায়সেই উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এতদ্দেশের একজন প্রধান স্মার্ত্ত কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহার ব্যবস্থা তৈল বটের উপরে নির্ভর করায় অনেক স্থলেই শাস্ত্রানুসারিণী না হইয়া শাস্ত্র বিপরীতই হইয়া থাকে। তাঁহার বক্তৃতার প্রতিবাদ উপযুক্ত ভাইপো কর্ত্তৃক ব্রজবিলাস নামধেয় পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ সেরূপ তৈল বটের উপরে নির্ভর না করুক কিন্তু উহা যে পাঁচ জন গোঁড়া ও বিবেকবিহীন লোকের অনুরোধে পড়িয়া ও নিজের পসার বিস্তার জন্য লিখিত হইয়াছে, তাহা বেশ বোধ হয়। অক্ষয় বাবু বিস্তর বাক্‌চাতুর্য্য সহকারে স্বীয় পাশ্চাত্য বিদ্যা ও একঘেয়ে যুক্তির বলে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করিতে গিয়া জ্ঞানবান্ লোকের নিকটে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। একদা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন একজন আধুনিক কৃতবিদ্য যুবককে বেদের অযথা ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বেকন পড়িয়া কর বেদের সিদ্ধান্ত।" উক্ত কবি এক্ষণে জীবিত থাকিলে অক্ষয় বাবুর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দেখিয়াও বোধ হয় ঐরূপ বলিতেন। যাহাহউক আমাদের সমাজের মধ্যে যাঁহারা কিছু না বুঝিয়া গোলে হরিবোল দেওয়ার মত অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের অযথা গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন এবং তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্য বিমোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য আমি অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের শাস্ত্রীয় ভাগ যথা সাধ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি এবং প্রসঙ্গাধীন আরও ২।১টী কথা বলিব।

অক্ষয় বাবু প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম দেখিয়াই কোন্ বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে হইবে হিন্দুরা ধর্ম্ম কি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ বলিলে হিন্দু কি বুঝেন।" "হিন্দুরা কি ভাবে ধর্ম্ম দেখেন" এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় অক্ষয় বাবু হিন্দু শাস্ত্রের কোন প্রমাণাদি উদ্ধৃত না করিয়া এবং হিন্দু শাস্ত্রের চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের একটী স্বকপোলকল্পিত অপূর্ব্ব সূত্র সংগঠন করিয়াছেন। আর ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহা বুঝাইতে প্রলপিতের ন্যায় এত অসংলগ্ন কথা ও উদাহরণ আনিয়াছেন যে, তাহা হিন্দুমণ্ডলীতে পাঠের উপযুক্ত নহে বলিলে দোষ হয় না। অক্ষয় বাবুর মত বুদ্ধিমান্ লোক হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা না করিয়া কিরূপে হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখা করিতে অগ্রসর হইলেন, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। তিনি বলেন;

"মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব, এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।"

আমি বিবেচনা করি ধর্ম্মের এরূপ অপূর্ব্ব সূত্রের কথা কোন হিন্দুই পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি "চরিত্র সংগঠন ও সঞ্চালন" (বোধ হয় Formation of character and putting it into practice) শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, এমন বোধ হয় না।

হিন্দু শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায়, এবং হিন্দু মাত্রেরই সংস্কার এই যে, যাহা বেদোক্ত তাহাই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীত যাহা তাহা অধর্ম্ম। (১) অথবা যাহা শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে, আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে অধর্ম্ম বলে। (২) অপরঞ্চ, "বেদ স্মৃতি, শিষ্টাচার ও আত্মসন্তোষ এই চারিটী ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া মন্বাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) অক্ষয় বাবু স্বীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মধ্যে মহর্ষি মনু সুপ্রসিদ্ধ"; সেই সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি মনুই এই শেষোক্ত কথাটী বলিয়াছেন।

অতএব প্রতীত হইতেছে যে, যে ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্ম যাজনা করা কর্ত্তব্য এবং যাহার যাজনায় যাজকের আত্ম তুষ্টিলাভ হয় বেদ স্মৃতি প্রভৃতিতে তাহারই ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে স্থূলতঃ বলিতে গেলে বেদাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্যকে হিন্দুরা ধর্ম্ম বলেন।

মনূক্ত ধর্ম্মের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ আত্মসন্তোষটি বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মসন্তোষ না জন্মিলে তাহার যাজনা হওয়াই কঠিন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত আছে যে, "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোক যাত্রাংবিনির্ব্বহেৎ।" অতএব বোধ হয়, এই আত্মসন্তোষের অনুরোধে ভিন্ন ভিন্ন লোকেরও জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্ম সকল ব্যবস্থেয় হইয়াছে। মনুষ্যের প্রকৃতি সুতরাং রুচি একরূপ নহে, সাধারণতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার প্রকৃতির লোক কর্ত্তৃক সমাজ আবহমান কাল হইতে বিভক্ত আছে। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের এই তিন প্রকার লোকেরই প্রবৃত্তি সুতরাং অধিকার বুঝিয়া তদুপযুক্ত ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিতে হইয়াছিল। আবার জীবনের অবস্থা ভেদে একজনের জন্যই বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝিয়া তদনুরূপ বিধানও শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে।

---

(১) বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) বিহিত ক্রিয়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্য য গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে। ধর্ম্মদীপিকা।

(৩) বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং। মনু, ২অ।

শাস্ত্রে যে স্থল বিশেষে পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এই। অক্ষয় বাবু হিন্দুরা ধর্ম্ম কি ভাবে দেখেন এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতে যত্নবান্ হইয়া কেবল ধর্ম্ম শব্দের বহুল ব্যবহার ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার জন্য বিজ্ঞান কোন কার্য্যকারী মতেও বলিয়াছেন অথচ তজ্জন্য অন্য কোন উপায় প্রদর্শন করেন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "উচিত অনুচিত (ধর্ম্মাধর্ম্ম) বুঝিতে হইলে কেবল ধর্ম্মের নিকষেই ঘষিতে হয়।" তদনন্তর তিনি দুইটী উদাহরণ আহরণ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মনিরূপণ করিতে এরূপ অদ্ভুত প্রণালী কেহ কখনও অবলম্বন করিয়াছেন, বোধ হয়না। যদি চক্ষু দিয়া চক্ষু দেখা যাইত, অগ্নি দ্বারা অগ্নি জানা যাইত তাহাহইলে ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ অবশ্য করা যাইত। অক্ষয় বাবু ধর্ম্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞানকে সামান্য সাধন বলিয়াছেন; কিন্তু মহর্ষি মনু জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই ধর্ম্ম অবগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন, শাস্ত্র সমূহ জ্ঞান নেত্র দ্বারা আলোচনা করতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বেদমূলক ধর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। *

---

* সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা। শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ॥ ২,অ. ৮।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিজ্ঞান শব্দ ইদানীং ইংরাজী Science অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, জ্ঞান বলিতে বিজ্ঞান বুঝায় না। ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, যখন Science দ্বারা জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা যখন দেখার কথা হইতেছে তখন কি Science দিয়া দেখার বাকি থাকিল? যাহা হউক জ্ঞান চক্ষুই ধর্ম্ম নিরূপণের যে একমাত্র সহায়, জ্ঞাননেত্র ব্যতীত যে শাস্ত্রের মর্ম্ম, শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এবং শাস্ত্রীয় বিধির সামঞ্জস্য বুঝা যায় না, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অক্ষয়বাবু মনুর "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং" ইত্যাদি পরার্দ্ধ মাত্র শ্লোক ধর্ম্মনিরূপণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যদি ঐ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত পরার্দ্ধ একত্রে আলোচনা করিতেন এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হয় একেবারে উল্টিয়া যাইত, অথবা স্বকীয় সিদ্ধান্তের পোষকতায় ঐ শ্লোক দৃষ্টান্ত স্বরূপ কখন অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এস্থলে মনুর সেই সম্পূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—

ন মাংস ভক্ষণে দোষঃ ন মদ্য নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান এবং মৈথুন কার্য্যে দোষ নাই, এই সকল কার্য্যে মনুষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তবে উহা হইতে নিবৃত্তি মহা ইষ্টজনক। এস্থলে "নিবৃত্তি" বলিতে অক্ষয়বাবু এককালে বারণ বুঝিয়াছেন; বাস্তবিক এস্থলে নিবৃত্তির অর্থ সঙ্কোচ বোধক। যদি বারণ বোধক ধরা যায় তাহা হইলে মনুর এই বাক্যগুলির সহিত বেদের এবং স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যান্য স্থানের বিরোধ হয়। "অশ্ব মেধেন যজেত" "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্ণীয়াৎ" "ঋতাবুপেয়াৎ" ইত্যাদি বেদ থাকায় যজ্ঞ করিয়া মাংস ও মদ্য ভক্ষণ এবং ভার্য্যাতে মৈথুন কার্য্য বিহিত হইতেছে। মনু বলিয়াছেন, অয়নের প্রথমে পশু যাগ করিবে ও সংবৎসর পূর্ণ হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবেক। যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আপনার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করেন তিনি নব শস্য যাগ কিম্বা পশু যাগ না করিয়া কখন নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করিবেন না। *

মনু স্থানান্তরে স্বদারে নিরত থাকিয়া ঋতু কালে ভার্য্যাগমন করিবে বলিয়াছেন।* অতএব মনু মদ্য মাংস ভক্ষণ এবং মৈথুনে যে দোষ নাই বলিয়াছেন তাহা কেবল মনুষ্যের ঐ সকল বিষয়ে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখিয়া, আর বিহিত স্থলে ঐ সকলের সেবা অর্থাৎ ঐ প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা সম্পাদন করাই (নিবৃত্তি) মহা পুণ্য জনক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নতুবা ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে, মনু বৈধ মদ্য মাংস মৈথুন হইতে সকল মনুষ্যকে এককালে বারণ করিতেছেন। শাস্ত্রান্তরে ঠিক এইরূপ স্থলেরও উল্লেখ আছে। সে স্থলেও নিবৃত্তি অর্থে এককালে নিষেধ নহে। যথা—শ্রীমদ্ভাগবত—"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতি স্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহাস্তাসু নিবৃত্তি রিষ্টা॥"

অক্ষয় বাবু যদি মনুর মাংস ভক্ষণ ও মাংস বর্জ্জনের বিধান সকল আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং শাস্ত্রীয় বিধির যে রীতিতে অর্থ গ্রহণ করিতে হয় সেই রীতি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল বিধানের অর্থ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন, যে মনু কি অর্থে ঐ শ্লোকে নিবৃত্তি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন, দ্বিজাতিদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় আদ্যোপান্ত

* শস্যান্তে নব শস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমি কৈর্ম্মখৈঃ॥
নানিষ্ট্বা নব শস্যেষ্ট্যা পশুনা চাগ্নিমান্ দ্বিজঃ
নবান্নমদ্যান্মাংসং বা দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ॥
৪ অ। ২৬। ২৭

* ঋতু কালাভিগামী স্যাৎ স্বদার-নিরতঃ সদা। ৩ অ

বলিলাম এক্ষণে মাংস ভক্ষণ ও মাংস বর্জ্জনের বিধান বলিতেছি। ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লাভান্তে যজ্ঞাঙ্গ পশুর মাংস ভোজন করিবে। মধুপর্ক যাগে নিযুক্ত হইলে মাংস ভোজন করিবে এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের অভাব স্থলে মাংস ভোজন করিবে।১।" এই প্রথম বিধানের যথারীতি অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে জানা যায় যে মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

যজ্ঞে শ্রাদ্ধে ও প্রাণাত্যয় স্থলে মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা এবং অন্য তাবৎ স্থলে মাংসভক্ষণ নিষেধ, আবার যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধে যে সকল পশু মাংস বিহিত সেই সকল পশুরই মাংস ভক্ষণীয় এবং যজ্ঞের অনিযোজ্য আর সমস্ত প্রাণীর মাংস অভক্ষণীয়। আর অন্য প্রকার খাদ্য দ্রব্যের অভাবস্থলে প্রাণধারণের নিমিত্ত যে কোন জন্তুর মাংস ভক্ষণীয় কিন্তু খাদ্যের সদ্ভাব স্থলে বিহিত মাংসই ভক্ষ্য। অপিচ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধে মাংস ভক্ষণ করিতে হইলে দশ জনকে দিয়া খাইবার কথা সুতরাং আত্মউদরের জন্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মনু এই সমস্ত কথা পরবর্ত্তী শ্লোকসকলে স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু মনুর মাংস ভক্ষণ নিষেধক অন্য যে কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও অবৈধ স্থলে বুঝিতে হইবে। কেননা মনু—নমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহিনাং। প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্ব মাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

এই শ্লোকের দ্বারা সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্তি হইবেক বলিয়া উহার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন;—

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচ বৎ। সলোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধি সমুদায় পরিবর্জ্জন করিয়া যে মানব পিশাচের ন্যায় মাংস ভোজন না করে, সে সকলের প্রিয় হয় এবং ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হয় না। অপর, মনু পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞসিদ্ধার্থ প্রজাপতি স্বয়ং পশু সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব যজ্ঞ কার্য্যে যে পশু বধ তাহা বধ নয়, যেহেতু উহাতে বধ জনিত প্রত্যবায় প্রাপ্ত হইতে হয় না। (১) উহার কিঞ্চিদন্তরে মনু পুনরায় বলিতেছেন।

মধুপর্ক্কেচ যজ্ঞেচ পিতৃদৈবত কর্ম্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যানান্যত্রেত্য ব্রবীন্মনুঃ॥

১। এতদুক্তং দ্বিজাতীনাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যমশেষতঃ।
মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে॥
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাময়া।
যথা বিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥ ৪ অ, ২৬।২৭ শ্লোঃ

(১) যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ ৫ ম, ৪১।

অর্থাৎ মধুপর্কে, যজ্ঞে ও পিতৃ ও দৈব কর্ম্মে পশু বিনাশ করিবে, অন্য কর্ম্মে করিবেক না, মনু ইহা বলিয়াছেন। (২) যজ্ঞাদিতে পশুবধের যে বিধি তাহা বেদমূলক, মনু তাহা স্বীকার করিতেছেন যথা :—

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি
নির্ব্বভৌ ॥ ৫অ, ৪৪ ॥

অর্থাৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে বেদবিহিত যে পশু হিংসা তাহাকে অহিংসাই বলিতে হয়, যেহেতু বেদে ইহা লিখিত আছে, এবং সেই বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রতিভা প্রকাশ পায়। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে;

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এবং
"অশ্বমেধেন যজেত ॥

ইত্যাদি যে বেদ আছে তদুভয়ই ধর্ম্ম, উভয়ের পরস্পর বিরোধ আপাততঃ বোধ হইলেও বস্তুতঃ মীমাংসায় উহাদের বিরোধ লক্ষিত হয় না। এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল, যে অক্ষয় বাবু মনুর নিবৃত্তি শব্দ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম নির্ণয় বিষয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছেন তত্তাবৎ ভ্রমসংকুল হইয়াছে।

অপর, অক্ষয় বাবু প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন যে "যেটা পুরাপুরি হয় না, সেইটীই মুখ্য, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাই ধর্ম্ম সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্য বিধি গুলিই ধর্ম্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা গুলি লইয়া আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইব কেন? কোন্‌টী উচিত, কোন্‌টী অনুচিত ধর্ম্মের নিকষেই তাহা স্থির হয়; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই ধর্ম্ম বুঝিতে হয়; নষ্টে মৃতে ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত মীমাংসা করা যাইতে পারে না।"

অক্ষয় বাবু ভালরূপ বিবেচনা না করিয়াই শাস্ত্রের গৌণ বিধিগুলিকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক শাস্ত্রের মুখ্য বিধিগুলিই ধর্ম্ম এবং গৌণগুলি যে অধর্ম্ম তাহা কদাচ নহে। আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপের ভিতর গৌণ বিধি লক্ষিত এবং ধর্ম্ম বলিয়া প্রতি পালিত হয়। শাস্ত্রের মুখ্য বিধান সকল শ্রেষ্ঠ এবং তদনুসারে কার্য্য করা ভাল বটে, কিন্তু সকল লোকের পক্ষে মুখ্য বিধি পালন করা সাধ্যায়ত্ত হয় না; এজন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ সকল স্থলে গৌণবিধি অবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অপারগতা ও অভাব স্থলে গৌণ বিধিগুলি পালন করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন :—

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্ভাষ্টম বর্ষেই উপনয়নকার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত।

(২) মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ দৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যানান্যত্রেত্য
ব্রবীন্মনুঃ ॥ ৫অ, ৪১।

কিন্তু যদি কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ সময়ে আপন বালকের উপনয়ন দিতে সক্ষম না হয়, তবে নবমাদি বর্ষে উক্ত কার্য্য সমাধা করিলে কি দোষ হইয়া থাকে? বাস্তবিক উপনয়নের অতীত (ষোড়শোর্দ্ধবর্ষে) কালের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে উপনয়ন হইতে পারে, তাহাতে অধর্ম্ম হয় না। ঐরূপ কন্যাদান অষ্টম বর্ষেই প্রশস্ত। "বিবাহোষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।"—সম্বর্ত্ত। কিন্তু সকলে অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিতে সক্ষম হয় না সুতরাং গৌণবিধি অনুসারে নিষিদ্ধ কালের পূর্ব্বে নবমাদি বর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে কোন দোষ হয় না। বরং "নব বর্ষাতু রোহিণী।" "দশমে কন্যকা প্রোক্তা" ইত্যাদি ফলশ্রুতি থাকায় নবম দশম বর্ষে কন্যাদান শাস্ত্রানুমোদিত জানা যাইতেছে। অপর, অবশ্যকরণীয় কোন একটী ব্রত (যেমন প্রায়শ্চিত্ত) করিতে উপবাস প্রশস্ত; কিন্তু ক্রিয়া কর্ত্তার এমন সামর্থ্য নাই যে, সে উপবাস করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করে। এমনস্থলে তাহার পক্ষে ফল মূল ও জল ভক্ষণ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার বিধি আছে।(১) এই বিধি গৌণ হইলেও ক্রিয়াকারীর তাহা অবলম্বনে কোন দোষ হয় না। অপরঞ্চ মৃতাহে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মুখ্য কার্য্য; কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ দিবস শ্রাদ্ধ করা না ঘটে, তবে উহার পরে গৌণ কল্পে পরু দিনে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় না, বরং এইরূপ অনেক স্থলেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ গৌণস্থল অনেক আহরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" এ কথাটি হিন্দুসমাজের পঞ্চম বর্ষীয় বালকও অবগত আছে। এবং প্রয়োজন মতে ঐ বিধি অনুসারে কার্য্যও সচরাচর হইতেছে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে ধর্ম্মনিরূপণ করিতে হইলে গৌণ বিধি ত্যাগ করিলে চলিবেক না। কেননা এক ধর্ম্মই মুখ্য ও গৌণরূপে বিভক্ত, যদি কেহ কেবল মুখ্য ধর্ম্ম দেখে তবে তাহার সম্বন্ধে ধর্ম্মের একাংশ মাত্র দেখা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, অক্ষয় বাবু নিজে ধর্ম্মের একদেশ দেখার বিরোধী হইয়াও কিরূপে গৌণবিধি ত্যাগ করিয়া মুখ্য বিধিকেই একমাত্র পূর্ণ ধর্ম্ম স্থির করিয়াছেন? তিনি "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি স্থল গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু তাহা যে অন্যান্য গৌণ ধর্ম্মের ন্যায় ব্যক্তি বিশেষের শক্ত্যনুরূপ যাজ্যধর্ম্ম হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গৌণ বিধিগুলি সমাজের ইতর লোকদিগের পালনের নিমিত্ত, আর মুখ্য বিধি উচ্চ শ্রেণীর লোকের যাজনজন্য শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এরূপ মত

(১) উপবাসাসমর্থশ্চ ফলমূল জলং পিবেৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণপতিখণ্ডে, মহাদেবের উক্তি।

আকাশপতিত বলিয়া বোধ হয়। উপরের যে উপনয়ন, বিবাহ ব্রত ও শ্রাদ্ধের গৌণ স্থলগুলি প্রদর্শিত হইল তাহা কি শাস্ত্রকারেরা ইতর লোকের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন? না কেবল অপারগ স্থলেই উহার অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন? যে ব্রাহ্মণ ৮ বৎসরে পুত্রের উপনয়ন দিতে অক্ষম সেই ব্রাহ্মণই ৯ম বা ১০ম বর্ষে ঐ উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিবে নতুবা কোন শূদ্র বা ইতর ব্রাহ্মণেরা ঐ গৌণ বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে, এরূপ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় নহে। আরও দেখ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য মুখ্য বিধি এবং অনুমরণ গৌণ বিধি।* ইহাতে কি এই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মচর্য্য ভদ্র বিধবার এবং অনুমরণ ইতর বিধবার জন্য ব্যবস্থাপিত? ইহা কখনই নহে। বাস্তবিক ব্রহ্মচর্য্য যে শ্রেণীর যে লোক অনুষ্ঠান করিতে পারে অনুমরণও সেই শ্রেণীর সেই লোকেরই পালনীয়। এমন কি কোন কোন ধর্ম্ম প্রয়োজকের মতে অনুমরণ মুখ্য ও ব্রহ্মচর্য্য গৌণ বলিয়া পরিগণিত দেখা যায়। † এই মুখ্য ও গৌণ বিধি বিধবার শক্তি অনুসারে অবলম্বনীয়; জাতি অনুসারে নহে। ঐ রূপ নষ্টে মৃতে ইত্যাদি আর একটী গৌণ বিধি আছে তাহাও অবশ্য ধর্ম্ম এবং যে শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মচর্য্য ও অনুমরণ পালনীয় সেই শ্রেণীর লোকেরই উহা অবলম্বনীয়; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। স্থানান্তরে এই অংশের বিস্তীর্ণ রূপ আলোচনা করা যাইবেক।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের আর এক স্থলে আছে, "নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম্ম" আর "ধর্ম্মের এই রহস্য ভাব আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোন সদনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না বলিয়া সেই অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, যদি অনুষ্ঠান ভাল হয় তবে কিসে তাহার সুচারু যাজনা হইতে পারে তাহাই দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। হিন্দু বিধবার পুনঃ বিবাহ হওয়া উচিত কি না? এই প্রশ্নের আর এক ভাবে বলিলে, এই বলিতে হয়, যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনীয় কি না? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যদি সদনুষ্ঠান হয় তবে পালনীয় বটে; কঠোর হইলেও পালনীয়, সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও (unpractical) হইলেও অবশ্য পালনীয়।"

অক্ষয়বাবু স্বীয় প্রবন্ধ মধ্যে বলিয়াছেন "নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম্ম," ইহার অর্থ আমি এই বুঝি যে, ধর্ম্ম যাহা তাহার যাজনা সততই অসম্ভব। যদি আমি অক্ষয়বাবুর

* মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। বিষ্ণু

† মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নি-
মাবিশেৎ॥
জীবন্তী চেত্ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েৎ
বপুঃ॥ ব্যাস

কথা ঠিক বুঝিয়া থাকি তবে ইহা বলিতে পারি কোন হিন্দুই ধর্ম্মকে এরূপ ভাবে জানেন না। শাস্ত্রে মৃদু হইতে কঠোর ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অধিকার ও সামর্থ্যানুসারে তাহাদের পালন করিবার নিয়ম প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃদু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা ত অনেক স্থানেই হইতে পারে; দারুণ ধর্ম্মেরও যে কেহ কখন যাজন করিতে পারে না ইহা কদাচ সঙ্গত নহে; তবে অনেক লোকে তাহার যাজন না করিতে পারে ইহা সত্য। ব্রহ্মচর্য্য যে এত কঠিন তাহারও সম্যক্ যাজনার কথা জানা যায়। পূর্ব্বে দ্বিজাদির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জীবনের আদ্য চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতঃ বিদ্যাভ্যাস করিবার নিয়ম ছিল। উহাদের ব্রহ্মচর্য্য সমাপন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল বেদ শিক্ষা করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার কথা দেখা যাইতেছে। যথা;—

"অবিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমা-
বসেৎ।" "ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী
ভবেৎ"। ইত্যাদি

পরন্তু ইহা স্বীকার করি যে, কোন কোন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ যাজনা না করিতে পারিলে উহার যথাসাধ্য যাজনা করার নিয়ম আছে; কিন্তু এমন কোন কোন ধর্ম্ম আছে যাহার সম্পূর্ণই যাজনা করিতে হইবে, না পারিলে তাহার কোন ফলই হয় না; বরং তাহাতে প্রত্যবায় আছে। যাহা কিছু নিষ্কাম ধর্ম্ম, তাহার যতদূর যাজনা করা হয় ততই কিন্তু সকাম ধর্ম্মের বেলা সে নিয়ম খাটে না। সকাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা করাই প্রয়োজন; অসম্পূর্ণ যাজনে প্রত্যবায় আছে এবং তাহার কোন ফলও নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত যদি সকাম না হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম হয় তবেই তাহার যতদূর পারা যায় অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাউক ব্রহ্মচর্য্যব্রত নিষ্কাম কি সকাম ধর্ম্ম।

অক্ষয় বাবু ব্রহ্মচর্য্যকে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ আমি উক্ত রাজার সহমরণ বিষয়ক "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ" পাঠ করিয়া দেখিলাম তাহাতে তিনি নিজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি স্বীয় সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ করিতে পারেন নাই। উক্ত সংবাদে সহমরণ হইতে ব্রহ্মচর্য্য উৎকৃষ্ট ইহাই প্রতিপন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দেখা যাইতেছে। সে সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন। ফলতঃ শাস্ত্রানুধাবন করিলে ব্রহ্মচর্য্য যে সকাম ধর্ম্ম তাহার সন্দেহ থাকে না। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে মনু বলিতেছেন।

"মহর্ষিগণ! আপনাদিগের প্রশ্নানুসারে, ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে অধ্যাত্মজ্ঞান তাহা কথিত হইল। এক্ষণে তাহার অঙ্গস্বরূপ সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ মনু যে সকল ধর্ম্মের লক্ষণ কহিয়াছেন, তাহা আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম মাত্রেই কামনার বিষয়। স্বর্গ লাভ অভিলাষে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা অতি গর্হিত। যে হেতু তদ্রূপ কর্ম্ম করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্ম জ্ঞান-সহকারে বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিলেই স্বর্গ লাভ হয়। এবংবিধ ক্রিয়া করিলে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, এরূপ বুদ্ধিকে সঙ্কল্প বলা যায়। এই সংকল্প হইতে ইচ্ছা জন্মে, অনন্তর তাহার অনুষ্ঠান করা হয়। এই রূপে যজ্ঞ সকল সঙ্কল্পসম্ভব হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও গুরু শুশ্রূষাদি নিয়ম সকল সঙ্কল্প জন্য হয়"*

অতএব ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মনু স্পষ্টাক্ষরে সঙ্কল্প জন্য সুতরাং কাম্য বলিতেছেন; তাহা কিরূপে নিষ্কামধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যে সকাম ব্রত তাহা উহার ফল শ্রুতিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যথা মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ। মনু, বিষ্ণু ও পরাশর। ইহার অর্থ এই, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর লোকান্তে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিলে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর (শনক সনাতন প্রভৃতি) ন্যায় অপুত্রা হইয়াও স্বর্গে গমন করে।* হারীত বলিতেছেন

"পতিব্রত্যা তু যা নারী নিষ্ঠাং যাতি
পতৌ মৃতে।
সা হিত্বা সর্ব্বপাপানি পতিলোক-
মবাপ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ পতিব্রতা নারী পতির লোকান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে নিয়মবতী হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পতিলোক প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে প্রকাশ যে "স্বর্গলাভ অভিলাষে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা অতি গর্হিত, যে হেতু তদ্রূপ কর্ম্ম করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।" অতএব ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত কাম্য, পতিলোক ও স্বর্গ ফলদায়ক ভিন্ন নিষ্কাম মোক্ষপ্রদ নহে। যদি ইহা হইল তবে ইহার সম্পূর্ণ যাজন না হইলে স্বর্গ ও পতিলোক লাভে বঞ্চিত এবং প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। নিষ্কাম ধর্ম্ম যাজনার মত যতদূর পারিলাম ততদূর করিলাম এমত নহে। রাজা রাম মোহন রায় স্বীয় "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ" প্রস্তাবের একস্থলে বলিয়াছেন যে, "বিশেষতঃ কার্য্য কর্ম্মের অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে ফলের হানি এবং প্রত্যবায় হয়; আর মোক্ষার্থে নিষ্কাম কর্ম্মের অঙ্গ বৈগুণ্যে কোন দোষ নাই; ইহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হয়; ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা *।"

এক্ষণে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য "কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও, (Unpractical) হইলেও অবশ্য পালনীয়" অক্ষয় বাবুর এই কথা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে কোন মতেই প্রযোজ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

---

* বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি-
র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো
যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত।। ১
কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন
চৈবেহাস্ত্যকাম্যতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ
কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ।। ২
সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্প সম্ভবাঃ।
ব্রতানিযমধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ৩

* শাস্ত্রানুসারে অপুত্রক ব্যক্তির গতি হয় না। যথা—
অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি শ্রুয়তে"।
পরন্তু ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা স্বর্গ লাভ হইতে পারে। যথা মনু—
অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাং।
দিবঙ্গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥
৫অ ১৫৯।

আত্মা।

কার্য্য-কারণ অনুসারে জীবের অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হয়। সৎপ্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়িনী এবং অসৎপ্রবৃত্তি জীবের চিরাভ্যস্ত। জীব অসৎ প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে চিরাভ্যস্ত হইলেও তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল ঐ ক্ষণস্থায়ীকালের গভীরতম প্রদেশ সকলকে আপনাদিগের সত্য জ্যোতি-দ্বারা সমুদ্ভাসিত করিতে থাকে। এই নিমিত্তই মলিন নিকৃষ্টবৃত্তি সকলের অভ্যাস সম্বন্ধীয় প্রবল তর্কও পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তির তেজস্বিতার নিকট হীনপ্রভ ও পরাজিত হয়। আমাদিগের অতীত আচরণ সকল অভ্যাসের নিকট নিয়ত পরাভূত হইলেও আমরা ভবিষ্যৎ বিজয়ের আশা করিয়া থাকি। আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করি যে মানব জীবন অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু ঐ অকিঞ্চিৎকরতা কে আমাদিগকে অবগত করাইল? আমাদিগের এই জীবন অকিঞ্চিৎকর অন্তঃসারশূন্য অনিত্য এইরূপ জ্ঞানের অথবা এতদ্বিষয়ক অসন্তোষের পুরুষ পরম্পরাগত প্রাচীন অসন্তোষের—অশান্তিই বা কারণ

* নেহাভিক্রম নাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

কি? আমরা আমাদিগের জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির মূলে যে অভাব বা অজ্ঞতার ভাব অনুভব করি সেই বিশ্বজনীন ভাবই কি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্ম বস্তুর বা আত্মাস্তিত্ব জ্ঞানের সঙ্কেত করিয়া উল্লিখিত প্রশ্ন দ্বয়ের উত্তর প্রদান করিতেছেনা? তবে কেন মানবইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রকে অর্থ শূন্য প্রলাপ বাক্য বলিয়া অনাদর করে? ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্র সকল দৃঢ়তার সহিত মুক্তকণ্ঠে অবিরোধে আত্মবস্তুর অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতেছে। কোন এক অসীম অনন্ত শক্তি যে এই দেহ প্রপঞ্চের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে কার্য্য করিতেছে এবং সেই শক্তি কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে পরিচালিত হইয়াই যে ঐ প্রপঞ্চদেহ উৎপত্তি স্থিতি লয় ভজনা করিতেছে তৎসম্বন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মত বৈষম্য নাই। মতভেদ না থাকিলেও যে কোন কোন সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যক্তি আত্মাস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবই তাহার হেতু। আত্মোৎপাদনে অক্ষম বিজ্ঞান শাস্ত্র পরীক্ষা দ্বারা রাসায়নিক বিশ্লেষণের অবশেষ সদৃশ দেহ প্রপঞ্চ বিশ্লিষ্ট আত্মার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং হেতুবাদ রত বৈজ্ঞানিক প্রবরগণ আত্মাস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে অভিলাষ করেন না।

মানব প্রবাহ অনাবিষ্কৃত গুপ্তসম্ভব স্রোত সদৃশ। মানবজাতির উৎপত্তি স্থান মানব প্রত্যক্ষের অগোচর। অঙ্কশাস্ত্র মানবের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত গণনা করিতে অক্ষম। ব্যাপার সকল অন্যথা সিদ্ধি শূন্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছাশক্তিরূপ কারণেরই পরবর্ত্তী। তথাপি আমরা ঘটনাবলীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ইচ্ছাশক্তিরও পূর্ব্ববর্ত্তী একটী আদি কারণ স্বীকার করিয়া থাকি। ঐরূপ বিশ্বাস আমাদিগের বিবেকানুমোদিত স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস। অপরাপর ঘটনার ন্যায় চিন্তার কারণ সম্বন্ধেও আমাদিগের ঐরূপ বিশ্বাস। যাহাকে কারণ বলিতেছ সেই কারণে যে ধর্ম্ম নাই কার্য্যে তাহার ফল কোথা হইতে আসিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তার্কিক জানি না বলিয়া ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু বিবেক বলিয়া দিতেছে যে তার্কিক তুমি যে পদার্থের প্রতি অজ্ঞানের অধ্যাস করিতেছ সেই অপ্রত্যক্ষ সাক্ষীস্বরূপ পদার্থই তোমার চিন্তার কারণ বা আশ্রয়। আমরা যখন একটী নদীকে অপরিজ্ঞাত প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সকলের উর্ব্বরতা বিধান করিতে দেখি তখন আমরা আমাদিগের পরিমিত শক্তিকে ঐ কার্য্যের কারণ বিবেচনা করিনা। কিন্তু উহার রসভোগী মনে করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে উহার কারণ জ্ঞানে অপরিমেয় শক্তির উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। একমাত্র কার্য্যের একই কারণ হইলেও অর্থাৎ যে কার্য্য কারণ ভিন্ন ঘটেনা তৎকার্য্যের

কারণ তাহাই হইলেও কার্য্য নিচয়ের পরস্পর ভেদ এতাদৃশ অল্প যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও কতকগুলি কার্য্য একই কার্য্যরূপে প্রতীত হওয়াতে এক কার্য্যের বহুকারণত্ব ভ্রম ঘটে। প্রমাতার এইরূপ ভ্রম প্রমাদাদি দোষ প্রযুক্ত কেবলমাত্র কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা দ্বারা বস্তু নির্ণয় হইতে পারেনা। অতএব বিবেক শূন্য অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য নহে। বিবেক যে অনুমানকে সত্যরূপে সিদ্ধান্ত করিবে তাহাই সত্য। সাধারণ বিবেক বিশ্বজনীন বিবেক কখনই অসত্য হইতে পারে না।

অপৌরুষেয় সাধারণ বিবেক বলিতেছে যে একমাত্র কাল প্রবর্ত্তক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কোমল করে এবং তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীনে এই বিশ্ব আমার সহিত অবস্থিতি করিতেছে। সেই একমাত্র পরমাত্মা—যাঁহার অনুপ্রবেশেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির উদ্বোধনে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কারের ও ক্রমে ত্রিবিধ সর্গাদির বিকাশ হইয়াছে —যাঁহার প্রকাশে জীবের জ্ঞান ও সাম্য যাঁহার অদর্শনে জীবের অজ্ঞান ও বৈষম্য আপতিত হইতেছে—সেই একমাত্র আত্মাই (পরমাত্মাই) প্রতি হৃদয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবাত্মারূপে বিবেক আবির্ভাবিত করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রে দেহ একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। শরীর ভূতপঞ্চের সমষ্টি স্বরূপ পৃথিবী। ইন্দ্রিয়গণ ভোগ নিলয় স্বর্গ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোক্তাই দেবতা। আত্মা ঐ দেহ প্রপঞ্চের ঈশ্বর। দেবতাগণ তত্তদিন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগরূপ স্বর্গভোগের অবসান হইলেই অন্তর্হিত হয়েন। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। তিনি অনাদি অনন্ত কাল মায়াজাল বিস্তারিত করিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে বিশ্বের পর বিশ্বান্তরের উৎপত্তি স্থিতি ভঙ্গ সমাধান করিতেছেন। জীব যতকাল মায়ামোহিত থাকিয়া অহঙ্কার বিমূঢ় চিত্তে আত্মকর্ত্তৃত্ব অনুধ্যান করেন ততদিন তাঁহার চঞ্চল হৃদয়ে পরমাত্মজ্যোতি স্থান প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে শিক্ষা সহকারে উক্ত চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়। তদনন্তর প্রশান্ত হৃদয় কন্দর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থের নির্ব্বিশেষ স্ফুরণে আলোকিত হইলে জীব-সাধারণ নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও তজ্জনিত বৈষম্য তিরোহিত হয় এবং নৈসর্গিক স্বত্ব-কর্ত্তব্যতাত্মক বিবেকের উদ্রেক হয়। তদুদয়ে কাপট্য ও অভিমান বিলীন হইলে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৎকালে সমস্ত অসদ্বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া সদ্রূপে পরিণত হয়। ঐ অবস্থায় জীবের বাক্য সকল রসনা হইতে উৎপন্ন না হইয়া অন্তর হইতে নিঃসৃত হয়। তখন জীব-হৃদয়স্থ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া অখণ্ড স্বরূপাবির্ভাবে অক্ষয় আনন্দ অনুভবে সমর্থ হয়। যে শক্তির আশ্রয়ে আমাদিগের অস্তিত্ব হয় সেই আত্মশক্তি

তখন আর স্বতন্ত্র বা অসম্পূর্ণ থাকে না। তখন সাধ্য-সাধন প্রমাতৃ-প্রমেয় ও বিষয়ী-বিষয়ের ভেদ অন্তর্হিত হওয়াতে অংশস্বরূপ জীবাত্মা অংশী পরমাত্মার সহিত সমান হইয়া অখণ্ডতার আলোক প্রাপ্ত হয়। তখন আমরা সুখ-দুঃখ বন্ধ-মুক্তি প্রভৃতির তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হই। তখন আর পূর্ব্বানুভূত অভাবের লেশও থাকে না। তখন সাক্ষীর স্বরূপাবরোধে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির রহস্য অপগমে তন্ময়ত্ব প্রতীতি হইতে থাকে। তদনন্তর সেই ভগবৎ পদার্থের স্বরূপ শক্তির আবির্ভাবেই আমি উপাস্য পরমাত্মা ও উপাসক জীবাত্মার স্বত্ব কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের ও প্রয়োগের সাফল্য সন্দর্শনে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। তখন প্রকৃতির আবরণ অদৃশ্য হইয়া যায়।

দর্শনশাস্ত্র বিবেক দ্বারা প্রমাণ করিতেছে যে জীবাত্মা ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী ও জীবন। উহা ধারণা স্মৃতি ও উপমিতির ন্যায় বৃত্তিবিশেষ নহে, কিন্তু ঐ সকল বৃত্তির উদ্ভাবন কর্ত্তা। ঐ সকল বৃত্তি প্রমাতৃ জীবের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী। উহারা জীবের অধিকারী নহে, কিন্তু অধিকার্য্য বিষয়। আমরা জীবকে কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে অনুভব করি, কিন্তু উহা কেবল তাহাই নহে। উহা জ্ঞান ও সৎস্বরূপ। আত্মাই জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির অদ্বিতীয় আশ্রয়। উক্ত জ্ঞানের স্বরূপাস্ফুরণে বা স্বরূপবিকারেই অতত্ত্বজ্ঞান বা অজ্ঞানের উৎপত্তি। ইচ্ছার বিকারে বন্ধ ও ক্রিয়ার বিকারে দুঃখের উদয় হয়। আত্মজ্ঞান বা সাত্ত্বিক অহঙ্কারের বিকারই রাজস অহঙ্কার বা বন্ধ এবং তামস অহঙ্কার বা দুঃখের নিদান স্বরূপ। ঐ অহঙ্কার যখন আত্মনিহিত বিবেকবলে বিকৃত হইতে প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতির জন্য অভিলাষী হয়েন তখন আবার জীব স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ঈশ্বর বিমুখ অহঙ্কারী জীব চঞ্চলমায়াআবরণে আবৃত থাকিয়া আপনাকে প্রভু বিবেচনা করিয়া দুঃখভোগ করে। বিবেক অসি মায়া আবরণ ছেদন করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন জীব নিজের অসম্পূর্ণতা ও আবরণের অনিত্যতা বুঝিতে পারেন। এইরূপ ক্রমে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন হয়। এই তমোধর্ম্মী সেই প্রকাশ স্বভাব পরমাত্মার ছায়া মাত্র। কাল ও আধার শক্তিমান বা চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট আত্মার এবং গুণ সকল অচিচ্ছক্তির বা মায়ার প্রকাশ ও প্রকাশক। এতদুভয়ের অন্বয়েই উৎপত্তি ও স্থিতি এবং ব্যতিরেকেই প্রলয়। স্থিতিকালে উভয়ে সাম্য নিয়মের অধীনে সামঞ্জস্য ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। মায়া বা প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি বিষয় গ্রহণ এবং আত্মাদ্বারা কাল ও আধারের গ্রহণ হয়। আত্মা আত্ম শক্তিরই প্রকাশ ভিন্ন অপর কিছুই দর্শন করেন

না। রূপাদি পঞ্চ তন্মাত্রোৎপন্ন রূপাদি বিষয় সকল আত্মারই অচিচ্ছক্তিরূপ লীলা পরিচ্ছদ।

আত্মা উন্নতিশীল, অর্থাৎ আত্মা মায়ার অধ্যাস হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়েন। ঐ উন্নতির গতি বা ক্রম উহারই নিয়ম ভিন্ন অপর কিছুরই দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। ঐ উন্নতির গতি সমভাবে অর্থাৎ এক জাতানুগামিনী নহে; কিন্তু ক্রম ভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন জাত্যনুগামিনী। ভূতজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ ক্রমে আত্মার উন্নতি হইতে থাকে। কারণজাতীয় আত্মা কার্য্যজাতীয় আত্মার সমধর্ম্মী অর্থাৎ তাহার ন্যায় পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুট চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট।

উন্নতি বা মুক্তি আত্মার স্বভাব সিদ্ধ। নৈতিক ও মানসিক উন্নতিরও ঐ নিয়ম। তথাপি আত্মা উন্নত হইয়াও অবনত, পবিত্র হইয়াও অপবিত্র, মুক্ত হইয়াও বদ্ধ রূপে প্রতীত হয়েন। ঐ অসৎ প্রতীতির নিরসনের হেতু আত্মানাত্ম বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদিসাধন সম্পদ্ এবং মুমুক্ষুত্ব। পরমাত্মা ব্যাপক হইয়াও বিশ্বগোলকের কেন্দ্র স্বরূপ গুহা প্রবিষ্ট অন্তর্যামী। জীবাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবৃত স্বভাব হইয়াও পরমাত্ম বিমুখতা বা অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রযুক্ত মায়াবৃত পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান অবনতি ও উন্নতি ধর্ম্মক পরমাত্মাংশ। এই বিশ্বরচনার কারণই ঐ পরমাত্মা। উহা দুই চারি দিবসের রচনা নহে, কিন্তু এক মাত্র ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীনে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া রচিত।

আত্ম জ্ঞানের কারণ স্বরূপ বিবেকের মূলে দুইটি উপাদান বিদ্যমান। একটির নাম স্বত্ব, অপরটির নাম কর্ত্তব্যতা। বিবেক চিচ্ছক্তিরই প্রকাশ। নীতি-শিক্ষায় বা বিবেকোদ্ভাবনের প্রধান সাধনই আত্মাবতার। আত্মার দ্বৈত ভানের অভাবেই বিবেকের উদ্ভাবন। সৃষ্টির আদিতেও আত্মার শক্তিদ্বয় এবং পরেও স্ত্রীপুংভাবে দ্বৈধা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বৈবিধ্যই আবার মানবের সমাজপ্রিয়তার হেতু। জীব আত্ম-তৃপ্তির জন্য সমধর্ম্মী জীবসমাজে বাস করে। সমধর্ম্মী জীবই জীবের হৃদয়ের অভাবজ্ঞ এবং সন্তোষকর। সমধর্ম্মী জীব সকল সদৃশ আত্ম বিশিষ্ট। সদৃশ আত্মাভিন্ন অপর কেহই অন্তর আকর্ষণে সমভাবে সামর্থ্য লাভ করে না। ঐ আকর্ষণ হইতেই প্রীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকলের এবং বিমর্ষণ হইতে ঘৃণা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি সকলের উদ্রেক হয়। পরিবার, সমাজ, রাজা, যুদ্ধ, বিগ্রহ প্রভৃতি সমগ্র ব্যাপারই উক্ত দ্বৈত ভাবের ফলস্বরূপ। দ্বৈতভাব সমুত্থিত ঐ প্রীতি বা অপ্রীতির কারণ জড় নহে। যখনই আমরা ঐ প্রীতি বা অপ্রীতির ভাব প্রকাশ করি তখনই উহা একটি অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে

দেখা যায় কেহ কেহ বলেন যে উহা অন্য কোন শক্তির উদ্দেশে নহে, কিন্তু সংস্কার বশতঃ ঐরূপ বোধ হয় মাত্র। উহা যে সংস্কার হইতে উত্থিত হয় তাহা সত্য; কিন্তু পর পর সংস্কারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ অনুসন্ধান করিলে এক মাত্র চিৎ স্বরূপ পদার্থেরই পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং প্রতিশরীরে বহু রূপে অলক্ষিত ভাবে সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান ও প্রবর্ত্তকত্ব লক্ষিত হইবে। আত্মতত্ত্ব বিবেক প্রতি শরীরেই সমভাবে বিরাজ করিতেছে। মায়া জবনিকার সঙ্কোচন ও প্রসারণই আমাদিগের সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের নিদান। মায়াজনিত অহঙ্কারই মোহের জনক। উক্ত অহঙ্কারের অবসানেই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে।

জীবের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। আমরা জানিতে পারি যে আমরা অসম্পূর্ণ। সুতরাং সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির ইচ্ছাও আমাদিগের অন্তরে নিহিত আছে। ঐ সম্পূর্ণতার আদর্শই পরমাত্মা। জীবগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবশতঃ বিশ্ব সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে থাকেন। কার্য্য করিতে করিতে বিবেকের উদয় হইলেই ঐ বন্ধকর্ত্রী অকার্য্যবাসনা মোক্ষকর্ত্রী সৎসেবায় পরিণতা হয়।

আত্মা প্রতিদেহে সকল অবস্থাতেই বিরাজমান। আত্ম সাক্ষী স্বরূপ ও সত্যপ্রকাশক। তার্কিকগণ যাহা ইচ্ছা বলুন, তাহাতে ক্ষতিনাই। কিন্তু আমি চিরকালই বলিব, আমার আত্মবিশ্বাস ভ্রান্ত নহে। নিদ্রাভঙ্গের পর "আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম কিছুই জানিনা বা নানা প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে ছিলাম" এইরূপ বাক্য প্রয়োগই আত্মবিশ্বাসমূলক। পরে আমি জাগরিত হইয়াছি, এবম্বিধ বাক্যও আত্মপ্রমাণ-সূচক। উক্ত জাগ্রত স্বপ্নও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস আমাদিগের সত্য বিশ্বাস। ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তন জ্ঞান যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান আত্মজ্ঞানও তদ্রূপ। বিশ্বাস মাত্রই ভ্রান্তি বা কল্পনামূলক। সুষুপ্তি কালে যে আমি আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ছিলাম সেই আমি এক্ষণে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ কার্য্যই সম্পাদন করিতেছি, এইরূপ আত্মাস্তিত্ব বিশ্বাস কি ভ্রান্তিমূলক? না উহা মিথ্যা নহে। সত্যই আত্মার রূপ। ঐ আত্মজ্যোতিই আমাদিগের অন্তরে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য করিতেছে এবং সমস্ত বিষয়কে জ্ঞানবিষয়ীভূত করিতেছে। বেদ বা অপৌরুষেয় পুরুষপরম্পরাগত বিবেকই আত্মজ্ঞানের প্রকাশক। ঐ বিবেক আত্মার সহজ ধর্ম্ম। সুতরাং আত্মজ্ঞানই চিৎস্বরূপ আত্মার প্রকাশক। আত্মা বাহ্য বাক্য দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেন না। আন্তর বাক্য বা আত্মানুভবই আত্মার বোধক। যতদিন না মায়াবরণ উন্মুক্ত হয় ততদিন আত্মতত্ত্ব

জ্ঞান জন্মে না। বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিষয়ই বাক্যদ্বারা বিবৃত বা তর্কদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না। বস্তুতত্ত্ব অন্তরের ধন, জ্ঞানের বেদ্য, উহা ইন্দ্রিয় গোচর নহে। বিবেকই বস্তুজ্ঞানের এক মাত্র প্রমাণ। বয়স, প্রাকৃতিক শিক্ষা, সঙ্গ, ক্রিয়া বা বিদ্যা মানবকে ঈশ সাম্মুখ্য প্রদানে সমর্থ নহে। বিবেকই তদ্বিধানের অদ্বিতীয় সহায়। বিবেকী স্বতঃই ঈশ্বর প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। অসৎ-প্রবৃত্তি বিবেকীর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আত্মজ্ঞানীর আত্মজিজ্ঞাসা নিরস্ত হয়। যাঁহার হৃদয়ে যে বিষয়ের অভাব আছে তিনি তদভাব পূরণার্থই তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েন। অগ্রে জিজ্ঞাসা পরে শিক্ষা অবশেষে বিবেকের উদয় হয়।

শিক্ষক অন্তর্দর্শী ও বহির্দর্শীভেদে দ্বিবিধ। কালিদাস ভবভূতি, ব্যাস বাল্মীকি, শঙ্কর জৈমিনি, গৌতম নারদ, শুক চৈতন্য ইহাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষক বাহ্যদর্শী অতএব সাধারণ এবং অপর শ্রেণীর শিক্ষক অন্তর্দর্শী অতএব অসাধারণ।

বাহ্যদর্শী শিক্ষকগণ গ্রন্থে শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু অন্তর্দর্শী শিক্ষকগণ আচরণ দ্বারা শিক্ষাদান করেন। গ্রন্থ-শিক্ষা অপেক্ষা আচরণ শিক্ষার আকর্ষণ-শক্তি বলীয়সী। সদাচারী জনগণের নিরভিমান চরিত্রই মানবের নীতি শিক্ষার উপযুক্ত আদর্শ। ঐ আদর্শের অনুসরণে জীব ক্রমে উন্নতিলাভ পূর্ব্বক পরিণামে আধ্যাত্মিক সুখের উজ্জ্বল উন্নত পথে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরাভি-মুখপ্রবৃত্তি হয়েন। তদনন্তর ভক্তি সখির সহিত প্রেম সিংহাসনে আসীন হইয়া অনন্ত সুখ রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আর্য্য-সঙ্গীত।

জাতীয় নিগ্রহ।

১

উত্তাল তরঙ্গে, ভীম রঙ্গ ভঙ্গে,
সিন্ধু অভিমুখে ধায় সিন্ধু নদ।
তুলি শ্বেত পক্ষ, উড়ে লক্ষ লক্ষ—
তরণী, বহিয়া বাণিজ্য সম্পদ।

২

দু'ধারে অগণ্য, প্রদেশ অরণ্য,
গিরি, দুর্গ, গ্রাম নগর প্রান্তর;
আহ! মরি মরি, প্রকৃতি সুন্দরী,
পূর্ণ যৌবনেতে গম্ভীর নশ্বর।

৩

অদূরে নিবিড়, অরণ্য সুস্থির,
নীলিলতা লীলাস্থলী চিত্তহরা;
শাল ও পিয়াল, অশোক, তমাল,
রসাল, দাড়িম্ব, বেদানা, পেয়ারা।

৪

হর্ত্তকী, বহেরা, বখারা, সোহারা,
বাদাম, খর্জ্জুর, নারিকেল, কুল;
লুকাট্, বকুল, পিচ্, কেন্, মোল;
গুবাক গোলাপ জাম, জামরুল।

৫

চন্দন সেগুনী, আব্‌লুশ্ মে'গেনী,
বক্‌স হুগ্‌নী মুর্গ শিশুরন্ জাম;
দীর্ঘ দেবদারু চল দল তরু—
ঘট শ্যাম বট নয়নাভিরাম!

৬

শমী ও খদির, শ্রীফল জম্বীর
পনস্, কদলী, পেঁপে সুমধুর।
সংখ্যা নাই কত, তরুলতা যত,
বিবিধ ওষধী শষ্প সুপ্রচুর।

৭

গামার পারুল শিরীশ জাকল,
ছাতিম শাল্মলী আসন আমলকী;
আজন অর্জ্জুন ভেলা ঝাউতুণ,
বক ও কদম্ব কিংশুক ধাতুকী।

৮

কেতকী টগর, চাঁপা নাগেশ্বর,
গন্ধরাজ, জাতি, মল্লিকা যুথিকা;
গোলাপ, চামেলী, মালতী, সেফালী;
মাধবী নিকুঞ্জ কুসুম বীথিকা।

৯

দ্রাক্ষা ও লবঙ্গ, ইঙ্গুদী পিয়ঙ্গ,
এলাচী, মরিচী, জৈত্রী, জায়ফল,
বৃক্ষলতা যত, কহিব তা' কত
পত্র পুষ্প ফলে করে দল্‌মল্।

১০

বসন্ত সমীরে, উড়িতেছে ধীরে,
পুষ্প মধুরেণু গন্ধ মনোমদ;
মধুব্রত কুল, সৌরভে আকুল,
উড়ে ফুলে ফুলে করিছে আমোদ।

১১

ক'রে মধুপান, গুন গুন গান,
গাহিতেছে, দিক ভাসায়ে উচ্ছ্বাসে
কোকিল পাপীয়া, কুহরে মাতিয়া,
নাচে বিনোদিয়া ময়ূর উল্লাসে।

১২

নানাজাতি পাখী, আলোড়িয়া শাখী,
ফল ফুল মধু খায়, আর গায়,
অদূরে মধুরে, কল কল স্বরে,
গিরি নির্ঝরিণী গায়, বহে যায়।

১৩

ঝর ঝর ঝরে, ঝরণা ঝর্ঝরে
যেন রত্নফল পড়ে স্তরে স্তরে;
গলিয়া সে ফল, হইতেছে জল,
বহে কল কল তরঙ্গ মন্থরে।

১৪

সিংহ ব্যাঘ্র আর, ভল্লুক গণ্ডার,
মাতঙ্গ মহিষ বরাহ হরিণ,
ফিরে ইতস্ততঃ, সংখ্যা নাই কত,
শত শত শাখামৃগ, শঙ্কাহীন;

১৫

ফিরে ডালে ডালে, ডাকে ঘোর রোলে
উল্লু, এই এই, সল্লকী মার্জ্জার,
চামরী, গোধন, অজামেষগণ
চরে অগণন, এ সব কাহার?

১৬

কাহার শাসনে, কিম্বা কার গুণে,
ভুলি হিংসা দ্বেষ সবলে দুর্ব্বলে,
ফিরে বনস্থানে, সদানন্দ মনে,
বাঁধা পরস্পর প্রীতির শৃঙ্খলে।

১৭

এ নহে সামান্য, দণ্ডমা অরণ্য
দণ্ডমা আচার্য্য আশ্রম বিপিন;
অই যে অদূরে, নির্ঝরিণী তীরে
ভূধর কুটীর দ্বারে সমাসীন—

১৮

দিব্য শিলাপরে বিজনে গম্ভীরে—
ধ্যাননিমীলিত নেত্রে তপোধন,
নিষ্ঠা সুপ্রবল, স্থির অবিচল,—
ভাবেতে ভাবেন অনন্ত কারণ।

১৯

দীর্ঘ শ্মশ্রু শ্যাম, শিরে জটা দাম
অতি অনুপম প্রশস্ত কপাল।
স্ফূর্ত্তি ঢল ঢল, চারু গণ্ডস্থল,
বহি পড়ে প্রেম ধারা মুক্তা জাল।

২০

জয়ী শোক তাপ; সুখ দুঃখ পাপ—
স্পর্শিতে পারেনা ও পাবক রাশি;
সূর্য্যসম প্রভা, বদন প্রতিভা,
আলোকে অরণ্য তমোরাশি নাশি।

২১

যোগীর শ্রীঅঙ্গ, নির্ম্মুক্ত উলঙ্গ,
কমল সন্নিভ শ্বেত সুদর্শন;
যেন কৈলাশেতে মহা তপস্যাতে,
নিমগ্ন ধূর্জ্জটী হেন লয় মন।

২২

বহু ক্ষণ পরে, ধ্যান ভঙ্গ ক'রে,
চাহিল তপস্বী অমনি তখন;
এক শ্বেত কায়, করিয়া বিনয়,
কয় আমি গ্রীস্ দেশী একজন।

২৩

ওনেসিক্রিতস্ নাম, হে তাপস!
শুনি তব যশঃ মাসিডোন পতি।
যিনি বাহুবলে, এই ভূমণ্ডলে,
করি অধিকার, ভারতে সম্প্রতি—

২৪

শাসিতে সবলে, সহ সৈন্য দলে,
এসেছেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীর।
—এই লিপি খানি, দিয়া ওহে জ্ঞানী!
পাঠায়েছে তব কাছে মোরে, ধীর!

২৫

আহা! শ্বেতকায়, গন্ধর্ব্বের প্রায়,
দণ্ডমা আশ্রম নিভৃত কুঞ্জেতে,
বাঁধি অশ্বগাছে, দণ্ডমার কাছে,
দাঁড়ায়ে অবাক বিহ্বল ভাবেতে।—

২৬

দেখিলা, অরণ্য, হাসিতেছে যেন,
ভাসিতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের সাগরে।
মৃগপক্ষী প্রাণী, গিরি নির্ঝরিণী,
নীলিলতা পুষ্প মত্ত প্রেম ভরে।

২৭

মহাভীম বায়ু বহিয়া নিয়ত,
মহারণ্য ক্ষুব্ধ হইবারে পারে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দণ্ডমা অরণ্যে
বার মাস ধীর সমীর সঞ্চরে।

২৮

বার মাস বন কুসুম সম্ভার,
সম্ভোগ করিয়া থাকে মধুকর,
বার মাস গায় মত্ত বিহঙ্গেরা
বার মাস শ্যাম শাখে পিকবর

২৯

গায় কুহুস্বরে ভাষায়ে কান্তারে,
পাপীয়া পরাণ খুলি উচ্চস্বরেঃ;
পিও পিও গানে উদাস গগনে,
ভাসায় ভাবের স্বপন প্রবাহে।

৩০

দেখি বন শোভা, দণ্ডমার প্রভা
ভক্তি পুলকিত প্রাজ্ঞ সিক্রিতস্
কহিল বিনয়ে দণ্ডমার প্রতি—
"ওহে পূজ্য, জ্ঞান প্রবৃদ্ধ তাপস!

৩১

বীর সেকেন্দার, দেখিতে তোমার,
অপার অভাব গভীর জ্ঞানের মহিমা,
দেখিতে তোমার, ঔদার্য্য অপার,
অতীব সযত্ন আছেন; দণ্ডমা!

৩২

দেখ পত্র পড়ি চল কৃপা করি,
দেখিলে তোমরে মাসিডোনপতি;
হ'য়ে প্রীত মন, পূজিবে চরণ,
তপোধন! তবে চলুন সম্প্রতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রামানন্দের পত্র।

রামানন্দ বসুর যখন তিন বৎসর মাত্র বয়স, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে বারাণসী তীর্থে আসিয়াছিলেন এবং সেই অবধি আর কখনও স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। রামানন্দ বিদেশে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগ, দিল্লী, মথুরা ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন অবধি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আজ চারি বৎসর হইল, বারাণসীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন চাকরী ত্যাগ করিয়া তাঁহার বারাণসীর বাটীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। কথা বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কলিকাতা হইতে পদব্রজে প্রায় এক দিনের পথ। তিনি কখনও বাঙ্গালা দেশ দেখেন নাই এবং তাঁহার সেখানকার আচার ব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা দেখিয়া আসিবার বড় ইচ্ছা আছে। কিন্তু সুবিধা হয় নাই বলিয়া এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই। কেননা কলিকাতায় এমন সাধারণ স্থান নাই, যেখানে কোন বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিছুদিন থাকিতে পারেন। আমি আমার কলিকাতার একজন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কলিকাতায় গিয়া এবং বাঙ্গালা দেশ দেখিয়া আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকখানির কিয়দংশ প্রকাশিত করিতেছি।

১ম পত্র।

*** আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হইল আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। এতদিন যে তোমাকে পত্র লিখি নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ এইযে, লিখিবার অনেক কথা। একেবারে কত কথা

লিখিব, প্রথমে কোন্ কথা লিখিব, তাহা এতদিন নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছিলাম না; এখনও স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু কথাগুলি বলিবার জন্য মন বড় চঞ্চল হইয়াছে তাই আজ কয়েকটী কথা লিখিতেছি। অসংলগ্ন বা অসম্বদ্ধ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইও না।

প্রায় ১৮।১৯ ঘণ্টা রেল গাড়িতে থাকিয়া তারপর বাঙ্গালাদেশ প্রথম দেখিলাম। কোন্ সময় বাঙ্গালার সীমায় প্রথম পৌঁছিয়াছিলাম বলিতে পারি না। কেননা রাত্রিতে নিদ্রিত ছিলাম। গাঢ় নিদ্রায় পর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রেলওয়ের পুস্তক দেখিয়া জানিতে পারিলাম কলিকাতার সন্নিকটে আসিয়াছি। তখন সবে মাত্র প্রভাত হইতেছিল। ঊষার শুভ্র জ্যোতির সঙ্গে নিশার কালবর্ণ একটু একটু মিশিয়া রহিয়াছে। রেল গাড়ীর বাতায়ন হইতে চারিদিক চাহিয়া বাঙ্গালাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। প্রকৃতির এমন শান্ত মূর্ত্তি, তরুলতার এমন পূর্ণ সজীবতা, ফল পুষ্পের এমন গৌরবময় কান্তি, আকাশের এমন সুন্দর নীলিমা, আমি আর কখনও আর কোন দেশে দেখি নাই। যাঁহারা প্রান্তর ময় বিরল-পাদপ পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া অনেক দিনের পর বাঙ্গালাদেশ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। শুনিতে পাইলাম, কোকিল, কাকাতুয়া, দয়েল, পাপীয়া আরও কত বিহঙ্গের মধুর কূজন রেলচক্রের কর্কশ উচ্চ শব্দ অতিক্রম করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতে-ছিল। দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, যে দেশের মনোমোহিনী প্রকৃতি এমন পূর্ণ গৌরবে হাস্য করে, এমন মধুর তানে সঙ্গীত করে, না জানি সে দেশের লোক কেমন কোমলহৃদয়, কেমন সুস্থকায় ও প্রফুল্লচিত্ত! প্রকৃতির সেই মোহন ছবি দেখিতে দেখিতে সেই হৃদয়বিমোহন সুস্বরলহরী শুনিতে শুনিতে, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তিনী গঙ্গা-তীরে পৌঁছিলাম। সর্ব্ব প্রথমে যে দৃশ্য নয়ন গোচর হইল, তাহাতে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম! প্রকৃতির মোহনরূপ দেখিয়া যে আশা করিয়া-ছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক অপনীত হইল! দেখিলাম গঙ্গাতীররাজপথ বহুলোক পরিবৃত। গঙ্গাসলিলে বহুসংখ্যক নরনারী স্নান পূজাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক দেশের লোক দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে ভারতের রাজধানী কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের লোকের কত প্রভেদ তাহা আজি প্রথম বুঝিতে পারিলাম। প্রায় সকলেই দুর্ব্বলকায়, হীনশ্রী, প্রায় সকলেরই মুখমণ্ডল অতীব পাণ্ডুবর্ণ! যেন এ দেশের লোকের চিত্তের প্রফুল্লতা নাই।

যেন এ দেশে সজীবতার বড়ই অপ্রতুল! যেন এখানকার লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে, যেন বারমাস ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করে! মানুষের কথা দূরে থাকুক, গো অশ্ব, ছাগ মেষাদি পশুগণ যেন অতীব খর্ব্বকায়, হীনবল ও রুগ্ন-দেহ বোধ হইতে লাগিল। যাঁহারা সর্ব্বদা বাঙ্গালা দেশেই বাস করেন, প্রত্যহ বঙ্গদেশবাসিগণকেই দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয় এ প্রভেদ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, দ্রুতগামী রেলওয়ে আরোহণে হঠাৎ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে, এ প্রভেদ সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারা যায়! কিন্তু ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের প্রথম সন্দর্শনে, আরও একটী প্রভেদ দেখিয়াঅপর দেশবাসী আগন্তুককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়!সে প্রভেদ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে! একজন বাঙ্গালীবিদ্বেষী পঞ্জাবির মুখে একবার শুনিয়াছিলাম যে, অল্পকাল পূর্ব্বেই বাঙ্গালাদেশ গহন কানন-বেষ্টিত সাগরতট ছিল। সেই কাননমধ্যে এক সম্প্রদায় অসভ্য, অর্দ্ধ উলঙ্গ বর্ব্বর জাতি বাস করিত! বিদেশীয় রাজার উদ্যোগে সেই কানন মনুষ্যের বাসোপযোগী হইল ও সেই অসভ্য সম্প্রদায় ক্রমে বাঙ্গালী নাম ধারণ করিয়া সভ্যতার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল! কথাটী ঈর্ষাপরবশ, ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যক্তির কপোলকল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ও বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ দেখিয়া এ কথার প্রতিবাদ করিতে লজ্জা করে। রেলওয়ে হইতে অবতরণ করিয়া অনেক দিনের পর কলিকাতার প্রথম দর্শন লাভ করিয়া পবিত্র সলিলা গঙ্গার পর পারে যাইয়া দেখিয়া বোধ হয় আরও অনেকে আমার মত কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবেন। গঙ্গাস্নান বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান পুণ্য কর্ম্ম! সুতরাং দেখিলাম গঙ্গাতীরে প্রভাত-কালে শত শত স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছে। যুবতীগণের অপ্রতুল নাই! সেই শতজাতিপরিবৃত, সহস্রলোকাকীর্ণ রাজধানী মধ্যে গঙ্গাতীরে গঙ্গার শুভ্র সলিলে দেহ বিধৌত করিয়া, গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যে সূক্ষ্ম বসনকে সূক্ষ্মতর করিয়া, বঙ্গীয় রমণীর উলঙ্গিনী মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা অথবা ধ্যানমগ্না। এই জন্যেই কি বাঙ্গালী পশ্চিম প্রদেশের লোককে ছাতু খোর ও খোট্টা বলিয়া উপহাস করে! কথাটী কিছু নূতন নহে, অনেক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, অনেক সাময়িক পত্রের স্তম্ভে অনেক বার দেখিয়া ছিলাম, এবং সেই জন্যই বোধ হয়, অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিলাম।

কলিকাতার যে পল্লীতে তোমার বন্ধু থাকেন, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। শুনিলাম, হাবড়া ষ্টেশন হইতে সে স্থান দুই ক্রোশ। একখানি অতি

জরাজীর্ণ Second class উপাধিধারী হ্যাকনি গাড়ী ভাড়া করিয়া, অন্য প্রদেশে যাহা দিলে সেই প্রকার গাড়ী পাওয়া যায়, তাহার চতুর্গুণ ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইয়া, রেলওয়ের মুটিয়াদিগকে অনেক কষ্টে পশ্চাৎ ধাবমানবৃত্তি হইতে নিরস্ত করিয়া, সেই অপূর্ব্ব বিমানের দোদুল্যমান আসনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া, তোমার বন্ধুর আবাসস্থানের দিকে চলিলাম। দুই ক্রোশ পথ,সুতরাং অন্যূন তিন ঘণ্টা লাগিল। গাড়োয়ান হিন্দুস্থানী কিন্তু বাঙ্গালার জল বায়ু পাইয়া যে, তাহার মেজাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা তাহাকে একটু শীঘ্র গাড়ী হাঁকাইতে অনুরোধ করায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। পাছে তাহার সহিত পুনরালাপে প্রবৃত্ত হইলে, গাড়ী হইতে নামাইয়া হরিণ-বাড়ীর ফাটক দেখাইয়া দেয়, এই ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া, বিশঘণ্টা রেলগাড়ীতে থাকা অপেক্ষা কলিকাতার Hackney রথে তিন ঘণ্টা অবস্থান কত অধিক সুখকর, তাহা বিলক্ষণ রূপে উপলব্ধি করিয়া, বেলা প্রায় আটটার সময় তোমার বন্ধুর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম! বাটীর দ্বারদেশে একজন চাপরাশ বাঁধা দ্বারবান দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবু বাটীতে আছেন কি না? বাবু কথাটী শুনিয়া দ্বারবান একটু বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি তোমার বন্ধুর নাম বলিলাম। দ্বারবান হাস্য করিয়া বলিল "তোমার বাড়ী কোন্ দেশে? মিষ্টার মুকার্জি বললেই তো কোন গোল থাকে না! তা তুমি কি মিষ্টার মুকার্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? কার্ড আছে তো?"

আমি বলিলাম "আমার সঙ্গেতো কার্ড নাই!"

দ্বারবান্ বিরক্ত হইয়া বলিল "বিনা কার্ডে অপরিচিত লোকের ভিতরে যাইবার হুকুম নাই!"

আমি বলিলাম "আমার কাছে একখানি চিঠি আছে, এই খানি মিষ্টার মুকার্জিকে দিয়ে এস।"

এই বলিয়া তোমার লিখিত পত্রখানি দিলাম। দ্বারবান একটু ইতস্ততঃ করিয়া পত্র লইয়া ভিতরে গেল। একটু পরেই মিষ্টার মুকার্জি বাহিরে আসিয়া আমার করগ্রহণ করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সে দিন রবিবার। মিষ্টার মুকার্জি কয়েকজন বন্ধুর সহিত (breakfast) ব্রেকফাষ্টের উদ্যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একখানি গোল টেবিলে টিনের রেকাবি, পেয়ালা, ও কাঁটা চামচ প্রভৃতি সজ্জিত হইয়াছে। তাহার চারি পার্শ্বে আট দশ জন হাফ্ মিষ্টার হাফ্ বাবু বেশধারী ও চারি জন হাফ্ মিসেস ও হাফ্ বৌ ঠাকুরাণী মণ্ডলাকারে বিরাজ করিতেছেন। পশ্চাতে একজন শ্বেতশ্মশ্রু,

ইজের চাপকান পরা বাবুর্চি এক হস্তে একটী বৃহৎ টীপট ধারণ করিয়া অপর হস্তে বাদশাহী আমলের সখের দাড়ি চুমরাইতেছেন। মিষ্টার মুকার্জি আমাকে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে এই লেডী মিসেস মুকার্জি। মিসেস মুকার্জি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কর প্রসারণ করিলেন। তিনি যে Shake hand করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহা আশা করি নাই, সুতরাং বুঝিতে পারি নাই। ভাগ্যক্রমে একজন মিষ্টার আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিলেন। আমি অগত্যা তাঁহার করস্পর্শ করিয়া Shake hand করিলাম। মিসেস তখন গম্ভীর ভাবে এক খান চেয়ার দেখাইয়া দিয়া আমাকে বসিতে অনুমতি করিলেন। আমি মস্তক অবনত করিয়া এক পার্শ্বে বসিলাম। তখন সেই ইজের চাপকান-ধারী শ্বেতশ্মশ্রু পুরুষ আধ ঝলসান কুক্কুট প্রভৃতি কয়েক প্রকার উপাদেয় সামগ্রী বাহির করিয়া পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। মিষ্টার ও মিসেসগণ তখন ঔৎসুক্য সহকারে কাঁটা চামচ গ্রহণ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, লেডী চতুষ্টয় প্রথমে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার মুকার্জি উঠিয়া আসিয়া আমার কাণে কাণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজস্থানে গিয়া বসিলেন। আমি দূরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রমসংহারী আলবোলার রসাস্বাদনে নিমগ্ন রহিলাম। ব্রেকফাষ্ট সমাপনান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের মতে দুইটী বিষয় নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহাদের সংস্থাপিত সনাতন ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার, দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী মাত্রকেই যথাসাধ্য ইংরাজ সাজাইতে চেষ্টা করা। তাঁহাদের মুখে বারম্বার শুনিলাম যে, এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে আর আমাদের সমাজের কোন মতেই শ্রেয়ঃ নাই। এই সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারকগণের দ্বারা এ পর্য্যন্ত ভারতের কি উপকার সাধিত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কোন্ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি এত দিন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাঁদের দ্বারা সমাজের যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি অপর পত্রে বলিবার চেষ্টা করিব। মনে করিও না আমি তোমার বন্ধুর নিন্দা করিতেছি। তোমাকে এই পত্র লিখিবার পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল, তিনি যে পণ্ডিত ও সদাশয় সে বিষয়েও সংশয় করি না। সে যাহা হউক এই দুই সপ্তাহ কলিকাতায় থাকিয়া অনেক দেখিলাম অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিব্রাজক।

জড় ও শক্তি।

"The great and indeed only ultimate source of our knowledge of native and its laws is experience; by which we mean not the experience of one man only or of one generation, but the accumulated experience of all mankind in all ages, rgistered in books or recorded by tradition"—Herselel.

"Man, who is the servant and interpreter of nature, can act and understand no farther than he has, either in operation or in contemplation, observed of the method and order of nature."—

ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়কে এক প্রকার অভ্রান্তই বলা হইয়াছে। ফলে ইহা অন্যায্য কথা নহে। ইন্দ্রিয়বোধে ভ্রান্তি থাক আর নাই থাক, তদ্ভিন্ন আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। উহাই সর্ব্ব জ্ঞানের মূল। যথায় ইন্দ্রিয় বোধ নাই, তথায় কোন জ্ঞানই নাই। ভাল হউক আর মন্দই হউক, যোগ্য হউক আর অযোগ্যই হউক, পূর্ণ হউক আর অপূর্ণই হউক, সত্য হউক আর অসত্যই হউক, ইন্দ্রিয় বোধ দ্বারা আমাদিগের সকল জ্ঞানই অর্জ্জিত, মার্জ্জিত, সংস্কৃত ও পরিস্কৃত হইয়া থাকে। বস্তুর রূপ (Phenomena.) ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। তাহার স্বরূপ বা নির্গুণ সত্তায় আমাদিগের কোনও অধিকার নাই। যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর হইবার নহে, তাহা জ্ঞানাতীত; আমাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, কল্পনা প্রভৃতির তথায় অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। যে বস্তু যে প্রকারে আমাদিগের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়, আমরা তাহাকে সেইরূপেই জানি এবং সেই ভাবেই আলোচনা করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত করিবার সঙ্গতি নাই। বস্তুর রূপভেদ করিয়া স্তরান্তরে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশা করা প্রাগল্‌ভ্য মাত্র। সে অসাধ্য সাধনায় প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত নিষ্ফল। হাতে ছায়া ধরা আর মনে অবস্তু আনা সমান সম্ভবপর। সসীম-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্য দূরের কথা, অনন্ত-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট যদি কোন লোক থাকিত, তাহারও বস্তুর নির্গুণ সত্তা উপলব্ধি হইতে পারিত না। তাহাকেও সেই প্রত্যক্ষের উপর সকল জ্ঞানের জন্য নির্ভর করিতে হইত। তাহারও বস্তুজ্ঞান ইন্দ্রিয়বোধমূলক হইত। আর কেমন করিয়াই বা না হইবে? সে নয় বস্তুর অনন্ত রূপই (অর্থাৎ যেমন তাহার অনন্ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইত)

জানিতে পারিত; অবস্তু বা নির্গুণ সত্তা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহা কিরূপে জানিত ?

অতীন্দ্রিয় বিষয় চর্চ্চা করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের বিষয়কেই বস্তু বলে; যাহা ইন্দ্রিয়-বিষয় নহে তাহা বস্তু নহে। ইন্দ্রিয়াতীত কথা মাত্রই অবাস্তবিক। অতীন্দ্রিয় অবস্তু, এবং অবস্তু অতীন্দ্রিয়। এদুই একই কথা। অবস্তু অনালোচ্য। ইন্দ্রিয়-বোধের বাহিরে আলোচনার সঙ্গতি বা সম্ভব কোথায় ? ফলে ইন্দ্রিয়-বিষয় ব্যতীত কোন বস্তুও নাই—কোন অস্তিত্বও নাই। মনে যাহার কোন ধারণাই নাই তাহা আছে বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? আমাদিগের পক্ষে তাহা থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। যাহার কোন কিছু জানি না, তাহা আছে বলিতেও পারি না। 'তবে নাই বল কিসে'? তাহাও বলি না। 'তবে কি বলিবে' ? অমন আকাশকুসুম লইয়া কোন আলোচনাই করিব না। আর কি রূপেই বা করিব ?—কোন্ অধিকারে করিব ? যাহা ইন্দ্রিয়াতীত আমার পক্ষে তাহার অস্তিত্ব কোথায় ? অপ্রত্যক্ষ অবস্তুর মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে ? তবে কি ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিবে না! নাপার্য্যমানে বলিব 'থাকে থাকুক আর না থাকে না থাকুক'—আমার তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। 'এরূপ প্রকৃতিতে জ্ঞানের উন্নতি কিরূপে সম্ভব ? অনুসন্ধানে এরূপ হতোদ্যম হওয়া সুবোধের কার্য্য নহে। যদি সকল প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া যায় তাহা হইলে পরপর মনুষ্য নামের গৌরব লোপ পাইবারই সম্ভাবনা' ? আমরা কিছু সকল প্রশ্নের এরূপ উত্তর বিধেয় বলিতেছি না। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়ে এইরূপ ঔদাস্যই যুক্তিসঙ্গত। 'যদি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ক্রমে জ্ঞানোন্নতির সহিত জ্ঞাত ও জ্ঞেয় হয়, তোমার এপ্রকার অনুসন্ধানে বৃথা বিরোধ কেন ? তুমি অগ্রে থাকিতে কোন্ অধিকারে অসাধ্য বলিতেছ !—তোমার এ ধৃষ্টতা কেন ? তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ যে মনুষ্যের জ্ঞানের চরম সীমা দেখিতে পাইতেছ ? যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, সত্যানুসন্ধানে এপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে'। অবশ্যই অনুসন্ধানে হন্তারক হওয়া অতি জঘন্য কর্ম্ম বটে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অনুসন্ধানের কি কোন প্রণালী নাই ? যে দিকে ইচ্ছা মনের বেগভরে ছুটিলেই কি সত্যের অনুসন্ধান হইয়া থাকে ? চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি করাই কি অনুসন্ধান-রীতি ? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে সত্যান্বেষণে কে অনাদর করিতে পারে ? বৃথা পণ্ডশ্রমে আমরা বিমুখ। অজ্ঞাত জ্ঞাত হইতে পারে, অজ্ঞেয় কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না। জ্ঞাত হইতে ধীরে ধীরে অজ্ঞাত বিষয়ে যাওয়া ন্যায়সিদ্ধ বটে; কিন্তু অজ্ঞাত হইতে অজ্ঞেয় বিষয়ে যাইবার চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র। যাহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছ, আবার

কোন্ মুখে তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পার ? যদি তাহাই করিবে তো তাহাকে 'অজ্ঞাত' বল—'অজ্ঞেয়' বলিও না। মনে কর অবস্তুর আলোচনায় নিবিষ্ট হইলাম, কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ঊর্দ্ধসংখ্যায় কথায় কথায় তর্কচ্ছলে কেহ না হয় বলিলেন 'বস্তুর নির্গুণ সত্তা আছে; কেহ বলিলেন 'নাই'। প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রমাণ নাই ? উভয়েরই কোন প্রমাণ দর্শাইবার শক্তি নাই—উভয়ই অন্ধ। যুক্তির অবস্তুতে যাইবার ক্ষমতা নাই। শুদ্ধ ন্যায়ের ছটা—'কথা কাটাকাটি' সার হইবে। এতদতিরিক্ত কিছুই নহে। এরূপ কথার কথাকে যদি আলোচনা বলে, জ্ঞান বলে, বিদ্যা বলে, সত্যানুসন্ধান বলে, তাহা হইলে 'এ ঢেঁকির কচ্‌কচি' যত শীঘ্র লোপ পায়, ততই ভাল। ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই, সাধনা নাই, সিদ্ধি নাই। বৃথা বাদানুবাদে জগতের কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না। এ বাক্‌বিতণ্ডায় কাহারও কোন জ্ঞানোন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না। বিদ্যার যাহা উদ্দেশ্য এবং যেজন্য বিদ্যার আবশ্যক, ইহাতে তাহার ছায়া মাত্রও নাই। এপ্রকার বাগাড়ম্বরে বুদ্ধির অপচয় ও ব্যভিচার মাত্র হইয়া থাকে। অধিকন্তু যিনি অবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি বস্তুর ছায়াবৎ কি-জানি কেমন-কি মনে ধরিয়া লন। তাঁহার ধ্যানে বা কল্পনায় নির্গুণ সত্তা কখনই আসিতে পারে না। অস্ফুট, ক্ষীণজ্যোতিঃ, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, এ-নয়-ও নয়-সে-নয়, অথচ এ-মত ও-মত সে-মত, অন্ধকার-ভাব, একটা কেমন-কেমন, ধারণা তাঁহার মনে থাকেই থাকে। সে প্রকার ধারণা অবশ্যম্ভাবী—এড়াইবার উপায় নাই। কেননা, প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন ধারণা, কল্পনা, বা ভাবনা সম্ভাবিত হইতে পারে না। মনুষ্য-মনের ধারণা কল্পনা বা ভাবনা বিশ্লেষ করিলে সেই প্রত্যক্ষেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয় সত্তা বরং 'আছে' অপেক্ষা 'নাই' বলাই শ্রেয়ঃকল্প; যে হেতু কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই; যখন দেখা যাইবে তখন বলা যাইবে 'আছে'। ফলে আমরা সকল বিষয়ই এইরূপ মীমাংসা করিয়া থাকি। কেহ যদি বলেন 'আমি ঘোড়াকে উড়িতে দেখিয়াছি', লোকে অমনি বলিবে 'ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে—ইহা মিথ্যা কথা'। যিনি 'দেখিয়াছেন', বলিতেছেন তিনিও সেই প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভর করিতেছেন, তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষীভূত নহে বলিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতেছে না। ইহা কিছু অন্যায় কথা নহে—এইরূপই হইয়া থাকে এবং হওয়াই উচিত। এস্থলে সেই প্রত্যক্ষই সিদ্ধান্তের মূল। একজন বলিতেছেন তিনি 'দেখিয়াছেন'। সাধারণের প্রত্যক্ষ হয় নাই বলিয়া সকলে বলিতেছে 'তুমি দেখ নাই—মিথ্যা বলিতেছ, অথবা তোমার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে'। দেখ, এস্থলে লোকে স্পর্দ্ধা করিয়া কতদূর যাইতেছে;

তাহার কথাকে মিথ্যা বলিতে সাহস পাইতেছে, তথাচ তাহার কথিত প্রত্যক্ষীভূত বিষয়েও বিশ্বাস করিতেছে না। তবে মনে কর, যেস্থলে প্রত্যক্ষ নাই এবং হইতেও পারে না এবং হইবারও লেশ মাত্রও কোন সম্ভাবনা নাই; যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানাতীত, বুদ্ধ্যাতীত, নির্গুণ, অবস্তু, তাহা যে লোকে 'নাই' বলিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বরং সেইরূপ 'নাই' বলাই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। কেননা, মনুষ্যের যাহা কখনই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইবার নহে, তাহাকে কোন্ অধিকারে 'আছে' বলা যাইতে পারে? 'আছে' কি 'নাই' জানি না,একথা বলায় হৃদয়ের বিশেষ প্রাশস্ত্য প্রকাশ পায় বটে; তত্রাচ 'আছে' অপেক্ষা 'নাই' বলা ন্যায়ানুমত, বিচারসঙ্গত এবং আমাদের স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম। 'তবে কি যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তাহাই প্রমাণ্য, আর ইন্দ্রিয়ভ্রমও কি তবে প্রমা জ্ঞান? যাহা যেমন দেখিব, তাহাকে কি তবে তেমনি ভাবে ভাবিব'? এব্যতীত আর আমরা কি করিতে পারি? ইহাই মনুষ্যোচিত কার্য্য।

প্রথমতঃ 'ইন্দ্রিয়ভ্রম' কথাতেই সমগ্র মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলা হইতেছে; নতুবা ভ্রমকে ভ্রম বলে কে, এবং কোন্ অধিকারেই বা বলা যায়? ইন্দ্রিয়বোধ যে মোটামুটি অভ্রান্ত,ইহা শুদ্ধ কথাতেই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ মায়াবাদী ব্যতীত ইহা সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। মনে কর মৃগতৃষ্ণিকা। ইহা যে দৃষ্টিভ্রম, একথা বলিল কে? কই দৃষ্ট জল মাত্রই যে ভ্রম, একথা তো কেহই বলে না। তবে শুদ্ধ মৃগতৃষ্ণিকাকে ভ্রম বল কেন? ইহা যে ভ্রম, তাহা হয় দর্শক আপনাআপনিই জানিয়াছেন, নয় দশ জনের জ্ঞানে (প্রত্যক্ষ জ্ঞানে) জানা গিয়াছে? এব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর প্রত্যক্ষ ব্যতীতই বা উহার প্রমাণ কি? শুদ্ধ তর্কে তাহার কোনই মীমাংসা হইতে পারে না। তবে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা উক্ত দৃষ্টিভ্রমের কারণাদি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহাও পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর পারম্পর্য্যের ধারণামূলক; অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব পারম্পর্য্যের যে ছবি মনে আছে, তাহাকে সাজাইয়া বর্ত্তমান পারম্পর্য্যের মিলন নির্দ্দেশ করাই কার্য্যকারণ অনুসন্ধানের নিয়ম। যথায় ধূম তথায় অগ্নি, পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষজ্ঞান; আজ ধূম দেখিয়া অগ্নি নির্দ্দেশ করিলাম, অর্থাৎ মনে অগ্নি ও ধূমের পারম্পর্য্যের ছবি সাজাইলাম; এমন কি, হয়ত কোয়াসাকেই ধূমভ্রমে অগ্নির সমবায়ত্ব অনুমান করিয়া কার্য্য কারণ মিলাইয়া দেখিলাম; ইহাকেই বিচার বা তর্ক করা (Reasoning.) বলে। যথা হউক, অযথা হউক, বিচার বা তর্কের এই ভাব। ফলে যাহাকে ইন্দ্রিয়ভ্রম বলা যায়, তাহা অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ, এবং তজ্জনিত অনুমান ভ্রম বই আর কিছুই নহে। অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রমে

এদুইটীই আছে। এস্থলে প্রত্যক্ষও অস্পষ্ট, অনুমানও ভ্রান্ত। মৃগতৃষ্ণিকা দূর হইতে জলাশয় বোধ হইল—অর্থাৎ জলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃতি নয়নগোচর হইল। ইহাতেও ঐ দুইটী আছে। তৃষাতুর পথিক ক্রমে জলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন অন্ধকার বশতঃ অস্পষ্ট দৃষ্টিতে রজ্জু সর্পবৎ বলিয়া বোধ হইয়াছিল,ইহাতেও দূর বশতঃ আলোকে রিফ্রাক্সনে অবিকল জলবৎ বর্ণ বোধ হইয়াছে, এবং সেই জলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃতির (Surface.) সহিত জলের ধারণা মালা পর পর অনুমানে আসিল। সেই অনুমানগুলিও ভ্রমাত্মক। পথিক দূরদৃষ্ট জলাশয় সন্নিধানে আসিল—দেখিল, তাহা পুনশ্চ তত বড় দূরেই রহিয়াছে; যত সে অগ্রসর হয়, সে জলাশয়ও ততই অন্তরিত হইতে থাকে। এইবারে তাহার জ্ঞান জন্মিল, যে উহা জল নহে, চলিত কথায় যাহাকে দৃষ্টিভ্রম বলে উহা—তাহাই কোনরূপ হইবে। ফলে দৃষ্টির ভ্রম হয় নাই। চক্ষে জলবর্ণই প্রতীয়মান হইয়াছিল। দূরপ্রযুক্ত দৃষ্টি সুস্পষ্ট হয় নাই, কতকটা জলসদৃশ রর্ণকে জলবর্ণ বলিয়াই ধরা হইয়াছিল। সে যাহাহউক, কোন ইন্দ্রিয় বিশেষ ক্বচিৎ ভ্রান্ত বা অসমর্থ হইলেও অপর ইন্দ্রিয়দ্বারায় তাহার ভ্রম সংশোধিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ অর্থে সমগ্র মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়সমষ্টির অনুভূতিকে বুঝাইবে। তাহা অভ্রান্ত। তাহাতে ভ্রম থাকিলে অভ্রান্ত বলিতে হইবে। যেহেতু সে ভ্রমের নিরাকরণ সম্ভাবিত নহে—এবং তাহাকে ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ করিবারও আমাদিগের সঙ্গতি নাই। সুতরাং যদি সে ভ্রমই হয় তথাচ তাহাই আমাদিগের সত্য ও প্রমাজ্ঞান। এবং সত্যও সাম্বন্ধিক (Relative.) ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ই আমাদিগের জ্ঞানের ও সত্যের সম্বল। তদ্ব্যতীত আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই—সত্যও নাই। তাহাতে সত্য, মিথ্যা, যাহা কিছু আছে, তাহাই আমাদিগের জ্ঞানকাণ্ড। আমরা যাহাকে জগৎ বা প্রকৃতি বলি তাহা সেই প্রত্যক্ষের সামগ্রীমাত্র।

অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম, প্রকৃত দৃষ্টিভ্রম নহে। ইহা দৃষ্টিভ্রম বলিয়া বহু দিবসাবধি প্রচলিত আছে। আমাদিগের দর্শনে এটী একটী দৃষ্টিভ্রমের প্রধান দৃষ্টান্ত। ফলে রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম দৃষ্টিভ্রম নহে। ইহার মূলে অস্পষ্ট দৃষ্টি—অর্থাৎ, যাহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাহার মাত্রায় ন্যূন। প্রথমতঃ রজ্জুকে অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যায়,তাহার আকার প্রকারে সর্প অনুমান হইয়াছিল—দৃষ্ট হয় নাই। রাত্রি—অন্ধকার—ইহার সহিত নানা প্রকার ধারণামালা মনে জাগরূক আছে; সর্পও তন্মধ্যে একটী;—অর্থাৎ, রাত্রে সর্প বাহির হয় বা দেখা যায়। অন্ধকারে রজ্জুর লম্বা ও গোলাকৃতি অস্পষ্ট অনুভূত হওয়ায় সর্পভীত পথিকের মনে স্বতঃই সর্প (অস্ফুটদৃষ্ট রজ্জুর আকার

প্রকার হইতে—অনুমানিক জীব, সরিসৃপ, বিষাক্ত প্রভৃতি ধারণামালা) মনে আসিয়া জুটিল। সেই অনুমান ভ্রমেই এতাদৃশ ভ্রান্তি জন্মে। যাহার অন্ধকারের সহিত বা রাত্রের সহিত প্রেতাদির ধারণামালা মনে আছে; অর্থাৎ, মনে কুসংস্কার বশতঃ এমন বিশ্বাস যে, অন্ধকারে প্রেতাদি বেড়ায়, তাহার রাত্রে আপনার ছায়ায় প্রেত ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাও সেই অনুমানের ভুল—দৃষ্টির নহে। একটী ছেলেদের খেলাইবার মার্ব্বল বামহস্তের পাতায় রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর উপর মধ্যমাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা তাড়াতাড়ি রগড়াইলে দুইটী মার্ব্বল অনুভূত হয়। 'ইহাকে কি বলিবে?—একি ইন্দ্রিয়-ভ্রম নহে'? না—ইহাকেও অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়বোধ বলিব। যেহেতু দুইটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহাকে এত দ্রুতস্পর্শ করিতেছে যে তাহাতে দুইটীরই অস্ফুট অনুভূতি হইতেছে, এবং তাড়াতাড়ি রগড়ান প্রযুক্ত দুএর কাহারই স্পষ্ট অনুভূতি হইতেছে না। ফলে এসকল ইন্দ্রিয়ভ্রম হইলেও একেন্দ্রিয়গত; তাহাকে আবার ইন্দ্রিয়দ্বারায় পরীক্ষা বা সংস্কার করিয়া লওয়া যায়। চক্ষে দেখিলাম মার্ব্বল একটী বই দুইটী নহে। যদি এমন কোন ভ্রম থাকে যে সকল মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয় দ্বারায় নিরাকৃত না হয়, তাহাকে সত্য বলিয়াই মানিব—তাহাকে আর ভ্রম বলিবার কোন অধিকার নাই। আর শুদ্ধ যে ইচ্ছা পূর্ব্বক মানিব, এমন নহে। আমাদিগের সেইরূপ মানিতেই হইবে—আমরা সেইরূপ মানিতেই বাধ্য। তদ্ব্যতীত আমাদিগের আর অন্য গতি নাই। ফলে আমরা এইরূপ করিয়াই থাকি এবং করিতেও থাকিব। তাহার আর অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত মনুষ্যের গত্যন্তর নাই। ইহাই জ্ঞান, ইহাই সত্য, ইহাই সার ইহাই সনাতন। মনুষ্য জগতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে, হইতে থাকিবে এবং হওয়াই উচিত ও অবশ্যম্ভাবী। চক্ষের দোষ স্পর্শে সংস্কার হইবে, নাসিকার ভ্রম আস্বাদে যাইবে। এরূপে সংস্কার কার্য্য নিত্যই চলিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেই ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়িয়া শুদ্ধ তর্কে বস্তুর যথাযথ মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহাদের পদস্খলন না হইবার সম্ভাবনা কোথায়? প্রত্যক্ষ ছাড়িলে একবারে প্রমাণ ছাড়া হইল; কেন না, ঘটনাবলির সহিত প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্মুখীন করিয়া প্রতিপদে মিলাইয়া না দেখিলে সত্যত্ব সপ্রমাণ কিরূপে হইবার সম্ভাবনা? ডাক্তার এবারক্রম্বির মনোবিজ্ঞানে কয়েকটী সুন্দর দৃষ্টিভ্রমের উদাহরণ আছে, তাহার একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যখন ইন্দ্রিয়-ভ্রম বলিয়া স্বতন্ত্র কথা আছে, তখন মূলে ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত স্বীকার করা

হইতেছে। নতুবা সে ভ্রম কি প্রকারে সাব্যস্ত হইবে? ভ্রমও প্রত্যক্ষে ভ্রম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তাহার আর অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ নাই। এই জন্য ইন্দ্রিয়কে এক প্রকার অভ্রান্ত বলা হইয়াছে। যদি ইন্দ্রিয়বোধ সততই পরিমাণে-অধিকতর ভ্রান্তই হয়, তাহাহইলে সে ভ্রান্তির মীমাংসা হইবে কোথায়? এ অবস্থায় ভ্রান্তির মীমাংসা হইতে পারে না। তাই বলি ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত। বস্তুমাত্রই যেমন প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে আমরা সেইরূপই ভাবিয়া থাকি। ফলে নিশি পাওয়া (Somnombuliom.) মত্ততা (Insanity) জড়তা (Idiatcy) বিকার প্রভৃতি রুগ্নাবস্থা। এসকল অবস্থাতেও সেই জড়শক্তির ছবির অতিরিক্ত যাইবার সাধ্য নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ অর্থে সমস্ত মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়গণের সুস্থাবস্থার অনুভূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্বপ্নাবস্থার কথাও অনেক পরিষ্কার করা হইয়াছে। এ অবস্থাতে মনে জড়শক্তির ছবির নূতন মিশ্রণ অনুভূত হয় মাত্র। তদতিরিক্ত কিছুই নহে। তাহাও সেই জড়শক্তি মূলক—প্রত্যক্ষগত কাণ্ড। তাহাতেও বস্তুর ছায়া আছে। অবস্তুসম্ভাবিত কিছুই নাই। স্বপ্নে অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অতীন্দ্রিয় বিষয় কিছুই অনুভূত হয় না।

ডাক্তার এবরক্রম্বি বলেন, একজন বৃদ্ধের বয়স ৮০ বৎসর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, দেখিতে নীরোগী। প্রায় প্রত্যহই বার বৎসর কাল দৃষ্টিভ্রম হইত। তিনি সম্মুখে সততই মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। উপরার্দ্ধ অর্থাৎ মাথা, মুখ, প্রভৃতি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন; নিম্নার্দ্ধ অপরিষ্কার মেঘাচ্ছন্নমত বোধ হইত। মূর্ত্তিগুলি প্রত্যহ একরূপ লক্ষিত হইত না বটে; কিন্তু তন্মধ্যে প্রত্যেকটীই তিনি এমন কতশতবার দেখিয়াছিলেন। যেসকল মূর্ত্তি তিনি এইরূপ প্রত্যহ দেখিতে পাইতেন, তাহার মধ্যে একজন বৃদ্ধা রমণী যেন সহাস্য বদনে তাঁহারসহিত প্রায়ই কথা কহিতে আসিত। এসকল ভ্রমদৃষ্ট মূর্ত্তি তিনি পূর্ব্বে কোথাও যথার্থ দেখিয়াছিলেন, কি না, তদ্বিষয়ে কোনও বিশেষ স্মরণ ছিল না। তবে সময়ে সময়ে তিনি উহাদের মধ্যে আপনার মুখও দেখিতে পাইতেন। উহা ক্রমে যৌবনাবস্থা হইতে প্রৌঢ়ে এবং তৎপরে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইত। তিনি চক্ষু চাহিলেও ঐ মূর্ত্তিগুলি যেমন দেখিতে পাইতেন, চক্ষু মুদিলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেন। অনেক সময় তিনি সেই সকল মূর্ত্তি দেখিতেও অভিলাষও করিতেন। উহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত। ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষে হাত বুলাইলে বা উপর্য্যুপরি শীঘ্র শীঘ্র চক্ষু মুদিত ও উন্মীলিত করিলে মূর্ত্তিগুলি সরিয়া যাইত। দিবা রাত্র, কি আলোকে কি আঁধারে সর্ব্বসময়ই তাঁহার এই প্রকার অনুভূত হইত। একদা তিনি সহসা তাঁহার মৃতপত্নীকে দেখিতে পাইলেন।

তাঁহাকে যেন পশ্চাৎ আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। বৃদ্ধ শশব্যস্তে তাহার পশ্চাৎ ছুটিলেন। মূর্ত্তি জানালার মধ্য দিয়া চলিল—বৃদ্ধও তথা দিয়া যাইতে গিয়া উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন; কিন্তু তাহাতেও ক্ষান্ত হন নাই। পুনশ্চ উঠিয়া সেই মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ক্রমে উদ্যানমধ্যে এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যথায় তাঁহার পত্নী জীবিতাবস্থায় সতত বিচরণ করিতেন। বৃদ্ধ তথায় নিজ অনুচরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার স্ত্রী এদিকে কোথায় গেলেন? অনুচর তাঁহার স্ত্রী বহুদিবস হইল মৃত্যু হইয়াছে, একথা বলায়, তাঁহার যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিল, এবং তিনি ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মস্তিষ্কের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াই ইহার কারণ বলিতে হইবে। এঅবস্থায় বৃদ্ধের মনের প্রমাতৃগত ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং দর্শনাপেক্ষা ভাবনা (Idiation) দিবারাত্র অধিক পরিমাণে চলিত। আর একটী ভদ্রলোকও আজীবন এইরূপ ভ্রম দেখিতেন। এমন কি পথে কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি গাঢ় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ নিরীক্ষণ করিতেন, পরে স্পর্শ না করিয়া, বা বন্ধুর কণ্ঠস্বর না শুনিয়া কোন সম্ভাষণই করিতেন না। তিনি অগ্রে স্পর্শ না করিলে বা সেই দৃষ্ট লোকের কথা না শুনিলে দৃষ্টব্যক্তি ভ্রম বা সত্য জানিতে পারিতেন না। এস্থলে আমাদিগের কোনও টিপ্পনীর আবশ্যকই নাই। এখানেও একটী ইন্দ্রিয়ের ভ্রম অপরটীর দ্বারায় সংশোধিত হইতেছে।

এসকল তো ভ্রমের কথা গেল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ যে সুনীল গগনমণ্ডল তোমার নয়নগোচর হইতেছে, উহা কি আকাশের বর্ণ? আকাশের কি বর্ণ আছে? না। উহা বায়ুর বর্ণ। কই বায়ুর বর্ণ নিকটে তো কিছুই অনুভূত হয় না। বায়ুকে ত্বাচপ্রত্যক্ষ বস্তু বলিয়া জানা আছে; বায়ু যে নয়নগোচর হয় একথা আজ নূতন শুনিলাম। যাহা হউক, ইহার ব্যাখ্যা কিরূপ করিবে? কেন?—ইহাতো সহজ কথা;—যেরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে সেইরূপই বলিব—ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারি না। বলিব, বায়ুর বর্ণ নিকটে অনুভূত হয় না, দূর হইতে আলোকের রিফ্রাক্সন্ হেতু নীল দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ জলের কথা তুলিব; জল নিকটে এক প্রকার স্বচ্ছ বর্ণবিহীন পদার্থ; কিন্তু দূর হইতে নীলিম অনুভূত হয়। সুনীল সাগর কবির কল্পনার সামগ্রী নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহাপেক্ষা আর অধিক কোন ব্যাখ্যাই সম্ভবপর নহে। যেমন যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহাকে সেই রূপই বলাযায়; অপর কিছু বলিবার আবশ্যক ও সঙ্গতিও নাই। আচ্ছা মনে কর, একজন একটী জলন্ত মশাল বেগে ঘুরাইতেছে, এবং

তোমার তাহাকে চক্র স্বরূপ একটী অগ্নি বোধ হইতেছে। ফলে সেতো অগ্নিচক্র নহে। তোমার ঐরূপ বোধ হইতেছে মাত্র। এস্থলে যেমন ইন্দ্রিয়বোধ সেরূপ বলিতে গেলে, উচিতমত উহাকে অগ্নিচক্র বলিতে হয়। তুমি কি উহাকে তবে অগ্নিচক্র বলিয়া ধরিবে? না। তবে কি বলিবে? প্রত্যক্ষে যাহা বলিবে, আমি কথায় তাহার মর্ম্মই অনুবাদ করিব। বলিব, জলন্ত মশাল ঘুরাইলে অনেকটা অগ্নিচক্রবৎ অনুভূত হয়। এদুইটীই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। জলন্ত মশাল হাতে ধরিতেও দেখিয়াছি, ঘুরাইতেও দেখিয়াছি। যখন স্থিরভাবে থাকে, তখন যেরূপ দেখায় তাহাও বলিব, ঘূর্ণিত অবস্থায় যেরূপ হয় তাহাও বলিব; অন্যথা করিব কেন? তবে এক মশালে চক্রবৎ অনুভূত হয় কিরূপ? তাহা এইরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। মশালটী প্রথম ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া দেখিব, সেই একটী মশালই ঘুরিতেছে—কেন্দ্রীভূত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে। ক্রমে তদপেক্ষা বেগে ঘুরাইয়া দেখিব, কেমন দেখায়? তখন সেই একই মশাল চক্রের চেয়ে আট দশ স্থানে যেন আট দশটী মশাল জলন্তভাবে চকিত মত প্রতীয়মান হইতেছে; ক্রমে আরও যত বেগ সহকারে ঘুরাইলাম, দেখিলাম অগ্নিচক্র স্বরূপ দৃষ্ট হইল; কিন্তু স্থিরজ্যোতিঃ বা সুস্পষ্ট নহে। এস্থলে সাব্যস্ত হইল দ্রুততা প্রযুক্ত, অর্থাৎ অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হেতু, সেই একটী জলন্ত মশাল চক্রের সকল বিন্দুতে (Points.) প্রায় এক সময়ে প্রতীয়মান হইতেছে। ফলে একবিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে আসিতে যে সময় লাগিতেছে তাহা সুচারু রূপে অনুভূত না হওয়া পারম্পর্য্য সম্বন্ধের (Succession.) পরিবর্ত্তে একদেশবর্ত্তী সম্বন্ধ (Co-existence.) অনুভূত হইতেছে। আর বস্তুতঃই কি অগ্নিচক্রের সহিত একটী ঘূর্ণিত জলন্ত মশালের কোন প্রভেদ নাই? উহা কতকটা অগ্নিচক্রবৎ দেখায় বটে; কিন্তু অবিকল তাহা নহে। অগ্নিচক্রের সহিত উহার অনেক প্রভিন্নতা সহজ চক্ষেই লক্ষিত হয়। আর না হইলেও স্পর্শের দ্বারা উক্ত জ্ঞান অনায়াসেই সংস্কৃত হইয়া থাকে। হাতে মশাল একটী বই কিছু আর দুইটী অনুভূত হইবে না। যদিচ কোন একটী ইন্দ্রিয়ের দোষে কখনও কোন সামান্য ভ্রমাদি জন্মে, তাহা অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় সহজেই সুধরাইয়া লওয়া যায়। দর্পণের দ্বারায় সমস্ত ঘর রীতিমত মণ্ডিত করিলে, লোকে দ্বার ভাবিয়া দর্পণে মাথা ঠুকিয়া ফেলে বটে; এস্থলেও স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্টিভ্রম অপনীত হইতেছে। আর ইহাকেও প্রকৃত দৃষ্টিভ্রম বলা যায় না। দর্পণে দ্বারের রূপ অবিকল প্রতিফলিত হয়; নয়নে সহসা তাহাই পড়ে; এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয় অনুমিত দর্পণ হওয়ায় দৃষ্ট প্রতিবিম্বকে দ্বার বলিয়া মনে হয়।

ইহাকেও অনুমানের ভুল বলিতে হইবে; প্রত্যক্ষের নহে। চন্দ্রসূর্য্য উদয়কালে যত বৃহৎ দেখায়, মধ্য গগনে তত দেখায় না কেন? ফলে তখন কি উহারা পৃথিবী হইতে দূর হইয়া পড়ে? কই জ্যোতিষে তো একথা বলে না। তবে এরূপ দেখায় কেন? মধ্যগগনে কি উহাদের অবয়ব ছোট হইয়া যায়? একখানি তাসের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ছিদ্র কর, এবং তন্মধ্যে দিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে যে সময় ইচ্ছা দেখ; আর সে রূপ ছোট, বড় দেখিতে পাইবে না। এই ছোট বড় দেখাইবার কারণ আলোকের রিফ্রাক্‌সন। এ জ্ঞানকে কি তুমি প্রত্যক্ষজনিত বলিবে; এখানে তোমার প্রত্যক্ষ কোথায়? এযে সম্পূর্ণ অনুমানে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সে অনুমানও চন্দ্র-সূর্য্যের ধারণামালার সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা নাই। আবার চন্দ্রসূর্য্যের অবয়ব-জ্ঞানে নেত্র বই আর অপরাপর ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকারই নাই। ইহাতে ভ্রম হইলে সহসা সংস্কার করিবার উপায় কই? এস্থলে মনে কর, চন্দ্রসূর্য্য উদয়াস্তে, অর্থাৎ দুইটী নির্দ্ধারিত সময়ে, অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়। জ্যোতিষে তাহাদের গতিবিধি জানা আছে; তথায় তাহার কোন ব্যাখ্যাই পাইলাম না। উদয়াস্তে যে তাহারা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়, এরূপ কোন প্রমাণই নাই। তবে এরূপ বড় দেখায় কিসে? সে ছোটবড় যে নয়নপ্রত্যক্ষ তাহা উড়াইয়া দিবার কাহারও সাধ্য নাই। তাহাকে ভ্রমও বলিতে পারি না; যেহেতু নিত্যই সকলের চক্ষে সেইরূপ অনুভূত হইয়া আসিতেছে, এবং হইয়াও থাকে। সামান্য পার্থিব পদার্থে যেমন স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকিতে পারে, কিন্তু তথায় তাহারা কেহই যাইতে পারিতেছে না। এস্থলে যা করে চক্ষু। চিন্তাময় মনুষ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে অসমর্থ। তাহাকে ইহার মীমাংসা যেন তেন প্রকারে করিতেই হইবে। এড়াইবার সাধ্য নাই। দিন দিন প্রত্যক্ষের ভাণ্ডার তোলপাড় করিয়া দেখিতে লাগিল; এপ্রকার আরকোন ঘটনা আছে কি না, ভাবিয়া অস্থির। ক্রমে এ-নয়-তা-নয় করিয়া পরিশেষে রিফ্রাক্‌সনে আসিয়া পড়িল। তাহাতে দেখিল যে, পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের সকল প্রসঙ্গই অবিকল মিলিতেছে। যাহাতে এরূপ মিলিল তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে দৃঢ়সংস্কার জন্মিল। একটী গেলাসে টাকা রাখিয়া ক্রমে পাছু হটিয়া যাইবে এবং যে স্থলে আর টাকা দেখা যায় না তথায় দাঁড়াইয়া কাহাকেও সেই গেলাস মধ্যে সাবধানে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে বলিবে যেন জলস্রোতে টাকা স্থানান্তরে না সরিয়া যায়। এবার অদৃষ্ট টাকা দৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ দৃষ্টিমার্গে আসিবে; বোধ হইবে যেন কেহ তাহাকে কিঞ্চিৎ তুলিয়া দিয়াছে। রিফ্রাক্‌সনই ইহার কারণ। প্রভাত ও সায়ংকালে বায়ু ও বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইয়া

থাকে এই জন্যই চন্দ্রসূর্য্যকে অধিক বড় দেখায়। এবার চন্দ্রসূর্য্যে রিফ্রাক্‌সন লাগাইয়া দেখিলাম বেশ মিলিয়া গিয়াছে; কোন ছন্দাংশেও অমিল নাই। তখন এক-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষীভূত কারণ দ্বারা অপর প্রত্যক্ষের অপ্রত্যক্ষীভূত কারণ অনুমান করিলাম। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যে আলোক সকলকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা কি প্রকৃত শ্বেত না কয়েকটী বর্ণের মিশ্রণ? এস্থলে তো তোমার প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিতে হইবে। কেন? সে মিশ্রণে শ্বেতবর্ণই প্রবল বলিব। জর্ম্মনীর অদ্বিতীয়বুদ্ধি গইতী নিউটনের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার মতে শ্বেতবর্ণই প্রকৃত বর্ণ; আলোক স্পষ্টাস্পষ্ট প্রতিফলিত হয় বলিয়াই নানা বর্ণের অনুভূতি হয়। মহাত্মা ডেলাভিলও নিউটনের বিপরীত মত প্রতিপোষণ করেন। যাহা হউক, নিউটনের ব্যাখ্যাই এদুজনাপেক্ষা বিশদ বটে; তাহাতে বর্ণবিজ্ঞান আজকাল বিশেষ উন্নত হইয়াছে। যখন পরীক্ষায় ঘূর্ণিত বিবিধবর্ণরঞ্জিত চক্র শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তখন শ্বেতবর্ণই এঅবস্থায় প্রবল বলিতে হইবে। আমরাও সেই আলোকে শ্বেতবর্ণ প্রবল বলিতেছি। ইহার তো কোন বিশেষ দোষই দেখিতে পাই নাই। তবে তুমি আলোক যেমন অনুভূত হয় তেমন, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ বল না কেন? বর্ণত্রয়ের মিশ্রণ তো তোমার প্রত্যক্ষে নাই। তোমার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে তো শুদ্ধ শ্বেতবর্ণই বলিতেছে। তুমি কোন্ অধিকারে অন্যরূপ বলিতেছ? অবশ্য সূর্য্যালোক যে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু উহা যে কয়েকটী বর্ণের মিশ্রণ, তাহাও তো প্রত্যক্ষের ফল। উহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের ব্যাপ্তি, সংস্কার বা পরিষ্কার মাত্র। যেমন অনুবীক্ষণে প্রত্যক্ষের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, তেমন ঝাড়ের কলমেও (Prism) বর্ণ বিষয়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রশস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, সূর্য্যালোক সংশ্লিষ্টাবস্থায় শ্বেতবর্ণ দৃষ্টহয়, বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে তিনটী পৃথক মৌলিক (পূর্ব্বে সাতটী মৌলিকবর্ণ জানা ছিল) বর্ণ উপলব্ধি হয়,—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট বর্ণত্রয়কে সংশ্লিষ্ট করিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শ্বেতবর্ণই অনুভূত হইয়া থাকে। এস্থলেও প্রত্যক্ষের ব্যত্যয় হয় নাই? চূর্ণে হরিদ্রায় মিশ্রিত করিলে লাল বর্ণ দৃষ্ট হয়; তাহাকে কি বলিব? তাহাকে লালই বলিব। তবে যদি কেহ মিশ্রণের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাহইলে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ জনিত বিশ্লিষ্ট চূর্ণ ও হরিদ্রা বর্ণের কথা স্বতন্ত্র বলিব। এতদুভয়ই প্রত্যক্ষের সামগ্রী। এতদুভয়েরই সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্টাবস্থাও আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদের এদুই অবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আছে, এবং থাকিবে। তবে আর যদি

কখন বিশ্লেষে শূন্য কিছু পাই, তখন তাহাও যেমন প্রত্যক্ষ হইবে তেমনি বলিব। নিকটে একটী বৃক্ষ দেখিয়া যেরূপ দেখায়, দূর হইতে তাহাকে দেখিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধহয়। এস্থলে প্রত্যক্ষ কি করিবে? কেন, প্রত্যক্ষ দুই কথাই বলিবে? প্রত্যক্ষ বলিবে কোন বস্তু নিকটে যতবড় দেখায় দূরে তাহাপেক্ষা ছোটদেখায়; অর্থাৎ দূরে ও নিকটে বস্তু মাত্রই এইরূপ ছোটবড় দেখাইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে দৃষ্টিবিজ্ঞানের এবং শুদ্ধ দৃষ্টিবিজ্ঞানের কেন, সকল বিজ্ঞানেরই নিয়মাদি আবিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে।

এতক্ষণে, বোধ হয়, প্রত্যক্ষকে এক প্রকার অভ্রান্ত বলাই স্থির হইল। যাহা যেমন প্রত্যক্ষ হইবে, তাহাকে তদনুরূপই ধরিব—অন্যথা করিব না; এবং অন্যথা করিবারও কোন কারণ বা অধিকার নাই। ইংরাজীতে কথায় বলে(Seeing is believing.) ইন্দ্রিয়বোধে ভ্রম সম্ভাবিত নহে তবে প্রত্যক্ষ-জনিত মনে যে চিন্তাস্রোত উত্তেজিত হয়, তাহাতেই সর্ব্বথা ভ্রম সম্ভব। যাহাকে বিষয় (Fact) বলা যায়, তাহা কতগুলা সিদ্ধান্ত বা অনুমানমালা প্রত্যক্ষসূত্রে গাঁথা মাত্র। সেই অনুমানগুলি, হয় সমস্ত—নয় কতক, মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত। সিদ্ধান্তগুলিও পূর্ব্ব প্রত্যক্ষজনিত ফল মাত্র; বর্ত্তমান সম্বন্ধে আনুমানসিদ্ধ বলিতে হইবে। এইরূপ মানসিক দৃষ্টিদ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে যাই। আপাততঃ অপ্রত্যক্ষ বিষয়গুলিও পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের সামগ্রী; সে প্রযুক্ত অন্তরে সততই প্রায় অঙ্কিত থাকে। সেই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের ছবিগুলি মনে সঙ্গগুণে (Association.) এমন সুন্দররূপে পর পর উপস্থিত হয়, যেন বস্তুতই তাহারা পুনশ্চ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সকল বিষয়ই (Fact.) প্রমাণসাপেক্ষ। যাহাকে বিষয় বলা যায়, তাহা কোন ইন্দ্রিয়বোধের সহিত কতকগুলি অনুমানের সমন্বয় মাত্র। ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলেও সেই প্রত্যক্ষে আসিতে হয়। প্রত্যক্ষ-সংশ্লিষ্ট অনুমানগুলিকেও একে একে আবার সেই ইন্দ্রিয়বোধে মিলাইয়া দেখিতে হয়। যতদূর মিলিল ততদূর নির্ভুল বলিলাম; যাহা মিলিল না, অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের সহিত ঐক্য হইল না, তাহাকেই ভ্রান্তি বলিলাম। বস্তুর পরীক্ষাস্থল প্রত্যক্ষ; নিয়মের পরীক্ষাস্থল তদ্গত চিন্তা। বস্তু অর্থে কতগুলি সমবায় প্রত্যক্ষমালা; কিন্তু সে সকলগুলি সর্ব্বসময় প্রত্যক্ষীভূত হয় না, বা করিবার অবকাশ থাকে না, সুতরাং আমরা তাহার কোন একটী দেখি বা অবশিষ্টগুলি অনুমান করিয়া ধরিয়া লই। এইরূপ অনুমানসমন্বিত প্রত্যক্ষকেই বস্তু বলা যায়। এস্থলে প্রত্যক্ষ ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব আর কি

হইতে পারে? পরীক্ষার আবশ্যক হইলে সেই অনুমানগুলিকে পুনশ্চ প্রত্যক্ষে আনিয়া দেখা। অধিকন্তু বস্তুর পারম্পর্য্যই নিয়ম; সুতরাং সেই বাস্তবিক পারম্পর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-জনিত চিন্তার পারম্পর্য্যের ঐক্য হইলেই তাহার যথার্থতা প্রতিপন্ন হইল।

"How is it (fact) verified? By submitting each of its constituent inferences to the primordial test of consciousness. The test with regard to objects within range of sense is obviously the reduction of inference to sensation. The test with regard to axioms, or general principle transcending sense, is confirmity with the laws of thought; when we have thus verified a fact we have attained the highest degree of certitude."

G. H. LEWES.

সকল প্রত্যক্ষের সঙ্গেই মানসিক প্রত্যক্ষ থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রত্যক্ষজনিত ধারণামালার কোন একটী কিছু দৃষ্ট হইলে তাহার আনুসঙ্গিক সকল ছবিগুলিই স্বতঃই পরপর মনে ভাসিয়া উঠে। ইহাতেই বস্তুর আপাততঃ অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়গুলি কোন একটী ইন্দ্রিয় বোধেরসঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগিয়া উঠে। মনে কর, কোন একটী বস্তুর রূপরসগন্ধস্পর্শ প্রভৃতির (পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের ফল) কোন একটী ইন্দ্রিয়গোচর হইল; অবশিষ্ট কয়েকটী অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই মনে যেন প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া জুটিল; এবং সেই ছবিগুলি এমন পরিস্কাররূপে প্রকাশিত হইল যে তাহাদের মানসিক নেত্রে দেখা যাইতেছে বলিলেও বলা যায়, অর্থাৎ নয়নদৃষ্ট পদার্থের মত অনেকটা বিশদ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ মানসিক ভাব (Idea.) দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়া বস্তুর ধারণামালা পূরিত করে। সেই অপ্রত্যক্ষের শূন্য ঘরে ভাব (Idea.) আসিয়া বসে, এবং অপূর্ণ বস্তুকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। যাহাকে আমরা বিচার বা সিদ্ধান্ত (Ratiocination.) বলি, তাহা মনে উক্ত ছবিরমালা বিশদভাবে আবির্ভাব করা মাত্র; এমন কি, সহসা যেন তাহাদিগকে প্রত্যক্ষীভূত বিষয় বলিয়া বোধ হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে আপাততঃ অপ্রত্যক্ষ বিষয় অনুমান করাকে সিদ্ধান্ত বলে। বস্তুর সমগ্র ধারণামালা যদি সকল সময় অবিকল পর পর যথামত প্রত্যক্ষীভূত করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ও ইন্দ্রিয়বোধ হইয়া পড়ে। ফলে তখন তাহাকে আর সিদ্ধান্ত বলা যাইত না। কিন্তু ঐরূপ সর্ব্ব সময় ঘটে না এবং ঘটিতে পারে না বলিয়াই সিদ্ধান্তের, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষের অনুমান, আবশ্যক। যখন আমরা গ্রহণের বিষয় মীমাংসা করি তখন মনে মনে

এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকি। চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ দেখিলাম। উহা প্রত্যক্ষের বিষয়। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবীর গতিবিধি জ্যোতিষে জানা আছে। মনে মনে পৃথিবী ও চন্দ্রকে ঘুরিতে দেখিলাম। ধ্যানটী অতি পরিস্কার রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হইল। ভাবটীপ্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট বোধ হইল। মনে পৃথিবী কখন চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে, চন্দ্র বা কখন পৃথিবী-সূর্য্যের মধ্যে আনিতে লাগিলাম। ছায়া বা আলোকের প্রতিবোধ স্বতঃই মনে আসিয়া জুটিল। এইরূপে ক্রমে গ্রহণের ব্যাখ্যা হইল। এস্থলে অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে উঠিলাম; এবং সেই উঠিবার সোপানাবলিও কিন্তু প্রত্যক্ষে গাঁথা।

বিজ্ঞানে বলে পৃথিবীর আকার গোল। জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর আকার পূর্ণায়তনে কাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে? সম্পূর্ণ কাহারই হয় নাই। তবে বল কেন? কোন্ অধিকারে এ প্রকার মীমাংসা কর? আংশিক প্রত্যক্ষ (যাহা সর্ব্বাংশে সমান অনুভূত হইয়া থাকে) হইতে অনুমানে এরূপ পূর্ণ করিয়া লই। আবার গোলাকার বস্তুও অনেক দেখিয়াছি, তাহার যে যে লক্ষণ (properties) আছে সে সকল লক্ষণ পৃথিবীতে খাটে ভাল, অন্য কোন আকার অনুমান করিলে সকল প্রসঙ্গের সঙ্গতি হয় না; অর্থাৎ পৃথিবীকে সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। তাই পৃথিবী গোল বলি। পৃথিবীর গোলাকার সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে তাহা আংশিক প্রত্যক্ষ হয়, এবং সর্ব্বাংশেই সেইরূপ আংশিক প্রত্যক্ষের ঐক্য দেখা যায়; সুতরাং সেই প্রত্যক্ষীভূত অংশ হইতে সমবায়অ বশিষ্ট অপ্রত্যক্ষাংশ অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে ও মানসপ্রত্যক্ষের সংযোগে পৃথিবীর গোলাকার উপলব্ধি হইয়াছে। পৃথিবীর যখন আমরা গতি নির্ণয় করি, তখনও এইরূপ করিয়া থাকি। সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদয় হইতেছে; পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। আদিম মনুষ্য সূর্য্যের গতি স্থির করিল, পৃথিবীকে অচলা ধরিল। কিন্তু অনেক সময় নৌকায় আরোহণ করিয়া তীরে দৃষ্টি করিলে বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে যাইতেছে বোধ হইয়া থাকে। ফলে বৃক্ষাদিকে চলিতে কখনও দেখা যায় নাই। এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষ লইয়া মনুষ্য মহা আন্দোলন করিতে লাগিল। ইহাও প্রত্যক্ষের বিষয়। বৈজ্ঞানিক ভাবিলেন এস্থলে সূর্য্য চলিতেছে—না পৃথিবীর গতিপ্রযুক্ত সূর্য্য চলিতেছে বোধ হইতেছে। মনে মনে পৃথিবী ও সূর্য্যের ধ্যান করিলেন—সম্বন্ধ অনুমান করিলেন। একবার পৃথিবীর গতি কল্পনা করিলেন, আবার সূর্য্যের গতিও কল্পনা করিয়া দেখিলেন; একবার বা দুইটীর গতিই কল্পনা করিলেন। মনে মনে স্পষ্টতঃই ছবিগুলি জাগাইতে লাগিলেন। হয়ত বা কৃত্রিম গোলক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সূর্য্য-পৃথিবীর গতির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে স্থির করিলেন পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই অনুমানটী সর্ব্বতোভাবে সকল প্রত্যক্ষের সহিত সুন্দররূপে ঐক্য হইল। সুতরাং তাহাই সত্যপক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতেও সেই প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যথাক্রমে অবিকল আলোচনা করা হইল। ইহাকে মানস-প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্তে যখন ভুল হয়, তখন সেই ধারণামালার কোনটী না কোনটী মন হইতে হারাইয়া যায়, বা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয় না, অথবা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত প্রজ্ঞা সকলগুলিতে দৃষ্টি না রাখিয়া লম্ফ দিয়া একটী হইতে আর একটীতে চলিয়া যায় এবং যাইবার সময় দুইচারিটী এড়াইয়া পড়ে। কোথাও বা সেই অভাব মোচন করিতে গিয়া, বিশৃঙ্খল ধারণামালা মনঃকল্পিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ অপর বস্তুর ধারণামালা আনিয়া যোজনা করে। রাত্রে বৃক্ষের ছায়াকে প্রেত মনে করা, ভূমিকম্পে ও পেঁচার ডাকে অমঙ্গল আশঙ্কা করা প্রভৃতি তাহারই ফল। স্বপ্নে স্বতঃই মনের অবসাদ হেতু ঐরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে। "When we are awake, says Aristotle, we have a world in common; when we dream, each has his own. Kan't aptly applies this to metaphysicians, when we find a variety of men having various worlds, we may conclude them to be dreaming. It is because the majority of thinking men have been convinced that enquiries conducted on the metaphysical method are but as dreams, that they have everwhere in Europe fallen into discredit."

G. H. LEWES.

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা কি সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারি? না—তবে সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষে আরোপ করিতেছ কেন? সকল জ্ঞানই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে; সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ মূলক। জ্ঞান বৃক্ষস্বরূপ। যেমন বৃক্ষ অর্থে বৃক্ষের মূল নহে; সেইরূপ জ্ঞান অর্থেও প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু মূল ব্যতীত বৃক্ষে অস্তিত্ব সম্ভাবিত কোথায়? সেই প্রত্যক্ষই আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের মূল। "The unknown is only a prolongation of the known, and is trusted only so far as it is in strict conformity with the known. The invisible is but the generalisation of the visible."

G. H. LEWES.

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

আমেরিকা ও ইতালীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত জেনারেল্ জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

পূর্ব্বখণ্ড।

উদ্বোধনা।

স্বার্থপর কাপুরুষেরাই আত্ম-স্বার্থ-হানির ভয়ে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে 'অসম্ভব' বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদনুসরণ হইতে আপনারা নিবৃত্ত হয় ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা জানিয়া ও জানে না যে এ জগতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারীবল্ডী-প্রমুখ তদীয় শিষ্যবৃন্দ ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন, তখন ইতালীবাসীরাই ইহাঁদিগকে 'অসম্ভবপ্রলাপী' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। 'শতধাবিচ্ছিন্ন ইতালী আবার একসূত্রে গ্রথিত হইবে, বহুকালের দাসত্বে দাস-প্রকৃতি-প্রাপ্ত ইতালী আবার স্বাধীন হইবে' ইহা ভাবিতে ও যেন সেই কাপুরুষগণের হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইত। 'অধুনা শতধা-বিচ্ছিন্ন, বহুভাষা-কথনশীল, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ভারত কালে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবে,—যাঁহারা এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন, তাহাঁরা যেমন অর্দ্ধ-হৃদয় স্বার্থতৃপ্ত ভারতবাসীর নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন, একদিন ম্যাট্‌সিনির নব্য ইতালী সমাজকেও সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল। অষ্ট্রীয় প্রতিনিধি মেটার্নিক্ একদিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'ইতালী কেবল ভৌগোলিক নাম মাত্র,।

'সত্যমেব জয়তে'—সত্যেরই পরিণামে জয় হয়। 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ,—যেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই জয়; ইত্যাদি মহাপুরুষ-বাক্যের সার্থকতা ইতালী ক্ষেত্রে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। 'কল্পনা অপেক্ষা সত্য যে অধিকতর বিস্ময়জনক' তাহার এরূপ দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সত্যের ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া—ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া—একান্তমনে সাধনা করিলে, গভীর হতাশতার সময়েও একজন মাত্র ব্যক্তি দ্বারাও যে কি অসম্ভব সম্ভব না হইতে পারে, বীরত্বের আদর্শ ও সরলতার মূর্ত্তি ইতালীর মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডী তাহার নিদর্শন। স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত দেশবাসিগণের প্রতি অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত—সাধুসঙ্কল্পের

জ্ঞানে দুষ্প্রধর্ষ্য—একটী মাত্র ব্যক্তিও ন্যায় ও প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধার করিবার জন্য বার বার উদ্দণ্ড হইলে, কি অসাধ্যই না সাধিত হইতে পারে—গ্যারিবল্ডীর জীবনী তাহার দৃষ্টান্তস্থল। গ্যারিবল্ডী বার বার প্রতিহত হইয়াও সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয়ে কখন বিশ্বাস-বিহীন হন নাই। তাই অনেক নিষ্ফল চেষ্টা ও পরাজয়ের পর—অনেক মর্ম্মপীড়া ও রক্তপাতের পর—তিনি একসময়ে অত্যাচারিগণের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া, তাহাদিগের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে—পবিত্র ও বিশাল ইতালীক্ষেত্রকে—উদ্ধার করিয়া তাহাতে অনন্ত আনন্দ-লহরী বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। আজ যে, ইতালী প্রত্যাগত যৌবনে ও নবজীবনে জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহা সেই মনীষীর ও তদ্‌গুরু ম্যাট্‌সিনির নিরন্তর ও অক্লান্ত সাধনার ফলে!

যাঁহারা একদিন ইতালীকে শুদ্ধ ভৌগোলিক অস্তিত্ব মাত্র বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন; ইতালীর একতা উন্মত্তের ছিন্ন মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; সুদৃঢ়-বদ্ধ অষ্ট্রীয় জাতিকে দূরীকৃত করিয়া ইতালীতে স্বাধীনতা স্থাপন করা স্বপ্ন-রাজ্যের বিষয়ীভূত মনে করিয়াছিলেন; এবং ইতালীর মুক্তিদাতাকে যাঁহারা একদিন স্বদেশের অনিষ্টকারী হঠকারী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, আজ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সেই হঠকারী গ্যারিবল্ডী ইতালী ক্ষেত্রে আসিয়া—ন্যায় ও সত্যের ভাবে উদ্দীপিত হইয়া—তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়-রূপ অপযশ কালিমা ক্ষালনে সমুদ্যত। আজ তিনি মনরীল্, ক্যাটানাফিসি, প্যালার্মো ও ভল্‌টর্নো সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত জয়লাভ করিয়া—সমস্ত ইতালীকে এক করিয়া বিজিত অষ্ট্রীয়গণকে ইতালী ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া—মিলিত ও ঘনীভূত ইতালীকে ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিয়া—ক্যাপ্রেরা-দ্বীপস্থ নিজ কুটীরাবাসে গমন করিলেন। আজ সমস্ত ইতালী সমস্বরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল—'গ্যারিবল্ডী জীব (Vivas garibaldi)'। এতদিন সকলে যে—ইতালীর একতা ও স্বাধীনতাকে অসম্ভব ঘটনা বলিয়া আসিতেছিলেন, গ্যারিবল্ডীর অসাধারণ রণবিষয়িনী প্রতিভা তাহা কয়মাসের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তুলিল।

'আজও যখন হইল না, তখন আর হইবার সম্ভাবনা কই?,—যাঁহারা অতীত ঘটনা হইতে এই অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, গ্যারিবল্ডীর জীবনী তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল। সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধি হয় নাই—ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত যে 'সাধনা পূর্ণ হইলেও সিদ্ধি হইবে না' তাহা অপসিদ্ধান্ত মাত্র ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটী চেষ্টা বার বার নিষ্ফল হইতে পারে। কিন্তু যখন

সময় পূর্ণ হইবে—যখন ক্ষেত্র বীজ-ধারণ-ক্ষম হইবে—তখন সে চেষ্টা সহজেই সফল হইবে—বীজ রোপন করিবামাত্র তখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। সময় আসে নাই বলিয়া তুমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে সময় হয়ত কখনই আসিবে না। অন্ধের নিকট যেমন আলোক কতবার আসে ও তাহার নিকট হইতে কতবার চলিয়া যায়—কিন্তু চক্ষুহীন ব্যক্তি তাহা যেমন দেখিতে পায় না, সেইরূপ চেষ্টাহীন উদ্যম-শূন্য ব্যক্তির নিকটও সময় কতবার আসিতেছে ও তাহার নিকট হইতে কতবার যাইতেছে, সে তাহা দেখিয়াও দেখে না; চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধের মত বসিয়া থাকে।

ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীন সময়-প্রত্যাশী পতিত ভারতবাসিন্! তোমাদের ন্যায় ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও এক দিন এইরূপ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও দুইজন মনীষীর করস্পর্শে তাহাদের এক্ষণ চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ত্রিবর্ণ পতাকা সগর্ব্বে রোমের ক্যাপিটলের উপরি উড্ডীন হইতেছে। আজ পতিত ইতালী কতিপয় মনীষীর তপস্যার ফলে, আবার উঠিয়াছে। কিন্তু পতিত ভারতের তপ নাই, জপ নাই, সাধনা নাই—তাই ইহা আজও পড়িয়া রহিয়াছে। রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনিও ইতালীর একতা ও মুক্তির জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দৈববলের উপর অনন্ত বিশ্বাসের ফলও তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও একদিন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে একদিন সমস্ত ভারত উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। তাই সেই মহতী সাধনার বলে একদিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের দিনে—যখন কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে আসিয়া আপনাদিগের প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ-ভরিয়া দেবগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কালে দেব-বলে বলীয়ান্ হইয়া আর্য্যেরা এক এক জন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বল পাইয়াছিলেন। আমরা সে সব দিন ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দশা। এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটী ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে সেই দেব দেব ভগবানের নাম কীর্ত্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে পড়িলে কিনা হইতে পারে? এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে!! সকলে গগন বিদারিয়া গাও "বন্দে মাতরম্"—"বন্দে হরিচরণারবিন্দম্"। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক!!!

প্রথম অধ্যায়।

ইতালীর দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী অধীনতা ও তজ্জনিত দুঃখরাশি; ইতালী প্রথম নেপোলিয়নের অধীনে; ভায়েনার মহাসভা।

বহুপুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিধাতার সৌন্দর্য্যনির্ম্মাণের নিকষ-স্থল ইতালী অতিক্রান্ত-বিধি বৈদেশিক শক্তির অধীনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া আসিতেছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবর গোল্‌ড্‌স্‌মিথ্ ইতালী পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইতালীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"Man seems the only growth that dwindles here" * * * * * * * * * "Each nobler aim repressed by long control, expires at last, or feebly mans the soul." কবিবর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'এখানে কেবল মানুষেরই বৃদ্ধি নাই—কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি অনন্তপ্রভাব-শালিনী। বহুদিনের দাসত্বে হৃদয়—প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয় যেন মহৎ-লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অথবা হৃদয়ে যদি কোন মহৎ লক্ষ্য থাকে তাহা যেন ইহাকে অতি মৃদুভাবে উত্তেজিত করিতেছে'। কবিবর বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালী—সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ভারতের দুরবস্থা দেখিয়া ইহার সম্বন্ধেও যেন সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু গোল্‌ড্‌স্‌মিথ্ ইতালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। যেমন দ্রাক্ষা-প্রচ্ছাদিত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে গলিত ধাতু প্রচণ্ড নিস্রাবে পীঠস্থ ও পার্শ্বস্থ ধরাতলকে অতর্কিতরূপে প্লাবিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইতালীর আপাত-পরিদৃশ্যমান ঔদাসীন্য ও অযত্নের অভ্যন্তরে যে, জ্বললোন্মুখ বিপ্লবাগ্নি তখনও প্রধূমিত হইতেছিল গোল্‌ড্‌স্‌মিথ্ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম নেপোলিয়ন্ স্বয়ং ইতালীয় এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়াই ইতালীর অন্তর্নিহিত ধূমায়মান জাতীয়-ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজের পুত্রকে রোমের সিংহাসনে বসাইয়া সমস্ত ইতালীকে এক সিংহাসনের অধীনে সমবেত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ সালে তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

চিরলালিত আশ্বস্ততা সমূলে বিনষ্ট হইল।

প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর ভায়েনার মহাসভা (Congress.) ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের পরিব্যক্ত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইতালীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। সকলকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া অষ্ট্রিয়াকে সিংহের অংশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে নেপ্‌লসরাজ্য পূর্ব্ব-অধিস্বামী বোর্ব্বন্-বংশ-সম্ভূত ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যাম্পো ফর্ম্মিও'র সন্ধিতে প্রথম নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়াকে ভিনিসিয়া প্রদান করিলেন। ভায়েনার সন্ধিতেও ইহা অষ্ট্রিয়ার হস্তে রহিল। রোমে আবার পোপের রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল। রোম ও ভিনিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল ফ্লটস্‌কানী মডেনা, পার্ম্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রিয়ারই তত্ত্বাবধানে রহিল। ইহাদের মধ্যে পার্ম্মা ও লুক্কা অষ্ট্রিয় সম্রাট্ ফ্রান্সিসের কন্যা ও প্রথম নেপোলিয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী মেরী লুইসাকে দেওয়া হইল। ইতালী-উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে সার্ডিনিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পীড্‌মণ্ট রাজ্য সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এখন জেনোয়া ও সার্ডিনীয়া দ্বীপকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সমস্ত ইতালীতে অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচারিণী-শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ইউরোপীয় রাজ্য সকল পরস্পরের রক্ষার জন্য 'পবিত্র সম্মিলন (Holy alliance)' নামক একটী অপবিত্র সম্মিলনী সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা পরে জাতি নিচয়ের স্বাধীনতাপহারিণী রাজবৃন্দের সম্মিলন-সভা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্যই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেবল মন্ত্রিবর ক্যানিং ইংলণ্ডকে এই সম্মিলনে যোগ দিতে না দিয়া ইংলণ্ডের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই রাজসম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কোন দেশের প্রজাগণ রাজবিদ্রোহী হইলে সেই দেশের রাজার আহ্বানে সকলেই উত্তর দিবেন; অর্থাৎ সকলেই সৈন্য ও অর্থ দিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

অনেকবার এই নিয়মে কার্য্য হইয়া আইসে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব্ আঙ্গুটিনের অধিনায়কত্বে একটী ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক বিদ্রোহী কোর্ট্‌স্‌গণকে অকর্ম্মণ্য রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করায়। ফার্ডিন্যাণ্ড যে জাতীয় কনেষ্টিটিউসন্ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় কনেষ্টিটিউসন্ নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় দেশের সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। আর একবার অত্যাচারী নেপ্‌লসরাজ ফার্ডি-

ন্যাণ্ডের রাজ্য ওতপ্রোত করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধান্ধ প্রজারা তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। সেই সময় অষ্ট্রিয় সৈন্যগণ আল্‌পস্ (Alps.) পর্ব্বত উত্তরণ পূর্ব্বক নেপল্‌সে আসিয়া প্রজাগণের অভ্যুত্থান নিবারিত করে। জাতীয়-স্বাধীনতা-বিলোপকারী এই রাজকীয় ষড়যন্ত্র আরও দুই একবার কার্য্যে পরিণত হয়।

এই ঘোর জাতীয় দুর্দ্দশার সময় বিধাতা ম্যাট্‌সিনিকে বৈপ্লবিক গুরু ও গ্যারিবল্ডীকে বৈপ্লবিক শিষ্য করিয়া পাঠান। যেমন গুরু তাঁহার তেমনই শিষ্য। উভয়েই আপন আপন বিভাগে অতুলনীয়। যেমন সাধনার প্রয়োজন, বিধাতা তেমনই সাধক মিলাইয়া দিলেন। গ্যারিবণ্ডী যে বৈপ্লবিক নেতা হইবেন, একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহা পূর্ব্বেই সংসূচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা মার্সাল্ মাসেনা নাইম্ নগরের যে গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঐতিহাসিক গৃহেই গ্যারিবল্ডী ভূমিষ্ঠ হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তদীয় জন্ম, বাল্যশিক্ষা, জননী, সমুদ্রযাত্রা, কনেষ্টাণ্টিনোপলে পীড়া, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ, মার্সেলিসে প্রত্যাগমন।

জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই তারিখে ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরে ডোমিনিক্ গ্যারিবল্ডীর ঔরসে ও রোজা রেগুইণ্ডো (Rosa Raguindo) র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডোমিনিক গ্যারিবল্ডী স্বয়ং নাবিক এবং নাবিকের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। সাগরের তরঙ্গ-নির্ঘোষ সেই বালক গ্যারিবল্ডীর কর্ণে যেন মৃদঙ্গ ধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইত। পোতবাহী নাবিকগণের ঐকতানিক গীতি তাঁহার কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ করিত; পিতা পিতামহের সামুদ্রিক যাত্রাবিষয়িনী গল্প-মালা তাঁহার নিকট যেন দেবযান বলিয়া প্রতীত হইত। প্রত্যুত নাবিক-জীবনোপযোগিনী যাবতীয় ঘটনা গ্যারিবল্ডীর শৈশব-সহচরী ছিল। এই জন্যই শিশুকাল হইতেই নাবিক-জীবন গ্যারিবল্ডীর অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল।

তিনি পিতার নিকট হইতে বীরোচিত সাহসিকতা, ক্ষিপ্রদর্শিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা ও দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়; এবং জননীর

নিকট হইতে দাক্ষীলতা, পবিত্রহৃদয়তা, পরদুঃখ-মোচনেচ্ছা ও বলবতী অত্যাচার নিবারণ-স্পৃহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তাল-তরঙ্গ ভূমধ্য সাগরের নিকট নির্ভীকতা ও অত্যুঙ্গ আল্‌পস্ পর্ব্বতের নিকট অবিচলিততা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীর অতীত ইতিহাসের স্মৃতি হইতে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস ও দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভবিষ্য জীবনে যে সকল অবদান-পরম্পরার অনুষ্ঠানে তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়াছিল, সেই সকলের বীজ এই বাল্যেই তাঁহার অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল।

তাঁহার বাল্যশিক্ষা বিশেষ বর্ণনীয় নহে। তাঁহার পিতা মাতা যদিও নিজেরা তত সুশিক্ষিত ছিলেন না, তথাপি আপনাদিগের অবস্থানুসারে পুত্রের শিক্ষার জন্য যত্নের ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারা পুত্রের সুশিক্ষা বিধানের জন্য উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি যে শিক্ষা পাইতেন, গৃহ-শিক্ষকেরা তাঁহাকে তদতিরিক্ত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সেই ক্রীড়নশীল বালকের নিকট পাঠাভ্যাস অপেক্ষা ক্রীড়া অধিকতর ভাল লাগিত। সুতরাং তদীয় শিক্ষকগণের যত্ন তাঁহার প্রতি এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছিল। তিনি পুস্তক পাঠ অপেক্ষা প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার দুরবগাহিনী বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মন জড় ও অজড় প্রকৃতির অভ্যন্তরে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকিত। সুতরাং পুস্তকস্থা বিদ্যার অভাব তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল বাত্যা ও তরঙ্গে তাঁহার মধ্য ও শেষকালে তিনি হাবুডুবু খাইয়াছিলেন, এই বাল্যে তাহার কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হয় নাই। জনক জননীর সহাস্য বদন ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচন-সমক্ষে লালিত ও, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকায় গ্যারিবল্ডীর বাল্যকাল সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সুখের সময়েও তাঁহার অবদান-প্রিয় প্রকৃতি স্থির থাকিতে পারে নাই। শান্ত ও তরঙ্গহীন জীবন ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য ও প্রকৃতির অনমনীয়তা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা ভীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, বা যাজকের নিরীহ ও শান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিধাতা গ্যারিবল্ডীকে যে কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে কার্য্যের সঙ্গে উক্ত ব্যবসায়-ত্রয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় গ্যারিবল্ডী তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। সেই বাল্য হইতেই সামুদ্রিক-জীবন-প্রিয়তা তাঁহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার নাবিক-জীবন-প্রসক্তি তাঁহার পিতা

মাতার হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথিত করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরক্ত হইয়া একদিন গ্যারিবল্ডী সমপাঠিগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনি নৌকা-রোহণে অশীতি-মাইল-দূরবর্ত্তী জেনোয়া বন্দরে যাত্রা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনা বাক্যে ও দৃঢ়তায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সমপাঠিরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অসমসাহসিক' ছাত্রদল এক খানি জেলেডিঙ্গীতে চড়িয়া উত্তাল সাগর-তরঙ্গ ভেদ করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছেন—এমন সময় তাঁহাদিগের পলায়ন আবিষ্কৃত হইল। গ্যারিবল্ডীর পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের অনুসরণার্থ একখানি দ্রুতগামী পোত প্রেরণ করিলেন। পোতরাজ অতি দ্রুতবেগে গিয়া বালক-বাহিত জেলেডিঙ্গী খানি গিয়া ধরিয়া বালকগণকে মোনাকো(Monaco) বন্দরের বিপরীত পার হইতে ফিরাইয়া আনিল। একজন যাজক (Abbes) তাঁহাদিগকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, যাজক শ্রেণীর উপর তাঁহার বিদ্বেষ এই বাল্যেই অঙ্কুরিত হয়।

গ্যারিবল্ডীর জননী অতিশয় ঈশ্বর-পরায়ণা ছিলেন। গ্যারিবল্ডীর চরিত্র সংগঠনে তদীয় জননীর বিশেষ প্রভাব ছিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার জীবনের অতি সঙ্কট সময়গুলিতে যখন সমুদ্র তাহার তরী নিয়ে ও পার্শ্বে ভীষণ গর্জ্জন করিত—যখন গুলি সকল তীব্র ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন জ্বলন্ত গোলা সকল শিলা বৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইত—তখন তিনি অলৌকিক দৃশ্যে দেখিতে পাইতেন যেন তাঁহার জননী নতজানু হইয়া প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন—সেই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐশীশক্তি-পরিরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেন, গ্যারিবল্ডী নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। গ্যারিবল্ডী আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে—'আমার যে অসম সাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত, আমার সে সাহসের মূল দৈব বলের উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যতক্ষণ আমার জননী—সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার মদীয় জননী—যতক্ষণ আমার জন্য—আমার প্রাণ রক্ষার জন্য—ঈশ্বরাধনায় নিমগ্ন থাকিবেন, ততক্ষণ আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই'। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর তিমির অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ এরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাসের আবির্ভাবে বিপজ্জাল আপনিই কাটিয়া যায়। স্বয়ং ঈশ্বর এরূপ বিশ্বাসীর দেহরক্ষক হন।

মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের সামঞ্জস্যের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

গ্যারিবল্ডী এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন, যে মায়ের নাম করিলে তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইত; মায়ের প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে "তাঁহার জননী রমণীর পূর্ণ আদর্শ। যদি আমাতে কোন সাধুভাব থাকে, তাহা আমি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।" তাঁহার জননী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—রোম নগরীতে গ্যারিবল্ডী যখন ফরাসি সেনার সহিত যে অদ্ভুত রণ করেন,—যাহাতে গ্যারিবল্ডীর যশ দেশ বিদেশে প্রস্থত হয়—তখন গ্যারিবল্ডী-জননী রোজা জীবিত থাকিয়া স্বচক্ষে পুত্রের অমিত বল ও অদ্ভুত রণোৎসাহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার পুত্রের অতিমানুষ বীরত্বে ইতালী স্বাধীন হইয়াছিল—বিচ্ছিন্ন ইতালী একটী ঘনীভূত সমবেত প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—সে পরম সুখের দিনে—সে জাতীয় মহোৎসবের সময়ে—জীবিত থাকিয়া সমস্ত ইতালীবাসিগণের সঙ্গে সমস্বরে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার সুখভোগ বিধাতা তাঁহার ললাটে লিখেন নাই। সে সময় তিনি স্বর্গ হইতেই দেবকন্যাগণের সহিত একত্র পুত্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

নাবিকগণও সমুদ্রের সহিত নিরন্তর সংসর্গে গ্যারিবল্ডীর অবদানময় নাবিক-জীবনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রকে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির অধীন দেখিয়া পিতা মাতা অগত্যা কিশোর বয়সেই নাবিক-জীবনে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি ওডেসা সিডিটা, ভেচিয়া, ক্যাগ্লিয়ারী—প্রথমে ক্রমান্বয়ে এই তিন বন্দরে জল যাত্রা করেন।

তাহার পর কয়বার তিনি লিভাণ্টে জলযাত্রা করেন—শেষবার তিনি কনেষ্টাণ্টিনোপলে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার পীড়া দীর্ঘকাল থাকায় তাঁহাকে তথায় অতি দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার চিকিৎসকের সাহায্যে তিনি টেনিওনী নাম্নী কোন বিধবা রমণীর পুত্রত্রয়ের গৃহশিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি কয়মাস অতি সুখে কাটাইলেন, এবং অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সামুদ্রিক জীবন-স্পৃহা প্রত্যাগত হইল। দুই একবার সমুদ্র যাত্রার পর তিনি নোট্রিডেম্ জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে অভিষিক্ত হইয়া জিব্রাল্টর ও মেহনে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

দর্শন।

উপক্রমণিকা।

মানব যখনই স্থিরচিত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তাঁহার মনে আমি কে? এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া মানব বিষম সমস্যায় পতিত হন। যখন তিনি তাঁহার নিজের আকৃতি প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থিতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বাহ্যজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তাঁহার মনে যুগপৎ একটি অতি ক্ষুদ্র এবং একটি অতি বৃহৎ এই দুইটি বিরোধী ভাবের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। তিনি তখন বোধ করেন, আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, তাহা এই অসীম বিশ্ব মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং আমি সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর ও সমস্ত জীবের রাজা হইয়াও ভূমণ্ডল সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রতম নিকৃষ্ট পরমাণুরও যে দশা, আমি উৎকৃষ্ট জীব মানব—আমারও সেই দশা। সেও বাষ্পাদিক্রমে পরিণাম অনুসারে ক্রমবিকাশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আমিও তদ্রূপই; এতৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। সেও কালে উৎপন্ন হইয়া কালেই বিলীন হইতেছে। আমিও কালধর্ম্মে জন্ম লাভ করিয়াছি, কালগর্ভেই মিশাইয়া যাইব। এই কি আমার পরিণাম? এই পর্য্যন্তই কি আমার আমিত্বের শেষ? কি নিমিত্তই বা জগতে আসিলাম, কি করিয়াই বা যাইব? অথবা ভূত সকল বৃক্ষলতা বায়ু মৃত্তিকাদির ন্যায় রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে একত্র মিলিত হইয়া এই শরীর-প্রপঞ্চ বা দেহযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে এবং কালক্রমে ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া সূক্ষ্মতম অণুরূপে প্রকৃতির অঙ্কে বিলীন হইবে—বিলীন হইলেও আমি থাকিব; আমার আমিত্বের বিলোপ হইবে না? আমার শরীরের নির্ম্মাণ-কৌশল কি চমৎকার? ইহা অস্থিময় ও চর্ম্মময় আবরণে সংরক্ষিত অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরার সমষ্টি। ঐ সকল শিরা মস্তিষ্ক (Brain) হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত শরীর বেষ্টন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মস্তিকেই মিলিত হইয়াছে। মস্তিষ্কেরও স্বসম্পূর্ণ শিরা-বেষ্টনে বেষ্টিত অংশদ্বয়। ঐ অংশদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কশিককেন্দ্র (nerve centre) মন (Sensorium or mind) এই আখ্যায় সমাখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ মনই সমস্ত জ্ঞানের আকর। মস্তিষ্ক ভিন্ন দেহের আরও কতকগুলি অংশ আছে। পরিপাকযন্ত্র রসযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র এবং চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে দেহপোষক পরিপাকাদি যন্ত্রত্রয় আত্মেচ্ছা-

শক্তির অজ্ঞাতসারে জীবনী-শক্তির অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বাধীন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল এবং মন আত্মেচ্ছা-শক্তির অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদিগকে পরাধীন দেহ কহে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত শিরা সকলের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। শিরা সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত;—জ্ঞানজক শিরা এবং গতিজনক শিরা। যে সকল শিরা পদার্থের প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে আনয়ন করে, তাহারাই জ্ঞান-জনক শিরা নামে উক্ত হয় এবং যে সকল শিরা উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের গতিসাধন করে, তাহারাই গতিজনক নামে কথিত হয়। ইন্দ্রিয় সকলও মস্তিষ্কের ন্যায় স্বসম্পূর্ণ অংশদ্বয়-বিশিষ্ট। মানব শরীর এইরূপ স্বসম্পূর্ণ অবয়বদ্বয়ের সমবায় স্বরূপ। অবয়ব দুইটি হইলেও জ্ঞান একটিই হইয়া থাকে। এই জ্ঞানৈকত্বই অদ্ভুত কৌশলের পরিচায়ক। ঐ জ্ঞানৈকত্ব—ঐ অদ্ভুত পরিচালন-ক্রিয়াই কি শরীরাভ্যন্তরে সমস্ত ক্রিয়ার একমাত্র সাধন স্বরূপ জ্ঞানশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে না? তবে এই শরীরের—এই পরিচালন-ক্রিয়ার কর্ত্তা নাই, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্যপ্রয়োগ এইরূপ অসঙ্গত-প্রলাপ অন্যায় দাম্ভিকতাই বা প্রকাশ করি কেন? আমরা কি শরীর-যন্ত্র বিশ্লিষ্ট করিয়া সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি কারণ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি? যদি স্থির-সিদ্ধান্ত না হইয়া থাকে, তবে কেন আত্মবস্তুর অস্তিত্ব অপ্রামাণ্য বলি? যে সকল মহাজ্ঞানদার্শনিকগণ আত্মাস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতেছেন—আত্মাস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাও পরোক্ষ শক্তির কর্ত্তৃত্ব—আধিপত্য ও অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিইত এই দেহ-প্রপঞ্চাতিরিক্ত কোন অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তাহারই উপর এই আমিত্বের (অহং ভাবের) স্থাপনা করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তাকালে স্বস্ব দেহ-বিষয়ক স্বত্ব-সম্বন্ধে যে দেহাতিরিক্ত আত্ম-সম্বন্ধ সংস্থাপন বা আরোপ করিতেছেন, তাহা কি শিলাপুত্রের শরীরবৎ অর্থশূন্য কল্পিত সম্বন্ধমাত্র? উহা কি আকাশকুসুম বন্ধ্যাপুত্র ও শশবিষাণাদির ন্যায় বৃথা সম্বন্ধ? যদি তাহাই হয়, তবে জ্ঞানের দ্বৈধ হয় না কেন? ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না কেন? যে সকল কার্য্যের প্রতি ইচ্ছাশক্তির পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্ববর্ত্তিতা পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহাদের দ্বারাও কি বিশ্বাতিরিক্ত অপর এক মহীয়সী শক্তির পরিচয় হইতেছে না? বিবেকশক্তি কি ঐ প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত ভৌতিক-শক্তি অপেক্ষা বলীয়সী যাবদীয় শক্তির আধারভূতা এক অপ্রমেয় শক্তির অস্তিত্ব প্রকাশিত করিয়া দিতেছে না!

এবম্বিধ দুরূহ প্রশ্ন সকলের—ভয়ঙ্করী আপত্তি সকলের—মীমাংসা করিতে গিয়া

অনেকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তখন সমস্ত দোষ গুণ বিজ্ঞানের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞানকে প্রবল আশ্রয় বিবেচনা করেন, আমরা ঐরূপ আচরণের বিরোধী নহি। কারণ, প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র সত্যের উপর সংস্থাপিত। পরীক্ষা দ্বারা যাহা নির্ণীত হয়, তাহাই সত্য। পরীক্ষার সাধনই প্রমাণ; অর্থাৎ বিষয় সকলের পরস্পর সৌসাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অবধারণরূপ প্রমাণ (ভ্রম ভিন্ন প্রমাজ্ঞান-সাধন) দ্বারা পরীক্ষা-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অতএব বৈজ্ঞানিকগণের প্রমাণিত সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব-বিচার ও সত্য-নির্ণয় আবশ্যক। তবে এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা স্বকীয় চেষ্টায় যখন কোন বিষয়ের পরীক্ষা-কার্য্যে অক্ষম হইব, তখন যেন কেবল স্বমত-পোষক মতের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন বা উহারই উপর বিশ্বাস না করিয়া সাধারণ জনগণের গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়েরই মত পর্য্যালোচনা করা হয়।

আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রথম আলোচ্য বিষয়ই জীবশরীর। কারণ, যে শরীরে আমরা প্রতিনিয়তই আত্মার অধ্যাস অনুভব করিতেছি, সেই শরীরই আত্মা বা তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থই আত্মা, এইরূপ পরীক্ষা-প্রণালীই যখন আত্মার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবে, তখন দেহই প্রথম পরীক্ষিতব্য বস্তু। দেহই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বনীয়। তখন যদি আত্মা থাকেন, তাহাও যে প্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইবে এবং যদি না থাকেন, তাহাও সেই উপায়েই অবধারিত হইবে।

মানব শরীরে দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি জড়, অপরটি অজড়। পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থই জড়' এবং ঐ সকল পরমাণুর কারণ-স্বরূপ অধিনায়ক-স্বরূপ স্বপ্রকাশ-ধর্ম্মক অতীন্দ্রিয় পদার্থবিশেষের নামই অজড়। অজ্ঞাত সম্পূর্ণ-স্বরূপ স্বপ্রকাশ-ধর্ম্মী অজড় পদার্থ হইতে জড়ের আবির্ভাব যে কি রূপে হইল, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। তবে 'যাহার যে ধর্ম্মের কখন কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই, তাহার সেই ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম, এইরূপ পরীক্ষা-প্রণালীতে আরূঢ় করিয়া প্রমাণ দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য অবিশ্বাস্য নহে বলিয়াই ঐ মত স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জড় পদার্থ মাত্রই পরমাণু-সমষ্টি। অতীন্দ্রিয় পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে অণুর এবং অণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকের (Molecules) উৎপত্তি। উহাই ইন্দ্রিয় গোচর সূক্ষ্ম জড়। দ্ব্যণুক নিচয়ের সংযোগে স্থূল জড় বা ভূতের উৎপত্তি। ঐ সংযোগ প্রকৃত একীভাব নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, সমস্ত পরি-

দৃশ্যমান পদার্থই সচ্ছিদ্র। তাহার কারণ, কোন পদার্থই অপর পদার্থের সহিত একীভাবাত্মক অবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ যাহাতে দুই পদার্থ এক হইয়া যায়, এইরূপ সংযোগ ঘটে না। পরমাণুর স্বাভাবিক কম্পন-তারতম্য-জনিত উষ্ণতা ও শৈত্য আকর্ষণ-বিশ্লেষণ-শক্তিবলে অবিচ্ছেদ-সংযোগের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয় গোচর ঘনত্বাদি-জ্ঞান মানবের আপেক্ষিক জ্ঞান। পরস্পরের আকর্ষণোৎপন্ন অবিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান ঘন-সন্নিবেশই আপেক্ষিক ঘনত্বাদি-জ্ঞানের সাধন। অণুসমূহের আকর্ষণ হইতে উৎপত্তি ও স্থিতি এবং বিশ্লেষণ হইতে বিনাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, জড় ও জড়কারণ সামান্যতঃ—বস্তুতঃ অপৃথক্ ভাবাপন্ন হইলেও ইন্দ্রিগোচর জড় জড়-শক্তির অধীন এবং অজড় জড়শক্তির অধিনায়ক; এইরূপ পৃথক্ত্ব স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ জড় ও অজড় অস্মদাদি-সম্বন্ধে পৃথক্-ভাবাপন্ন।

পদার্থ মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। উক্ত পরিবর্ত্তনই গতির বোধক; অর্থাৎ যে পদার্থের পরিবর্ত্তন দর্শন করি, সেই পদার্থের সেই পরিবর্ত্তনের প্রতি-তৎপদার্থ-সম্বন্ধিনী একটি গতির পূর্ব্ববর্ত্তিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ গতি আবার তৎপদার্থ-নিহিত বা তৎপদার্থ-সংযুক্তান্য-পদার্থ-নিহিত বেগ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানই কার্য্যকারণানুমান। কার্য্যকারণানুমানের অব্যভিচারিত্বেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়; অর্থাৎ যে অন্তর্নিহিত বেগ বা শক্তি যে ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়াতে গতিকার্য্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পরিবর্ত্তন-কার্য্যের পরম্পরা সম্বন্ধে কারণরূপে অনুমিত হইতেছে, ঐ ধর্ম্মের যদি কুত্রাপি ব্যভিচার দৃষ্ট না হয়, তবেই ঐ অনুমান সত্য এবং যদি ঐ কার্য্য ঐ কারণ ভিন্ন অপর কোন কারণ দ্বারা নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলেও ঐ অনুমান সত্য। উক্ত অনুমানই প্রমাণ করিতেছে যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূল কারণই শক্তি। জড়ের উক্ত কারণত্ব-স্বীকারে অনবস্থাপত্তি হয়। ঐ একমাত্র শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া কার্য্যবিভিন্নতা অনুসারে শক্তির বিভিন্ন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা বা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা স্বরূপশক্তিই বৈদান্তিক ভাষ্যে বিদ্যাশক্তি এবং আধুনিক দর্শন শাস্ত্রে আত্মশক্তি (Psychic force) নামে প্রসিদ্ধা। বহিরঙ্গা বা তমোগুণ-প্রধানা মায়াশক্তি অধুনাতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে রাসায়নিক শক্তি(Chemical force) সংজ্ঞাতে অভিহিতা হয়েন। তটস্থা বা রজোগুণাত্মিকা দৈব শক্তিরই নামান্তর শারীর শক্তি (Phisical force)। যে শক্তি দ্বারা আকর্ষণ বিশ্লেষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম রাসায়নিক শক্তি। ঐ শক্তিই আবার ভিন্ন ভিন্ন

কার্য্যদ্বয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দুই আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যথা,—যে শক্তি যাবদীয় পদার্থের গতি রোধ করে তাহার নাম মহাকর্ষণ শক্তি (Magnetic force) যে শক্তি দ্ব্যণুকের কম্পন বিধান করে, তাহার নাম তৈজস শক্তি এবং যে শক্তি আলোক উৎপাদন করে তাহার নাম তাড়িত শক্তি (Electric force)। শারীরশক্তিও রাসায়নিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জীবনী শক্তি ও কৈশিকী শক্তি। যে শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সজীব রাখে, তাহার নাম জীবনী শক্তি (Vital force) এবং যে শক্তি ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের গতিবিধান করে, তাহার নাম কৈশিকী শক্তি (nerve force)।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তিই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সামঞ্জস্যভাবে এই বিশ্ব মধ্যে কার্য্য করিতেছে। ঐ কার্য্য সকলের সুশৃঙ্খলার জন্য যেখানে যে শক্তির যে পরিমাণে থাকা আবশ্যক তথায় সেই পরিমাণেই সেই শক্তি কার্য্য করিতেছে। ঐ সকল শক্তির মধ্যে কোন কোন শক্তি আমাদের সম্বন্ধে বিশেষ বেদ্যা এবং কোন কোন শক্তি সামান্য বেদ্যা। সামান্যবেদ্যা হইলেও এককালে অবেদ্যা নহে। সুতরাং সমস্ত অব্যভিচারিণী শক্তিরই কার্য্যকারিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, এবং প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীন বিশ্বান্তর্গত মানবে অবস্থান অপরিহার্য্য সত্য।

যে নিয়মে স্ত্রীজাতীয় ক্ষয়বর্দ্ধনশীল অণুর সহিত পুংজাতীয় অণুর সংযোগে দ্ব্যণুক শরীরের উৎপত্তি—যে নিয়মে পুংজাতীয় বীজাণু ও স্ত্রীজাতীয় বীজাণুর সংযোগে তরুলতাদি উদ্ভিজ্জগণের উৎপত্তি—যে নিয়মে উভয় জাতীয় দেহাণুর সংযোগে স্বেদজ দেহের উৎপত্তি—যে নিয়মে উভয় জাতীয় রেতাণুর সংযোগে অণ্ডজগণের উৎপত্তি—সেই একমাত্র প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীনে স্ত্রীপুংজাতীয় শোণিত-শুক্র-সংযোগে নিকৃষ্ট জরায়ুজক্রমে উৎকৃষ্ট জীব মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। যে নিয়মে উভয়-জাতি-সংযোগোৎপত্তিবশতঃ প্রতি দেহেই উভয় জাতীয় চিহ্ন লক্ষিত হয়—যে নিয়মে তরুলতা কীটপতঙ্গ সকল শরীরেরই অঙ্গদ্বৈত লক্ষিত হয়—যে নিয়মে পশুশরীরে স্বসম্পূর্ণ দুই সমান অংশ বা সমান শরীরদ্বয় লক্ষিত হয়—সেই একই প্রাকৃতিক নিয়মক্রমে মানব শরীরেরও সর্ব্বাংশেই স্বসম্পূর্ণ দুইটী দুইটী করিয়া প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়! অধিক কি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবের মনোযন্ত্রের আধারভূত মস্তিষ্কও দুইটী সমান স্বসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। স্বকারণসম্ভূত ঐ দ্বৈতভাব, পূর্ব্বপ্রোক্ত প্রতিক্রিয়াতেই শক্তির পূর্ব্বভাব এবং ঐ ইচ্ছাশক্তির অজ্ঞাতসারেও কোন কোন স্থানে কার্য্যের উৎপত্তি প্রভৃতি পর্য্যালোচনার্থই দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব। ক্ষুদ্র মানব নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া

ঐ সকল তত্ত্বের গূঢ় রহস্যের উদ্ভাবনে আপনাকে শক্তিহীন বিবেচনা করিয়াই আত্মজিজ্ঞাসু হয়েন এবং আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়েন। আত্ম-চিন্তা-সাগরের একমাত্র তরণী দর্শন শাস্ত্র। বিজ্ঞান উহার উপাদান এবং ন্যায়শাস্ত্র তরণীর নির্ম্মাণকর্ত্তা। ন্যায় বা বিচার শাস্ত্র কর্ত্তৃক বিজ্ঞানোপাদানে নির্ম্মিত দর্শন প্রতিমূর্ত্তিই মানবের সর্ব্বপ্রধান আরাধ্যা এবং উন্নতির অদ্বিতীয় সাধনী।

মনোবিজ্ঞান।

দর্শন শাস্ত্র (Philosophy) দুইভাগে বিভক্ত। মনোবিজ্ঞান (Psychology) অর্থাৎ প্রমাণের তত্ত্বনিরূপক বিজ্ঞান শাস্ত্র (Science) এবং তত্ত্ববিজ্ঞান (Ontology) অর্থাৎ মনোঽতীত সত্য-বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ নিরূপক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাত্মক তত্ত্বজ্ঞান সতের সত্ত্ব ও অসতের অসত্ত্ব ভেদে দ্বিবিধ। সৎসৎ এইরূপে গৃহ্যমাণ বিষয়ের অবিপরীত তত্ত্বজ্ঞানকে সত্ত্বজ্ঞান (অস্তিত্বজ্ঞান) এবং অসৎ অসৎ এইরূপে গৃহ্যমাণ বিষয়ের অবিপরীত তত্ত্বজ্ঞানই অসত্ত্ব জ্ঞান (অভাব জ্ঞান)। দীপ দ্বারা দৃশ্যবস্তুর উপলব্ধি হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাই বস্তুসত্ত্ব জ্ঞান এবং ঐ দৃশ্যের ন্যায় যে বস্তুর উপলব্ধি হয় না; তাহার অভাবরূপ সমস্ত জ্ঞানই অসত্ত্বজ্ঞান। যদি থাকিত তবে উপলব্ধি হইত; যাহার উপলব্ধি হইতেছে না তাহা নাই; এইরূপে নিশ্চয়াত্মক অভাবজ্ঞানই অসত্ত্বজ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই সতের প্রকাশক প্রমাণই অসতের প্রকাশক হয়। এইরূপ প্রমাণ দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হয়। তদনন্তর তদ্বিষয়-প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত ফলের উৎপত্তি হয়। এই হেতু প্রমাণকে ফলজনক বলা হয়। প্রমাণ ব্যতিরেকে বিষয়জ্ঞান হয় না। বিষয়জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি-সামর্থ্যও ঘটে না। জ্ঞাতা বিষয়জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক লিপ্সা বা জিহাসা করিয়া থাকেন। লাভেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা-প্রযুক্ত জ্ঞাতার চেষ্টার নামই প্রবৃত্তি। চেষ্টমান ব্যক্তি বিষয় বিশেষের লাভে বা ত্যাগে ইচ্ছুক হইয়া বিষয়সাফল্য লাভ কিম্বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। সুখও সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণকেই বিষয় বলে। উক্ত বিষয় প্রাণিভেদে অসংখ্য। প্রমাতা অর্থবিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়ের প্রমিতি লাভ করেন। শেষোক্ত বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যে একের অভাব হইলেই জ্ঞানেরও অভাব হইয়া থাকে। যাঁহার লিপ্সা বা জিহাসা হইতে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাঁহাকে প্রমাতা কহে। প্রমাতা যে উপায় বা শক্তি দ্বারা বিষয়প্রতীতি করেন তাহারই নাম প্রমেয়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে যে বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমিতি। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি বিষয় চতুষ্টয়ই অর্থতত্ত্বের নিদান স্বরূপ।

প্রমাণ (Consciousness) বিষয়ী বা প্রমাতার সহিত দ্বিধা সম্বদ্ধ, অর্থাৎ প্রমাণের মূল উপাদান দুইটি,—প্রত্যক্ষ বা উপভূতি (presentative or intuitive) এবং অনুভূতি বা অনুমান (Representative or reflective)। প্রথমোক্ত প্রমাণাংশ-জন্য জ্ঞানের সাধারণ নাম বিভাবন (Intuition); শেষোক্ত জ্ঞানের (phenomena) সাধারণ নাম উদ্ভাবন (Thought)।

দ্রব্য, ক্রিয়া কিম্বা গুণরূপ বিষয়ত্রয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ; অর্থাৎ উক্ত বিষয়ত্রয়ের স্থানবিশিষ্টতা বা কালবিশিষ্টতা বা আধার ও কাল এতদুভয় বিশিষ্টতা বিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞানের নামই প্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বতঃ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (Directly) বিষয়নিষ্ঠ বিশেষ জ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান (Individual notion) এবং সামান্য জ্ঞান বা জাতিজ্ঞান (General notion) পরতঃ ও পরম্পরা সম্বন্ধে (Indirectly) পূর্ব্বোক্ত বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের উপস্থিতি জ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞানের নাম অনুমান।

আমি এক্ষণে আমার সম্মুখস্থ ভূমিতে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলাম। ঐ বৃক্ষ বস্তুটি কি? তাহা আমি জ্ঞাত নহি। অতএব সূত্রনির্দ্দেশে অর্থাৎ কি লক্ষণে বা কোন্ কোন্ গুণ বিশিষ্ট হইলে বস্তুকে বৃক্ষ বলে, তাহা বলিতে অক্ষম। দর্শনে এই মাত্র বোধ হইল যে, আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত একটি বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ (Affection) হইয়াছে। এই জ্ঞান আমার আদি জ্ঞান; ইহারই নাম প্রত্যক্ষ। পরে সম্মুখবর্ত্তী ভূমি ও গৃহাদি সমস্ত দৃশ্য বস্তু হইতে বা ঐ সকল দৃশ্য বস্তুর গুণ সকল হইতে বৃক্ষকে বা বৃক্ষের গুণ সকলকে ভিন্ন বোধ করি ও ঐ সকল গুণের মিলনে বৃক্ষরূপ একটি বিশেষ বস্তু অনুভব করি। তৎকালেই ঐ সমবেত গুণগুলির উপর বৃক্ষত্ব রূপ একটি ধর্ম্মজ্ঞান বা সামান্য জ্ঞান হওয়াতেই ঐরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তু মাত্রই বৃক্ষ, এই জ্ঞান হয়। এই শেষোক্ত জ্ঞানই সামান্য জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের নাম বিশেষ জ্ঞান। ভবিষ্যতে স্থানান্তরস্থ কোন বস্তু দর্শনে পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুটি ভাবনা (Thinking) শক্তির প্রভাবে স্মরণ পূর্ব্বক পরস্পরের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ দ্বারা বস্তু নির্ণয় করিয়া থাকি। এই ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান উভয়বিধ জ্ঞানের নামই অনুমান।

শারীরপ্রত্যক্ষের ন্যায় মানস প্রত্যক্ষেরও ভেদ ঐরূপ। আমি ক্রোধ উপলব্ধি করিতেছি; যখন ক্রোধ উপলব্ধ হয়, তখন মনের যে কেবল একটি বেগ উপলব্ধ হয়, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। পরক্ষণেই ঐ বেগকে মনের অপর বেগ হইতে ভিন্ন মানসিক বৃত্ত্যন্তর বোধ করি;' ক্রোধবেগ-বোধই উক্ত-ক্রোধ-বৃত্তি হইলে বিশেষজ্ঞান এবং ক্রোধমাত্র-বৃত্তি হইলে সামান্য

জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। কালান্তরে আমি আমার অতীতাবস্থায় চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বোপলব্ধ ক্রোধবেগ স্মরণ পূর্ব্বক তৎকালানুভূত লোভাদিবৃত্তির সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য চিন্তা দ্বারা বস্তু নিরূপণ করি। উক্ত প্রকার রীতি-দ্বয়বিশিষ্ট জ্ঞানকেই অনুমান বলে। প্রথম রীতি,—তৎপ্রদেশে এবং তৎকালে একমাত্র বা অনেক বিষয়বৃত্তি ধর্ম্মজ্ঞান এবং দ্বিতীয় রীতি,—কালান্তরে স্থানান্তরোপলব্ধ বস্তুর ধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুধর্ম্মের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য বিচার পূর্ব্বক বস্তু-বিনির্ণয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের মূল উপাদান দুইটী,—প্রমাতৃ বিষয়ী Conscious subject) এবং প্রমেয় বিষয় (Concievable object)। অনুমান প্রমাণের মূল উপাদান তিনটি,—প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি। কোন কোন দার্শনিক উক্ত প্রমাণের সম্বন্ধ (Relation) নামক অপর একটি পৃথক উপাদান স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ পৃথক উপাদান নহে; উহা উল্লিখিত উপাদান সকলের শক্তিপ্রকাশের অবস্থামাত্র। সম্বন্ধ বিনা প্রমাণ সিদ্ধ হয় না। ঐ সম্বন্ধ দুই অংশে বিভক্ত;—সমবায় (Limitation) ও বিশেষ (Difference)। এই সম্বন্ধদ্বয়ই ন্যায়শাস্ত্রের অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক মহানিয়ম দ্বয়। (Law of identity and contradiction)।

সমস্ত পদার্থই প্রমাণের বিষয়। লক্ষিত কাল ও আধারের অধিকারী প্রমেয় মাত্রই পদার্থ।

আমার সম্মুখস্থিত দৃষ্টিগোচর পত্র যেমন একটি বিষয়; ফল, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড, বৃক্ষ, বন ও বায়ু প্রভৃতিও তদ্রূপ বিষয়। প্রত্যেকেই কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাকেই বাহ্যপ্রত্যক্ষ কহে। এইরূপ আমরা যে ক্রোধাদি অনুভব করি, তাহাও কিছু কাল অধিকার করিয়া আছে, ইহাদিগের নাম আন্তরপ্রত্যক্ষ। বিভাবন (ভাবনা ব্যতিরিক্ত জ্ঞান) উদ্ভাবন (ভাবনা সমুথ জ্ঞান) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ; পরিণামী বিভাবনজ্ঞান কাল ও আধারের অধিকারী; কিন্তু অপরিণামী উদ্ভাবনজ্ঞান কাল ও আধারের অধিকারী নহে। বিভাবনা শক্তি দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান; কিন্তু উদ্ভাবনা শক্তি দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা পরম্পরা সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর প্রতিকৃতি জ্ঞান মাত্র। ঐ প্রতিকৃতি (Image) বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের জনয়িত্রী।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

বৈদিক বৃত্তান্ত।

আসিয়াখণ্ডের দক্ষিণ দিকে যে তিনটি উপদ্বীপ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে মধ্যস্থ উপদ্বীপ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। প্রাচীন যুনানীদিগের নিকট ইহা 'ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত ছিল এবং তদনুসারে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজেও এই নাম প্রচলিত হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উত্তর দিকে তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত বিরাজিত; পশ্চিমদিকে নদরাজ সিন্ধু কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতমালা; দক্ষিণ দিকে ভারত-মহাসাগর পরিখারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন কালে সিন্ধু নদের পশ্চিমস্থ নানা স্থানও ভারতবর্ষের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বর্ত্তমান সাময়িক আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত। ইদানীন্তন কালে ইহা স্বতন্ত্র দেশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থান প্রাচীনকালে অরণ্যময় ছিল। নানা প্রকার অনার্য্যজাতি এই সমস্ত অরণ্য মধ্যে আপনাদিগের অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ইদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে মঙ্গলিয়া-বাসী-জাতি-সম্ভূত বলিয়া অনুমান করেন। বাস্তবিক এই সমস্ত অনার্য্যগণ যে কোন্ জাতীয় মানব-জাতি-সম্ভূত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী; ইহারা সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। পৃথক পৃথক স্থানে বাস করাতে আদিম নিবাসিগণ নানা জাতিতে বিভক্ত এবং নানা প্রকার অবস্থাপন্ন ছিল। এই সমস্ত জাতির কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এই সমস্ত জাতির কিয়ৎ পরিমাণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে এই সমস্ত জাতি সম্বন্ধে আর্য্য-জাতির মধ্যে যে নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহা পৌরাণিক গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিখিত আছে। এই সমস্ত জাতিগণের বংশধরগণ অদ্যাপি ভারত বর্ষের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের অবস্থা সমালোচনা করিলেও প্রাচীন সাময়িক অনার্য্যদিগের অবস্থার অনুমান করা হইতে পারে।

আদিম নিবাসিগণের কোন কোন জাতির মধ্যে একদা কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। কোন কোন জাতি এক প্রকার ভাষায় কথোপকথন করিত। তাহাদের মধ্যে ভাষা প্রচলিত ছিল না। তাহারা নৈসর্গিক ভাষায় অনেক ভাব ব্যক্ত করিত। এতাদৃশাবস্থাপন্ন মানব

জাতি অদ্যাপি পৃথিবীর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৭৭৭ শকে যৎকালে ইংলণ্ডবাসিগণ প্রথমতঃ আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন তৎকালে আণ্ডামানবাসীদিগের মধ্যে কোন প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল না। তাহারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করার জন্য এক প্রকার উৎকট শব্দে চীৎকার করিত।

যাহাদের মধ্যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহারা সেই ভাষায় কথোপকথন করিত। অদ্যাপি সংস্কৃত ভাষায় যে সকল ধাতু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন ধাতু অনার্য্য-ভাষা-সমুৎপন্ন বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎগণ, নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমাদের বঙ্গভাষায় যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে তন্মধ্যেও কোন কোন শব্দ অনার্য্যদিগের ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান হয়। (১) এই সকল অনার্য্যদিগের মধ্যে ভাষা প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার বর্ণমালা বা সাঙ্কেতিকাক্ষর প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বৈদিক গ্রন্থে হিন্দুরা তৎকালিক অনার্য্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ দস্যু, অসুর প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; এই সকল অনার্য্যগণ নাসিকাশূন্য, স্থূলনাসিকা নানা প্রকার পশুর মুখাকৃতি মুখবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা আমমাংসভোজী মনুষ্যখাদক, যজ্ঞের বিঘ্নকারী, উলঙ্গ এবং অন্যান্য নানা প্রকার বিশেষণে রঞ্জিত হইয়াছে।

বাস্তবিক বৈদিক কালে, সমস্ত অনার্য্যগণ একদা সম্পূর্ণ অসভ্যাবস্থাপন্ন ছিল না। কোন কোন জাতি অসভ্যাবস্থায় কাল কর্ত্তন করিত, কেহ কেহ অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় উন্নত হইয়াছিল। কোন কোন জাতি ধাতুময় অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবহার করিত। কোন কোন জাতি ধাতুর ব্যবহার অবগত ছিল না, তাহারা প্রস্তর দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিত। নর্ম্মদার তটস্থ প্রদেশে প্রাচীন অসভ্য জাতির নির্ম্মিত নানা প্রকার অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (২) ভারতের আদিম নিবাসিগণ মধ্যে অপেক্ষাকৃত সভ্যাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ এবং নানা স্থানে কতকগুলি নগর সংস্থাপন করিয়াছিল। তাহারা প্রস্তর দ্বারা স্থাপত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত বলিয়া অনুমান হয়। যুধিষ্ঠির নরপতির আশ্চর্য্য সভা-নির্ম্মাতা ময় স্থপতি দানব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে ভারতের অনার্য্যকুলপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ করা যাইতে পারে না। এই শ্রেণীস্থ অনার্য্যগণ মৃতদেহ মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রস্তর দ্বারা সমাধি নির্ম্মাণ করিত, অদ্যাপি কোন কোন স্থানে এইরূপ সমাধির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া

(১) ঢেকী, কুলা ইত্যাদি।

(২) চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

থাকে। অনার্য্যগণ মৃত্তিকাদ্বারা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট পাত্র নির্ম্মাণ করিত এবং লৌহময় ক্ষেপণশীল অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে তীরচালন শিক্ষা করিয়াছিল। স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুময় অলঙ্কার পরিধান করা অনার্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল এবং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অনার্য্যগণ মৃতদেহ মৃত্তিকা-প্রোথিত করার পূর্ব্বে নানাপ্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত করিত। মৃগয়া দ্বারা নানা প্রকার পশু পক্ষী বধ করিয়া তাহার আম মাংস ভক্ষণ দ্বারা অনার্য্যগণ উদর পূরণ করিত। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃষিকার্য্য প্রচলিত ছিল না। অনার্য্যদিগের মধ্যে এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বর্ণিতাবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থাপন্ন অনার্য্যগণ প্রস্তরময় ক্ষেপণশীল অস্ত্র ব্যবহার করিত। ইহারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃতদেহ অরণ্যে নিক্ষেপ করিত। নিতান্ত অসভ্যাবস্থাপন্ন অনার্য্যদিগকে অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা অদ্যাপি কোন প্রকার বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করে না। শীতের আধিক্য হইলে রাত্রিকালে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বে নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়া থাকে।

অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করা এবং কোন কোন সময়ে এক পরিবারস্থ ভাতৃগণ একত্র হইয়া এক রমণীর পাণি গ্রহণ করা অনার্য্য সমাজে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইত, মলয়বর প্রদেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন বহু পুরুষ কর্ত্তৃক এক রমণীর পাণি-গ্রহণ-প্রথা বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তৎসম্বন্ধে আমরা স্থলান্তরে সমালোচন করিব।

আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে অনার্য্যগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। এক দল আর্য্য জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। তাহাদের বংশধরগণ এক্ষণ সভ্য সমাজে আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এক শ্রেণীস্থ অনার্য্যদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় পার্ব্বত্য প্রদেশে আবাস করে। তাহারা এক্ষণ ভীল, কোল, সাঁওতাল, কোচ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। একদল এক্ষণ অপেক্ষাকৃত সভ্য, তাঁহারা তামিল এবং তেলেগু ভাষায় কথোপকথন করেন।

তামিল এবং তেলেগু অনার্য্য-বংশসম্ভূত। পশ্চাৎ কালে তাঁহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু মাতৃভাষা অদ্যাপি তাহাদের অনার্য্যোৎপত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা স্থানান্তর হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববাসস্থানে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণও আবাস করিতেন। ইয়োরোপীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষ এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ একজাতি সম্ভূত, এবং তাহারা সকলেই একস্থানে একত্র আবাস করিতেন।

শারীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং দেবতত্ত্ব দ্বারা ইয়োরোপীয় জাতিগণ এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি একজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রিচোর্ড সাহেব পৃথিবীর নানা জাতির মস্তকাস্থি পরীক্ষা করিয়া ইয়োরোপীয় জাতিগণের মস্তকাস্থির অবয়বের সাদৃশ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির মস্তকাস্থি পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মস্তকাস্থির সাদৃশ্য দ্বারা এতাদৃশ দুরূহ প্রশ্ন মীমাংসা করা অসম্ভব বিবেচনায় কেহই তৎকালে এই মত অনুসরণ করেন নাই।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা প্রচলিত হইলে প্রিম, বপ, হামবোল্ট এবং মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত, যুনানী ভাষা লাটিন ভাষা এবং টিউটনিক প্রভৃতি প্রাচীন ইয়োরোপীয় ভাষা সমস্তই এক ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শব্দশাস্ত্র এক্ষণ পণ্ডিত সমাজে সর্ব্বত্র আদরণীয় এবং ইহা অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সমাদরে গৃহীত, ইহার প্রমাণ কোন প্রকারেই অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এই সকল ভাষার বহুবিধ শব্দ এবং ধাতু একরূপ; ব্যাকরণের নিয়ম, বিভক্তি এবং প্রত্যয়ও কোন কোন স্থলে একরূপ থাকা দৃষ্ট হয়। অতএব এই প্রাচীন ভাষা যে জাতি কর্ত্তৃক কথিত হইত তাঁহাদের বংশধরগণ ইয়োরোপ ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিয়া আবাস স্থাপন করার পরে দেশ ভেদে সেই প্রাচীন ভাষা নানা ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন এক জাতি কখন স্বীয় ভাষা একদা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরের ভাষা মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত বিরল। ইয়োরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পূর্ব্বে অন্য কোন ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহারা অতি প্রাচীন কালে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা কোন প্রকারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইয়োরোপীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের দেবতত্ত্বের আলোচনা করিলেও তাহা ব্রাহ্মণদিগের দেবতত্ত্বের সহিত সদৃশভাবাপন্ন থাকা দৃষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণদিগের ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ যুনানীদিগেরও আরাধ্য ছিলেন। ইন্দ্রদেবের বৃত্রাসুর কিংবদন্তীর অনুরূপ কিংবদন্তী প্রাচীন যুনানীদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। যুনানী, রোমক, এবং ব্রাহ্মণদিগের দেবতত্ত্বের সমালোচনা দ্বারা এই সমস্ত ধর্ম্ম এক প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি হইতে, রোমক, যুনানী এবং ভারতীয় আর্য্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

যে জাতি হইতে ইয়োরোপীয় অধিকাংশ সভ্যতম জাতি এবং ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি এবং পারসিকগণ উৎপন্ন হইয়াছে। সে জাতি প্রাচীন আর্য্য জাতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহারা কোন্ স্থানে আবাস করিতেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তাহারা ভারত বর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থেও তাহাদের একটী পূর্ব্ব বাসস্থান থাকা জ্ঞাত হওয়া যায়। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে তাঁহাদের একটি প্রাচীন বাসস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে। তাহার একস্থানে লিখিত আছে, "হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের পুরাতন নিবাস স্থানের সর্ব্বরক্ষক প্রভু ছিলেন। এবং আপনাকে বহুজনের পালক বলিয়া আমার পিতা পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতেন, তদনুসারে আমি এক্ষণ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।" (৩) স্থানান্তরে লিখিত আছে "সপ্তধাম বিশিষ্ট যে পৃথিবী হইতে [পৃথিবীর যে স্থান হইতে] বিষ্ণুপাদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" (৪) এই সকল ঋক্ পাঠ করিলে আর্য্যজাতির ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে বাসকরা এবং তথা হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই প্রাচীন আর্য্যজাতি আসিয়ার মধ্যস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহারা যে শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন, ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তাঁহাদের আচরণ শীত প্রধান দেশের অধিবাসীদিগের ন্যায় ছিল এবং তাহারা শীত ঋতু দ্বারা বৎসর গণনা করিতেন।(৫) বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় হিমানী শব্দ বৎসর-বোধকরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। আসিয়াখণ্ড মানবজাতির আদিম বাসস্থান, তন্মধ্যে শীতপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের উত্তরদিকে অবস্থিত। আর্য্যজাতি পূর্ব্বে ইহার কোন স্থানে বাস করিতেন। প্রাচীন গ্রন্থে উত্তরদিকে দেবগণের আবাসস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় তাঁহাদের প্রাচীন বাসস্থান বলিয়া তাঁহারা উত্তরদিকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন।

প্রাচীন আর্য্যজাতি, আসিয়ার কোন্

(৩) সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা দুইটি ঋক এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম অর্থাৎ (১) এবং (২) অনুপ্রত্নস্যৌকসো হুবেতু বিপ্রতিং নরং। যংতে পূর্ব্বং পিতাহুবে ॥১।৩০।৯

(৪) অতো দেবা অবন্তুনো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ। ১। ২২। ১৬

(৫) ঋগ্বেদ ১। ৮০। ৫ ঋক্, ১। ৬৪। ১৪ ইত্যাদি ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

প্রদেশে বাস করিতেন, তৎসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভারতের উত্তরদিকে, উত্তর কুরুবর্ষ বলিয়া এক দেশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে এই প্রদেশের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন, তথায় মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত এবং সর্ব্বদা দেববির্গণের চরিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চৈত্ররথ নামে উৎকৃষ্ট বন এই প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। রামায়ণের উত্তর কুরুবর্ষের এতাদৃশ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। (৬) অনেকে অনুমান করেন যে, এই উত্তর কুরুবর্ষই আর্য্যজাতির প্রত্নৌক, তাঁহারা এই স্থান হইতে ক্রমে ইউরোপের নানা দেশে এবং ভারতবর্ষে উপনীত হন। ঢাকা কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রমানাথ সরস্বতী বলেন যে ইন্দ্রালয় নামে ভারতবর্ষের উত্তরদিকে এক প্রদেশ ছিল। হিন্দুরা প্রথমতঃ সেই প্রদেশে বাস করিতেন। ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ককেশশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থান। বাস্তবিক আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থান নিঃসন্দেহ রূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

উত্তর কুরুবর্ষ প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান বলিয়া বিবেচনা করিলেও তাহা বর্ত্তমান কোন্ প্রদেশে অবস্থিত তাহা নিরূপণ করাও সহজ নহে। উত্তর কুরুবর্ষ সম্বন্ধে, মুরসাহেব অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (৭) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রদেশের যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে তদ্দ্বারা উত্তর কুরুবর্ষ ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্যের অভিমান বর্ণনোপলক্ষে উত্তর কুরুবর্ষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুনানী ভূগোলবেত্তা টলেমী উত্তর কুরু প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উত্তরকুরুবর্ষের উত্তরদিকে মনুষ্যখাদক রাক্ষসগণের বাসস্থান ছিল। রামায়ণে উত্তরকুরুবর্ষের উত্তরে মহাসাগর বর্ত্তমান থাকা জ্ঞাত হওয়া যায়। অধ্যাপক লাসেনের মতে কাসগড়ের পূর্ব্বভাগ উত্তর কুরুবর্ষ প্রদেশ। অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও প্রায় তদ্রূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

জনষ্টোন সাহেব কৃত আসিয়ার মানচিত্রে ককেসস পর্ব্বতমালার উত্তরদিকে ইন্দ্রালয় নামক একটি স্থান দৃষ্ট হইবে। উহা সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত ইন্দ্রালয় বলিয়া অনুমান হয়। ইন্দ্রদেব প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রত্ননিবাসে তাহাদিগের রক্ষক ছিলেন বলিয়া ঋগ্বেদের নানা স্থানে বর্ণিত আছে। অমরকোষ শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি নানা কোষে ইন্দ্রালয় নামক একটি প্রদেশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রালয় এবং উত্তর কুরুবর্ষ সংলগ্ন স্থান। এই সমস্ত বৃত্তান্তের সমালোচনা

(৬) সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী। দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥

করিলে ককেসশ পর্ব্বতমালার নিকটবর্ত্তী শীতপ্রধান পার্ব্বত্যস্থান আর্য্যজাতির প্রত্নৌক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনান্য দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন যুনানীগণ তাঁহাদের দেশের পূর্ব্বদিকে দেবতাদিগের আবাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই নির্দ্দেশ দ্বারা প্রাচীন গ্রীশ হইতে আর্য্যজাতির প্রত্নৌক পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পারসিক জনও পূর্ব্বদিকে দেবতাদিগের আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষের উত্তর অথচ পারস্য দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের মধ্যে কোন স্থান যে প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

ইয়োরোপীয় জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমতঃ প্রত্নৌক হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আর্য্যজাতির ন্যায় পরাক্রান্ত থাকাতে পশ্চিম যাত্রী আর্য্যজাতি এই সমস্ত দেশে আবাস স্থাপনের সুবিধা করিতে না পারিয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইউরোপখণ্ডে উপস্থিত হইয়া তথায় স্ব স্ব আবাস স্থাপন করেন। এই প্রত্নৌক হইতে এক দল গ্রীশ দেশে উপনীত হইয়া কালক্রমে প্রাচীন এথেন্স ও স্পার্টা নগর সংস্থাপন করেন; এক দল ইতালীতে গমন করেন এবং তথায় জগদ্বিখ্যাত রোমনগর নির্ম্মাণ করেন। এক দল জর্ম্মেনির অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং উত্তরকালে রোমনগর ধ্বংশ করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রত্নৌক হইতে দলে দলে লোক ইয়োরোপ খণ্ডে উপনীত হইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির এবং পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলের পরে প্রত্নৌক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা ইয়োরোপীয় জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রত্নৌক পরিত্যাগ করার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাসে বাস করেন।

এইস্থানে আর্য্যজাতি একপ্রকার সভ্যাবস্থায় উন্নত ছিলেন। হিন্দুদিগের ঋগ্বেদ এবং পারসিকদিগের আবস্তাজেন্দ হইতে "প্রাচীন আর্য্যজাতির" কিয়ৎপরিমাণ বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ জগতের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। আবস্তাজেন্দও বোধ হয় শকাব্দার অন্যূন দ্বাদশশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। ইদানীন্তন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্র হইতেও প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় যে বস্তু এক শব্দদ্বারা বাচ্য, তদ্দ্বারা 'প্রাচীন আর্য্যজাতির' সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ, আবস্তাজেন্দ এবং শব্দশাস্ত্রই প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাসের মূল উপাদান।

আবস্তাজেন্দের বিবরণ অনুসারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে প্রাচীন আর্য্যজাতিরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। একদল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মৃগয়াবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদল পশুপক্ষী পালন করিয়া তাহাদের মাংস এবং দুগ্ধ দ্বারা উদর পূরণ করিতেন এবং অন্য একদল কৃষিকার্য্য করিয়া অর্জিত শস্য দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিতেন। অতি প্রাচীন সাময়িক সমাজে এইরূপ তিন শ্রেণীস্থ লোক থাকা নিতান্ত সম্ভব। মৃগয়াবলম্বিগণ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অসভ্য এবং প্রচণ্ড-স্বভাব; পশুপালকগণ অলস, অনধ্যবসায়ী এবং কৃষকগণ স্থির, ধীর এবং অধ্যবসায়ী। মৃগয়াবলম্বী এবং পশুপালকগণ সময় সময় পশু প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং পশ্বাদির আহারোপযুক্ত উত্তম তৃণাদি প্রাপ্ত হইবার জন্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন; এবং তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে সহজে সঙ্গে নেওয়ার উপযুক্ত গৃহ অথবা অন্য কোন প্রকার আবাসের উপযুক্ত আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিতেন। কৃষকগণ তাঁহাদের ক্ষেত্রের অনুরোধে একস্থানে অবস্থান করিতেন এবং সুদৃঢ় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া আবাস করিতেন। গমনশীল পশুপালক এবং মৃগয়াবলম্বিগণ কেবল তাহাদের স্ব স্ব পরিবারস্থ এবং দলস্থ লোকের জন্য চিন্তা করিতেন। তাঁহারা আবাসস্থানের উন্নতির কোন চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু কৃষকদিগের নিকট তাঁহাদের দেশ এবং জাতি তুল্যরূপে আদরণীয়; তাঁহারা সর্ব্বদা দেশের মঙ্গলার্থ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। পশুপালকগণ এই প্রদেশে গো, মেষ প্রভৃতি পশুপালন করিতেন।

এই প্রদেশে প্রাচীন আর্য্যজাতি যৌত পরিবারে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। যৌত হিন্দু পরিবারের আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পূর্ব্বে উৎপত্তি হইয়াছে। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দুগ্ধ পান করার উদ্দেশ্যে গো এবং মহিষাদি পালন করিতেন। পরিবারস্থ কন্যাগণ দুগ্ধ দোহন করিতেন বলিয়া অদ্যাপি আর্য্য সমাজে কন্যাগণ দুহিতা শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন। এই প্রদেশে সমাজের মূলীভূত কারণস্বরূপ বিবাহ প্রথা আর্য্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সম্বন্ধ এস্থানেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সকল শব্দ "প্রাচীন আর্য্যজাতির" ভাষাসম্ভূত সমুদায় ভাষারই একরূপ। প্রাচীন আর্য্যজাতি কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশুপালন করিতেন। এই প্রদেশে ভীষণ জন্তু মধ্যে ঋক্ষ বৃক প্রভৃতি পশুগণ আর্য্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল এবং ভীষণ সর্পগণ কখন কখন তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রী——

বঙ্গবাসীর ইউরোপ যাত্রা।

কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া ফ্রান্স গমন।

আমি দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় লোক, নানাস্থানের নৈসর্গিক শোভা এবং প্রাচীন নগরাদি সন্দর্শন করিয়া একজন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী নামে খ্যাত হইব, ইহা আমার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা। যে সময় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, সেই যৌবনাবস্থায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগর সমূহ সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছি। উৎকলে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি, গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম, বৈদ্যনাথে শিবলিঙ্গ, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, প্রতিষ্ঠান পুরীতে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম সন্দর্শন করিয়া জীবনকে পবিত্র করিয়াছি। এখন আবার যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া রোমের সেণ্টপিটর্শ, মাইকেল এন্‌জিনোর নির্ম্মিত খৃষ্টের পবিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিতে উদ্যোগী হইলাম। ইউরোপ গমন করিবার ইচ্ছা একবৎসর হইতে আমার হৃদয় প্রবলরূপে আক্রমণ করিল। দিবানিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইউরোপ যাইবার ও তথায় অবস্থিতি করিবার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অতি যত্নের সহিত Murrays Guide পুস্তক সমূহ হইতে পাঠ করিয়া বিখ্যাত যে যে; ছাত্রের ন্যায় তাহা কণ্ঠস্থ করিলাম। ষ্টীমারে গমনাগমনের তত্ত্ব আফিসের সাহেবদিগের নিকট হইতে জানিয়া রাখিলাম। অবশেষে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য হইতে এপ্রিল মাসের শেষে আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা হইতে ইউরোপ যাত্রা করিলাম। আমার ইউরোপ গমনের উদ্দেশ্য দেশ পর্য্যটন ও ব্যবসা শিক্ষা। বাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতি সম্ভাবনা নাই, এটী আমার অত্যন্ত বিশ্বাস, সেজন্যই ইউরোপ গমন করিয়া কোন একটী ব্যবসা শিখিয়া নিজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিব এবং সেই সঙ্গে দেশেরও হিতসাধন করিতে সক্ষম হইব এই অভিপ্রায় করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলাম। আমারা প্রকৃত মসীজীবী কিন্তু তাহাতে যে নিজের ও দেশের কিছু উন্নতি সাধন করিতে পারি, সে আসা একবারেই নাই। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী না হইলে স্বদেশ উন্নতির চেষ্টা দূর পরাহত।

স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অর্ণবপোতে উঠিবার সময় পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কোথায় অনেক দূরদেশে যাইতেছি, কি ঘটিবে, এই চিন্তা আসিয়া মনোরাজ্য আক্রমণ করিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল, আমরা ধীরে ধীরে পুত্তলিকার মত

স্পন্দহীন জড়পদার্থের মত ক্যাবিনে আসিয়া বসিলাম, শেষে অনেক ভাবিয়া পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা করিলাম ও এই ভাবিলাম——

"প্রবাসে দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খশে
এদেহ আবাস হতে,
নাহি খেদ তাহে।"

আমার সঙ্গী ভ্রাতা কোমল হৃদয়। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে দুঃখ বেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া গালে হাত দিয়া চক্ষু ছল ছল করিয়া বসিয়া থাকিলেন এবং আমার কথায় শেষে ছিত্ত স্থির করিলেন। ষ্টীমার দ্রুতগমনে ক্রমে চলিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিলাম। আমরা কতক্ষণে সমুদ্রের গভীর নীলজলে আসিয়া পড়িব, তাহাই দেখিবার জন্য দূরবীক্ষণ হাতে করিয়া পোতের উপর উঠিলাম। জাহাজের উপর অনেক সাহেব, বিবি, বালক বালিকা আছে। সকলেই ইউরোপ চলিয়াছে। আমরা কএকজন দেশীয় লোক, দেবলোকের সঙ্গে সমকক্ষভাবে, কোথায় চলিয়াছি; তাহা জানিবার জন্য কএকজন শ্বেতপুরুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা ভ্রমণকারী ইউরোপ দেখিতে যাইতেছি শুনিয়া একবারে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। কএকজন অতি উত্তম স্বভাব সাহেব আমাদিগের সহিত অতীব সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমরা বিদেশ গমন করিয়া কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিব, তাহার অনেক সদুপদেশ সেই কএকজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম বিশেষতঃ মেং S সাহেব মহাশয়ের অকৃত্রিম ভদ্রতা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। ষ্টীমারে কএকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজমহিলা ছিলেন, তাঁহারা আমাকে নেটিভ বলিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন না। এক টেবিলে আহারের সময় একটী সম্ভ্রান্ত গুণবতী মহিলা আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই সকল দেখিয়া একদিন একটী ইংরাজ যুবক আর একজন তাঁহার সঙ্গিকে, আমি নেটিভ, অকুতোভয়ে তাঁহাদিগের সঙ্গে সমান ভাবে চলিতেছি, এইরূপ ভাবে কথা বলিতেছে; আমি এই কথাগুলি বেশ শুনিতে পাইলাম এবং তাহার মুখে বিরক্তভাবও দেখিলাম। আমি তাহার দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং সে তখন অন্যদিকে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেল। এই সকল মহাপুরুষগণ ইংরাজজাতি-কলঙ্ক। ইহাদের অত্যাচারে ইংরাজ-রাজ্য-শাসন পর্য্যন্ত দোষ সংযুক্ত বলিয়া দেশীয় সকল লোক বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল নীচ শ্রেণীর লোক ভারতবর্ষের ভদ্রলোককে অপমান করিয়া থাকে। তাহারা এক এক জন ভাবে যে এই ভারত রাজ্য বুঝি তাঁহার নিজের সম্পত্তি। আমরা তাহার দাসানুদাস—সর্ব্বদা তফাৎ দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে থাকিব। এসকল লোক কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বিশেষ রূপে শাসিত না হইলে আর ভারত রাজ্যের মঙ্গল নাই।

ষ্টীমার চলিতে লাগিল। আমরা সত্য সত্যই মহাসমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। এখন আর নদী নাই, সমুদ্রে আসিয়াছি কেবল চারিদিকে জল থই থই করিতেছে। উপরে নীল আকাশ, নীচে নীল জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এক একবার তর তর থর থর করিয়া নীল জলের মধ্য হইতে গুরে গুরে শুভ্র ফেনপুঞ্জ উত্থিত হইয়া আবার সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এমন মহান্ দৃশ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অনন্তসাগরগর্ভে, অনন্ত স্রোত চলিতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। সাগরের অসীম অচিন্তনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া, সেই অশেষ-শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষের যে কত দূর ক্ষমতা, তাহা ক্ষুদ্র মানবের বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। সাগর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ, যত তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করি, ততই হৃদয়ে নূতন নূতন ভাব আসিয়া অধিকার করে।

আমাদিগের ষ্টীমার ক্রমেই পুরাতন হইয়া আসিল। কেবিনটী একটী আবাসগৃহ হইল। এই কেবিনে আমি

এবং আর একটী ইতালীয় রোমান কাথলিক পুরোহিত, উভয়ে বাস করি। পুরোহিত মহাশয় রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া দুই তিন বার উপাসনা করেন। ইহাঁর স্বভাব দেখিলে পবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ হইল। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বেশ কথা বলিতে পারেন। আমরা চারি দিবসে মাদ্রাজ পঁহুছিলাম। সম্মুখে নগর দেখা যাইতেছে। সমুদ্রকূল হইতে জলের মধ্য পর্য্যন্ত কতকদূর প্রস্তর দিয়া গাঁথা আছে। সেই অবরুদ্ধ জলের নাম Break water, তাহার মধ্যে আমাদিগের বাষ্পীয় পোত গিয়া নঙ্গর করিল। আমরা একখানি দেশীয় নৌকায় উঠিয়া নগরের কূলে পঁহুছিলাম। সমুদ্রতট হইতে সহরের যে তাদৃক্ মনোহর শোভা, তাহা বোধ হয় না। বড় বড় অট্টালিকা আছে কিন্তু তাহা এক স্থানে নাই, এখানে ওখানে রহিয়াছে। আমার সম্বাদ পত্র দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল, এজন্য "মান্দ্রাজ মেল" অফিসে যাইয়া, তথা হইতে সেই দিবসীয় একখানি "মেল" ক্রয় করিলাম। কাগজ খুলিয়াই দেখি আবার মাদাম কুঁলো মাদাম ব্লাভাটসকির বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। মধ্যে শুনিয়াছিলাম বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। মাদাম কুঁলো, মাদাম ব্লাভাটসকির সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে দেখি বিবাদ মিটিয়া যাওয়া দূরে

থাকুক পুনরায় আবার নূতন করিয়া বিবাদের সূচনা উঠিল। মাদাম কুঁলোর উদ্দেশ্য কি বুঝা যাইতেছে না। মাদাম ব্লাভাটসকী বিদ্যা বুদ্ধিতে বিশেষ প্রশংসনীয়া। তাঁহার Isis নামক বৃহৎ গ্রন্থে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে। মাদাম কর্ণেল অলকটের সহযোগে থিয়োসফিকেল সোসাইটী সভা সংস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বগৌরব যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কর্ণেল অলকট একজন সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তিনি স্বদেশে থাকিলে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মার্কিনবাসীর প্রিয় পাত্র হইতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ভারতবর্ষে জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া আর্য্যধর্ম্ম আলোচনা করেন। এরূপ সদাশয় ধার্ম্মিক লোকের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়।

মাদ্রাজের রাজপথ ধূলিরাশিপূর্ণ। সহরের ঘর সকল অধিক অংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং ছোট ছোট। বাজার ও ভদ্রলোকের আবাসস্থান প্রায় অপরিষ্কার। এখানে দেখিবার যোগ্য এমন কোন স্থান দেখা গেল না। মাদ্রাজবাসিগণ অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিৎ। এখানকার সকল লোকেই প্রায় ইংরাজী বলিতে পারে। আমাদিগের ষ্টীমারে অনেক ইতরশ্রেণীর মাদ্রাজী ভোজবাজী দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত প্রতারক এবং ঘৃণিতস্বভাবের লোক। এখানে বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেক ভূসুর বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা অধিকাংশ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। আমার এখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ Dr. G. Oppert মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময় অভাব জন্য ঘটিয়া উঠিল না। তিনি বিলুপ্তপ্রায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রযত্নেই এপ্রদেশে দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

মাদ্রাজ হইতে কলম্বো সমুদ্র পথে ৩০৫ ক্রোশ, উহা তৃতীয় দিবসে পঁহুছিলাম। কলম্বোর তটে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদিগের ষ্টীমার প্রস্তরে বাঁধান Break water নিকট নঙ্গর করিল। অনেক সাহেব দেশীয় নৌকায় নগর দেখিতে গমন করিলেন। অপ্রশস্ত লম্বাকৃতি দেশীয় নৌকায় উপবেশনের সুবিধা নাই বরং জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভব। আমরা লঞ্চ ষ্টীমারে পার হইয়া সহরে উঠিলাম। কলম্বো সিংহলের একটী প্রধান নগর। সমুদ্রকূলে স্থাপিত, এজন্য ইহার শোভা অতি মনোরম্য। এখানকার আলোকস্তম্ভ অতি বৃহৎ, অনেকদূর হইতে ইহার গোলাকৃতি দীপালোক দেখা গিয়া থাকে। এখন বৈশাখ মাসের প্রায় অর্দ্ধগত হইয়াছে।

চারিদিকে রৌদ্র এবং ধরাতল মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক, তথাপি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রতাপ তাদৃক্ কষ্টকর বোধ হইল না। চিরবসন্তের ন্যায় সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া থাকে, চারিদিকে আম কাঁঠাল, রুটীবৃক্ষ, দারচিনি গাছ পরিপূর্ণ। এখানকার আম্র অতি সুমিষ্ট এবং তাহার মূল্যও অতি সুলভ।

কলম্বোর একটী নূতন বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। একজন মঠধারী বৌদ্ধ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদির অনেক মূর্ত্তি এবং চিত্র আছে, কিন্তু সকল দেবতারা বুদ্ধদেবকে স্তব করিতেছেন। বুদ্ধদেব শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং অতি প্রকাণ্ড। তাঁহার মূর্ত্তির গঠন মন্দ নহে। আমাদিগের দেশে মন্দিরের মধ্যে এত বড় কোন ঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপিত দেখি নাই। মন্দিরের ভাণ্ড মধ্যে প্রণামী স্বরূপ কিছু দান করিতে হইল। এই নূতন বৌদ্ধ মন্দির ভিন্ন এস্থানে প্রাচীন কোন বৌদ্ধ মন্দির নাই।

কলম্বোতে অতি অল্পকাল হইল, একটী মিউসিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। এস্থানে মৎস্য, মর্গ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির মৃতদেহ ও কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রক্ষিত আছে। অনুরাধাপুরার কএকটী ছোট ছোট সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম। এগুলি অতীব প্রাচীন। প্রায় দুই সহস্র বৎসরের হইবেক।

সিংহল দ্বীপ বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। বিজয় ইহা ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু দিবস জয় করিয়াছিলেন। সিংহলের অন্যান্য সংস্কৃত নাম রত্নদ্বীপ, তাম্রপর্নী এবং লঙ্কা। অনেক হিন্দু সিংহল ও লঙ্কা পৃথক স্থান বলিয়া অনুমান করেন কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। মহাবংশ নামক প্রাচীন গ্রন্থে সিংহল ও লঙ্কা* এক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। লঙ্কাবার্ত্তা নামক গ্রন্থে কেবল সিংহলের পৌরাণিক বিবরণ লিখিত আছে। সিংহলবাসী ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে রামায়ণের কথা জানেন। এখানে সীতাবক নামক একটী স্থান আছে। এরূপ কিম্বদন্তী যে ঐ স্থানে রাবণ সীতাকে কারাগারে রাখিয়াছিল। কলম্বো এবং রত্নপুরার পথের মধ্যে "বিস্থনা পুইলা" নামক একটী স্থান আছে। এরূপ জন-

* সীহবাহু নরিন্দসো যেন সিংহ সমাগ্‌গসো।
তেন ৩৫ সত্ত্ জানন্তা সীহলাতি পবুচ্চয়ে ॥
সীহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা।
তেনেব সীহন্নাম সন্নিতং সীহস্ততা ॥
[মহাবংশ ৭ম পরিচ্ছেদ।]

অর্থ এই যে সীহবাহু রাজা সীহ বধ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাহার পুত্রগণ সীহন বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই সীহনেরা এই লঙ্কা অধিকার করিয়া তাহাতে অধিবসতি করিল। এই নিমিত্ত ইহার নাম সীহল হইল। পালি ভাষায় সীহল আর সংস্কৃত ভাষায় সিংহল এক বস্তু।

শ্রুতি যে সেই স্থানে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন।

সিংহলবাসী লোকে অনেকে এখন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। অনেক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোক রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিয়োজিত আছেন। আমাদিগের সহযাত্রী, একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সিংহলবাসী চিকিৎসক। তিনি পেনসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইয়োরোপীয় স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড গমন করিতেছেন।

আমরা কলম্বো হইতে এডেন ৯ দিবসে গমন করিলাম। এবার স্থল পাইতে বড় দীর্ঘকাল গত হইল। আমাদিগের স্থল না দেখিয়া জলের উপর অনেক দিন থাকিতে বড় বিরক্ত বোধ হইয়াছিল; কিন্তু বিরক্ত বোধ হইলেই বা চলিবে কেন। ষ্টীমার ঝড় বাতাস কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে দিবারাত্র ছুটীতেছে।

এডেন পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। এখানে বৃক্ষ লতা কিছুই নাই। পর্ব্বতের প্রস্তর ধূসরবর্ণ, তাহার প্রাকৃতিক শোভা কিছুমাত্র নাই। লোহিত সমুদ্রের তটে এইরূপ বৃক্ষাদি এমন কি তৃণ-গুল্মবিহীন অনেক পাহাড় আছে। এডেন তেমন দেখিবার মত স্থান নহে। আমরা উহা দেখিতে গমন করিলাম না। কয়েকজন যাত্রী অষ্ট্রীচ পক্ষীর পক্ষ ক্রয় জন্য তীরে গমন করিয়াছিলেন। এখানে কাফ্রি বালকেরা জাহাজের নিকট আসিয়া ডুব দিয়া জলে প্রবেশ করিয়া অনেক গভীর জলের মধ্য হইতে মুদ্রা তুলিবার জন্য যাত্রীগণের নিকট বকশীস চাহে। সাহেবেরা মুদ্রা জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবা মাত্র তাহারা ডুব দিয়া তাহা উঠাইয়া গ্রহণ করে। ইহারা জলের মধ্যে যেরূপ লম্ফ ঝম্ফ তাহাতে তাহাদিগকে জলজন্তু বলিলেও চলে।

আমাদিগের ষ্টীমার পাঁচদিবসে সুয়েজ পঁহুছিল। আমরা ইউরোপের ক্রমেই সন্নিকট হইতেছি ভাবিয়া বড়ই স্ফূর্ত্তি হইতেছে, বিশেষতঃ অদ্য স্থলে উঠিয়া ট্রেণে আলেকজান্দ্রিয়া যাইয়া ভূমধ্য-সাগরের অর্ণবপোত গ্রহণ করিব, এ জন্য সমুদ্রবাসের একঘেয়ে জীবনের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইবে; ইহাও চিন্তা করিয়া বিশেষ সুখ অনুভব হইতেছে। এই ষ্টীমারে কেবল আমরা বঙ্গবাসী ব্রিণ্ডিসি হইয়া ইংলণ্ড যাইবার টিকিট ক্রয় করিয়াছি সুতরাং আমরা ও ভিনিশ যাত্রী রোমানকাথলিক ধর্ম্মযাজক, পোত হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ছোট ষ্টীমারে উঠিয়া সুয়েজের কূলে আসিলাম। বম্বাই হইতে মেল ষ্টীমার না পঁহুছাতে, সুয়েজের মেলট্রেণ অদ্য গমন করিল না, এজন্য সাধারণ ট্রেণেই আমরা যাত্রা করিলাম।

সমুদ্রের ধারে রেলের গাড়ি ছিল, তাহাতে আরোহণ করিলাম। রেলের গাড়ি হইতে সুয়েজ দেখিতে লাগিলাম। এস্থান তেমন মনোহর নহে। বাজারে

কতকগুলো এলোমেলো অপরিষ্কার সাধারণ বস্তু বিক্রয় হইতেছে; রাস্তায় সাজ পোষাক করা গাধায় আরোহণ করিয়া আরবগণ যাইতেছে, দৃষ্টিগোচর হইল। সমুদ্রতট হইতে রেলের গাড়ি সুয়েজ ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। বেলা ৯ টার সময় আলেকজান্দ্রিয়াতে পঁহুছিল। আমরা পথের মধ্যে টেলনেলকাবের নামক স্থান, যেখানে ইংরাজেরা ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহা দেখিলাম। যুদ্ধের পর তথাকার গৃহ সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে সেই সকল লোকশূন্য ঘরগুলি জীর্ণাবস্থায় ক্রমে ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ষ্টেসনে পঁহুছিয়া দেখি লোকারণ্য, গাড়িঘোড়ায় ভিড়, তদ্দেশবাসিগণের যাত্রিগণকে কোন একটা হোটেলে লইয়া যাইবার জন্য উত্তেজনা বাক্যে একবারে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইয়া উঠিল। অবশেষে আমাদিগের পরিচিত ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের সঙ্গে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি গাড়িতে উঠিয়া "খিদাইভ" হোটেলে পঁহুছিলাম। হোটেলটী বড় ভাল কিন্তু রাত্রের ভোজনের ব্যাপার শেষ হইয়া যাওয়াতে আমরা আর কোন রকম ভাল আহার পাইলাম না। আহারের ঘরে গিয়া দেখি অনেক সাহেব বিবি ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া সুধা পান করিতেছেন। আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা দুগ্ধ ও চা পান করিয়া যামিনী যাপন করিলাম।

প্রভাতে জয়ঢক্কাবাদ্যের শব্দে নিদ্রা ভগ্ন হইল। গবাক্ষ খুলিয়া দেখি পথে একদল ভিক্ষুক ইতালীয় গায়ক বাদ্যধ্বনি করিয়া গান করিতেছে। আমরা শয়ন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্নান সমাপন পূর্ব্বক, চা পান করিয়া নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। আলেকজান্দ্রিয়া ইউরোপীয় প্রণালীর সহর। অনেক ইউরোপীয় দোকানও বড় বড় সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী আছে। গতযুদ্ধে এই সহর ইংরাজগণ অগ্নিদ্বারা ধ্বংশ করিয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য অনেক অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত সকলগুলি পুনঃ নির্ম্মিত হয় নাই।

আলেকজান্দ্রিয়া অতি পূর্ব্বকালের নগর। পূর্ব্বকালে এখানকার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ধ্বংশের কথা পাঠকবর্গ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে পম্পির স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এটী একটী উচ্চ স্থানের উপর স্থাপিত আছে। স্তম্ভের নিম্নভাগে কতকগুলি গ্রীক অক্ষর খোদিত দৃষ্ট হইল। কাটাকম্ব নামক গোরস্থান দেখিলাম। তাহা মৃত্তিকা মধ্যে দীপ লইয়া প্রবেশ করিতে হয় এজন্য ইহার মধ্যে গমন করিলাম না। বিশেষতঃ পশুবৎ কলহপ্রিয় আরব সঙ্গীর সহিত এই অন্ধকূপ মধ্যে প্রবেশ করিতে কোন মতে ইচ্ছা হইল না।

এখানকার লোকেরা বিদেশীয়গণের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা বলে ইংরাজগণের উপদেশক্রমে খিদাইব অন্যায় ট্যাকস্ স্থাপন দ্বারা প্রজাবর্গকে পীড়ন করিয়া থাকেন। খিদাইভ বহু পত্নী লইয়া কেল্লার মধ্যে বাস করেন।

বেলা ১২টার সময় হোটেলে গিয়া আহার করিলাম। আহারের বন্দোবস্ত বড় ভাল ছিল। ফরাশীশ পাচক দ্বারা অনেক প্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। আহারের পর পুনর্ব্বার আর একবার সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেলা চারিটার সময় ব্রিণ্ডিসী গমনোদ্যত ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় মেলট্রেনে আর কএকজন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে আহারের টেবিলে উপস্থিত হইলে দেখিলাম অন্যান্য নবাগত যাত্রীর মধ্যে দুইজন তুর্কী একজন ধনাঢ্য কাফ্রি আসিয়াছে। কাফ্রি ভদ্রলোকটী আমার নিকট উপবেশন করিলেন। তিনি ফরাশীশ কিছু কিছু বলিতে পারেন, ইংরাজী বুঝেন না। এব্যক্তি নিরামিশ খাইয়া থাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল।

রাত্রে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে স্নানাগারে প্রবেশ করিব এমত ক্ষমতা হইল না। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে, মহারঙ্গে পোত টলমল করিতেছে, আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে স্নানাগারের কবাটে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খাইয়া, কোন প্রকারে মহাকষ্টে প্রস্তরের টবের মধ্যে বসিয়া স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেবিনের শয্যার উপর আসিয়া পড়িলাম। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে আর সাহস হইল না এবং বড় একটা ক্ষমতাও হইল না। আমার সমুদ্রপীড়া ধরিয়াছে। সর্ব্বদা শরীর ঘুরিতেছে এবং হস্ত; পদ স্পন্দরহিত হইয়া পড়িতেছে। আমার শারীরিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া থাকিলাম। আমার আত্মীয়েরও এই অবস্থা ঘটিল দিবা রাত্র সংজ্ঞাহীন। আহারে অরুচি, এমন কি, একটু শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিবার ইচ্ছা নাই। এই অবস্থায় দুই দিবস অতি কষ্টে চলিয়া গেল, পরে তৃতীয় দিবস ব্রিণ্ডিসীতে জাহাজ পঁহুছিলে, এ মহাকষ্টকর সমুদ্রপীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। জাহাজকে সেলাম করিয়া নাটী ধরিয়া বৃদ্ধের মত ঠক ঠক করিয়া পোতের কাষ্টের সিঁড়ি হইতে তীরে অবতরণ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রী——

আমেরিকা ও ইতালীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত জেনারেল্ জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

(১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার নাবিক-সুলভ দক্ষতা ও ভৃত্যজনোচিত সাধুতা শীঘ্রই তাঁহাকে নাবিকবৃন্দ ও পোতস্বামিগণের নিকট অতি আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিল। তিনি অচিরকালমধ্যে নোট্রিডেম্ জাহাজের কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত হইয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাগত হইলেন।

গ্যারিবল্ডীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বহুদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন, ততই স্বদেশানুরাগ তাঁহার চিত্তকে অধিকতর অধিকার করিতে লাগিল। এখন হইতে তিনি ইতালীর ইতিহাস ও ইতালীর বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সবিশেষ আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

বৎসরের পর বৎসর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইলে কত শতাব্দী ধরিয়া খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ইহার উপর বিরাজ করিল—তথাপি সাধারণতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যশীল রোমের সেই প্রাচীন গৌরব ও মহত্ত্ব আর ফিরিল না। এখন সেই নন্দন-কানন দুর্ব্বিষহ অত্যাচারের দোলাস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অধিবাসিবৃন্দ গুরুতর করভারে ভূমিসাৎ হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা—ইতালীর মোহমন্ত্র স্বাধীনতা হস্তস্থিত শাসন-দণ্ড কতিপয় মাত্র বৈদেশিকের একচেটিয়া হইয়া আছে। ইতালীর ধনাগার বৈদেশিকেরাই দখল করিয়া রাখিয়াছেন। বৈদেশিকেরাই ইতালীর উপর কর ধার্য্য করিতেছে—সে বিষয়ে করদাতাগণের মতামত দিবার কোন অধিকার নাই। চতুর্দ্দিকে বৈদেশিক সৈন্য, বৈদেশিক পুরোহিত, ও বৈদেশিক সিভিলিয়ান্—কর আদায়ের পর ইতালীর যে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা শোষণ করিয়া লইতেছেন। এই সুন্দর দেশের সকল স্থান হইতেই—প্যালামো হইতে ভিনিস্—ও ভিনিস্ হইতে সেভয়—সকল স্থান হইতেই ক্রন্দন রোল উত্থিত হইতেছে। সকল স্থান হইতেই বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা হইতেছে। ইতালীর এই শোচনীয় অবস্থা গ্যারিবল্ডীর চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দিন রজনী কেবল তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার চিত্তের অবস্থা তিনি আপনিই সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'ইতালীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে কিছু আলোক পাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহার জন্য এই সময়ে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যে পুস্তকে বা যে ব্যক্তিতে আমার হৃদয়ের ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, সেই পুস্তক ও সেই ব্যক্তি আমার হৃদয়ের অতি আদরের বস্তু হইয়া দাড়াইল। একবার কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে রুসিয়ার অন্তর্গত ট্যাগান্‌রগ যাত্রাকালে আমার জাহাজে একজন লিগেরিয়া প্রদেশবাসী ইতালীগতপ্রাণ দেশহিতৈষী যুবক উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যখন আমি দেশহিতৈষিগণের স্বদেশউদ্ধার-বিষয়িণী "প্লান্" মালা শুনিলাম, সে দিন আমার অন্তরে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় আমেরিক ভূমি দর্শনে কলম্বসের আনন্দ অতি সামান্য। অদূরে আমেরিকার বেলাভূমি দেখিয়া কলম্বস্ যেমন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'ঐ দেখ ভূমি—ঐ দেখ ভূমি (land ho!),' আমিও সেইরূপ মনে মনে বলিয়া উঠিলাম—'তীর পাইয়াছি—তীর পাইয়াছি'। স্বদেশ ও স্বদেশের উদ্ধার—এই দুই ভাব—সেই দিনে আমার অন্তরে নবজীবন সঞ্চারিত করিল। সেই দিন হইতে আমি নবধর্ম্মে মনে মনে দীক্ষিত হইলাম।

আর একবার জলযাত্রায় তিনি গ্রীস্ হইতে কতকগুলি সেণ্ট সাইমোনীয়কে লইয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নেতা ইমাইল্ ব্যারল্‌টের নিকট গ্যারিবল্ডী বিশ্বপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতার প্রকৃত মাহাত্ম্য শিক্ষা করিলেন। ধার্ম্মিক ও স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ইমাইল্-ব্যারল্‌টের উপদেশ গ্যারিবল্ডীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইয়াছিল।

আর তাঁহার নাবিক জীবন ভাল লাগিতে লাগিল না। তিনি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়াই পোতের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিলেন, এবং অগৌণে ইতালীয় দেশহিতৈষিগণের আবাসভূমি মার্সেলিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতালী-উদ্ধার-রঙ্গালয়ে—যেখানে তিনি এক সময়ে প্রধান নায়কের অংশ অভিনয় করিবেন—সেই প্রকাণ্ড অভিনয়ক্ষেত্রে আজ তিনি প্রথম প্রবেশ করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্যই যেন—আদেশ প্রতিপালনে তৎপর, বিপদে ধৈর্য্যবান্, গুরুতর শারীরিক শ্রমে সুপটু, এবং যে সাহসের বলে হাঁসিতে হাঁসিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে পারা যায় সেই সাহসে সাহসী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার ভবিষ্য জীবনের গুরুতর দায়িত্বের জন্য যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আজ ফরাসিক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১৮৩০—১৮৩২ সালে ইউরোপ ও ইতালীর অবস্থা।)

১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে তাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইলেন, এবং ডিউক অব অর্লীন্‌স লুই ফিলিপ্ সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দশম চার্লস 'পবিত্র সম্মিলনীর' একজন প্রধান নেতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পতনে ইহা মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইল। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে ইতালীর অন্তরে যে আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহা ফলবতী হয় নাই। ইতালীবাসীরা হতাশভয়ে অভিভূত না হইয়া প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নেপলস্ রাজ্যে 'কার্ব্বোনারি' (Charcoal-burner অঙ্গার-দাহক) নামক একটী গুপ্ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনাই এই সভার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। একদিকে যেমন প্রজাসাধারণের বিরাগ অনুভূত হইতে লাগিল অন্যদিকে কঠোর শাসন দ্বারা সেই বিরাগের বাহ্যস্ফুরণকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। উন্নতিশীল দলের সভ্য হওয়ার অপরাধে অসংখ্য লোককে কারাগারে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। স্পিল্‌বার্গ ও অন্যান্য নগরের কারাদুর্গ সকল কয়েদীতে ভরিয়া গেল। সেই সকল যমালয়স্বরূপ কারাগারের দুঃখকাহিনী পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। এই জাতীয় দুর্গতির কাহিনী শুনিতে শুনিতে ও তাহাতে দগ্ধ হইতে হইতে গ্যারিবল্ডীর বাল্য জীবন অতীত হইল। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে ইতালীবাসীরা একটী মহতী শিক্ষা লাভ করিলেন। দশম চার্লস্ প্রজার স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহাকে প্রজাগণ ফরাসি সিংহাসনে আরোপিত করে—আবার তিনি যখন সেই স্বত্ব ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তখনই তাঁহাকে দূরীকৃত করে। গ্যারিবল্ডীও তাঁহার মতাবলম্বী লোকে ভাবিতে লাগিলেন—তবে ইতালী কেন অত্যাচারী ও প্রজা-স্বত্বাপহারী রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে না?

আর একটী ঘটনাতে ও ইতালীবাসিগণের অন্তরে আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। ভিয়েনার সন্ধি বেল্‌জিয়মকে হলণ্ডের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহা বেল্‌জিয়মের অধিবাসিবৃন্দের মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। এই সময় একদিন বেল্‌জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স নগরের রঙ্গালয়ে অনেকে নীল দর্পণের সমশ্রেণীক 'ম্যাসানিলো' নামক একখানি নাটকের অভিনয় শুনিয়া এতদূর উন্মত্ত

হইয়া গিয়াছিলেন, যে রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়াই হলণ্ডের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। সমস্ত বেল্‌জিয়ম্ তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া হলণ্ডের শাসনদণ্ড দূরীকৃত করিয়া বেল্‌জিয়মের সিংহাসনে স্যাক্‌সিকোবর্গের লিওপোল্‌ডকে আরোপিত করিলেন। ইতালী ভাবিল আমরাই বা কেন তাহা না পারিব?

কিন্তু বিধাতা এখনও ইতালীর প্রতি প্রসন্ন হন নাই। এখনও ইতালীর দুঃখের দিনের শেষ নাই। অষ্ট্রীয়ার কঠোর শাসনে ইতালী যেন দিন দিন জীবনী-শক্তি-শূন্য হইতে লাগিল। কেবল ইতালীর একদিকে পীড্‌মণ্ট রাজ্যে—একটু আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী চার্লস্ ফেলিক্‌সের মৃত্যুর পর ক্যারিগ্‌-ন্যারোর লোকতন্ত্রিক যুবরাজ চার্লস আল্‌বার্ট—সার্ডিনিয়ার অধীশ্বর প্রথম চার্লস আল্‌বার্ট অভিধা গ্রহণ পূর্ব্বক সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি চার্লস ফেলিক্‌সের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সার্ডিনিয়ার রাজপ্রতিনিধিপদে বৃত হইয়া সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে অনেক স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার সিংহাসনারোহণে সমস্ত ইতালীবাসীর আশানেত্র যুগপৎ তাঁহারই উপর পতিত হইল। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদিগের সে আশা পূরণ করিলেন না। চার্লস আল্‌বার্ট স্থায়িরূপে পীড্‌মণ্টের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অষ্ট্রীয়ার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন।

এদিকে নেপল্‌স রাজ্যে প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যুর পর অতি অল্প দিন মাত্র তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রাঙ্কসিস্ রাজত্ব করেন। অবশেষে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার অত্যাচারে নেপল্‌স রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। প্রজারা তাঁহার দৌরাত্ম্যে এতদূর মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল যে তাঁহাকে (Tyrant) বা যথেচ্ছাচারী উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইবে—তখন গ্যারিবল্ডীকে বিধাতা তথায় প্রেরণ করিবেন।

এই সকল ভীষণ অত্যাচারের সময় 'কার্ব্বোনারো' সম্প্রদায়ের ন্যায় ইতালীতে 'সঙ্গতি সমাজ (Consistonial society)' ও 'ক্যাথলিক্ প্রচারক, ও রোমীয় সম্মিলন (Catholic, Apostolic, and Roman Congresstion) নামক গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যদিও ইতালীর ঘোর অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দিনে এই গুপ্ত সমাজগুলি নির্ব্বাণোন্মুখ স্বদেশানুরাগকে কথঞ্চিৎ উদ্দীপিত রাখিয়াছিল, তথাপি ইহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা ও গুপ্ত কার্য্যাবলীর সহিত সাধারণের সবিশেষ সহানুভূতি না থাকায়, এগুলি বিশেষ কার্য্যকারী হয় নাই। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডই ইহাদিগের অবাধ্যতা মন্ত্র প্রকাশের এক মাত্র দণ্ড বলিয়া, অনেকেই সাহস করিয়া, এই সকল সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবেশকালে যে শপথ গ্রহণ করিতে হইত তাহাও অতি কঠোর। এই সকল কারণে এই সকল সভা ক্রমেই জাতীয় সঞ্জীবনের অযোগ্য হইয়া উঠিল।

এই সঙ্কট সময়েই 'নব্য ইতালী' সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। লেখনী ও জিহ্বা 'নব্য ইতালী' সমাজের এক মাত্র অস্ত্র ছিল। তাঁহারা যাহা উচিত বিবেচনা করিতেন—বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা লোকের মনে তাহা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন। পুলিশকর্ম্মচারীর ও গুপ্তচরের কঠোর নির্য্যাতনের মধ্যেই তাঁহারা বৈপ্লবিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় চরিত জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনিই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। তিনি 'নব্য ইতালী' নামক সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে অসম সাহসিকতা ও উদ্দীপনার সহিত লোকতান্ত্রিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইতালীয় চক্ষুর সহিত চার্লস আল্‌বার্টের চক্ষু ও তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহাকে আইনের করালগ্রাসে আনিবার জন্য তাঁহার অনুসরণার্থ গুপ্তচর সকল নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে অবৈধ কিছুই প্রমাণীকৃত হইল না—তথাপি তাঁহাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনি রাজগণের সম্মুখে দ্বাদশ রুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রোম্, নেপল্‌স, টস্‌কানী, লম্বার্ডী, ভিনিসীয়া, পীড্‌মণ্ট, পার্ম্মা, মাতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে এক সাধারণ তন্ত্রের অধীনে আনিবেন—ইহাই ম্যাট্‌সিনির জীবনের একমাত্র সাধনা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

(ম্যাটসিনির সহিত সাক্ষাৎ করেন, 'নব্য ইতালী' সমাজভুক্ত হন, সার্ডিনীয় রণতরীতে প্রবিষ্ট হন, বৈপ্লবিকগণের অকৃতকার্য্যতা অনুসরণ হইতে তাঁহার মুক্তি, গুপ্তবেশে মার্সেলিসে পলায়ন, জাহাজের মেটের পদ গ্রহণ, টিউনিসের বের অধীনে নৌ সেনা ভুক্ত হন, পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগমন, বিসূচিকা চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার, সমুদ্রযানে রাইও জেনিয়ো প্রস্থান।)

ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসিত হইয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিসে আসিয়া আশ্রম গ্রহণ করিলেন। সেই আশ্রমে অসংখ্য শিষ্য আসিয়া ম্যাট্‌সিনির নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনির নাম সমস্ত ইতালীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীও তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া তদীয়

আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাট্‌সিনির একাগ্রতা, চিন্তাশীলতা ও উদ্দীপনাবাক্যে মোহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। এবং গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে 'ইতালীয় সাধারণতন্ত্রের' জন্য তিনি প্রাণোৎসর্গ করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অকৃতকার্য্যতায় সেই অবিচলিত সাধারণ তান্ত্রিকের গুরুর অন্তর দমিত হয় নাই। তিনি জানিতেন যে লোকতান্ত্রিক দলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নিচয় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত কুড়াইয়া একত্র করিলে তাহা মহানলে পরিণত হইবে। গ্যারিবল্ডীকে তিনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। সাধারণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় যে সকল দেশহিতৈষিগণের প্রাণ দণ্ড করা হইয়াছে, সেই সকল হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি নবাগত শিষ্যকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি—তাম্বুরাল্লী, তোল্লা, মিগ্‌লিও, বিগলিয়া, গ্যাভেল্লী প্রভৃতিকে মার্সেলিস্ হইতে কয়েক খণ্ড 'নব্য ইতালী' পত্রিকা প্রেরণ করেন। তাঁহারা সেইগুলি পড়িয়াছিলেন বলিয়া, চার্লস আল্‌বার্ট তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারেন। ম্যাট্‌সিনি এই জাতিহত্যাকারকের দুষ্কৃতির সমুচিত শাস্তি বিধান করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে অনুরোধ করিলেন—গ্যারিবল্ডীও 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুর নিকট তাহাই স্বীকার করিলেন।

বড় বড় ঘটনায় বড় বড় লোক প্রস্তুত করে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্রম্‌ওয়েল্, ওয়াসিংটন্, নেপোলিয়ন্ ওয়েলিংটন্ প্রভৃতি সকলেই সময়ের ফল। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা সময়োপযোগী কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে—সময়ই আপন প্রয়োজনমত তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লয়। আপাতদর্শনে বোধ হইতে যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের দ্রষ্টা ও নেতা, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা কেবল সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের করযন্ত্র মাত্র। বিধাতা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগদ্বারা করাইয়া লন মাত্র। তাঁহারা সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের মধ্যে আসিয়া এরূপ বিঘূর্ণিত হন যে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস ও প্রভাবের বীজ মহাপুরুষগণের অন্তরে নিহিত থাকে সত্য, কিন্তু সেই মহাবীজের স্ফোটন অনুরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ না পাইলে তাহা স্ফোটিত হইতে পারে না। আমরা অনুকূল ঘটনাবলী ও ভাব স্রোতকেই এই স্ফোটনোপযোগী জল, বায়ু ও উত্তাপ বলিতেছি। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর অন্তরেও এই মহাবীজ নিহিত ছিল সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাবলী ও ভাবস্রোতের মধ্যে না পড়িলে, এ মহাবীজও বোধ হয় স্ফোটিত হইত না।

ম্যাট্‌সিনি ইতালীর বৈপ্লবিক-ভাব-ব্যঞ্জক, গ্যারিবল্ডী ইতালীর বৈপ্লবিক-কার্য্য-ব্যঞ্জক। একজন ভাবস্রোতের নেতা, আর একজন কার্য্যস্রোতের নেতা। গুরু ও শিষ্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের পূরক। বিধাতা ইতালীর উদ্ধার সাধণের জন্য দুইজনকে দুইবৃত্তির বীজ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ইতালীতে মতবিপ্লব না ঘটাইলে গ্যারিবল্ডী কিছুই করিতে পারিতেন না। আবার গ্যারিবল্ডী সেই সকল মতকে কার্য্যে পরিণত না করিলে, ইতালীর উদ্ধারসাধন হইত না। ইতালীর সঞ্জীবনকার্য্যে উভয়েরই সমান উপযোগিতা। উভয়েই আত্মোৎসর্গের সমান দৃষ্টান্ত স্থল। তাই আজ ভারতযুবক সেই যুগলমূর্ত্তির চরণে লুণ্ঠিত-শির।

যে সময় গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন হয়, তখন প্রিন্স আল্‌বার্ট একবৎসর মাত্র সার্ডিনিয়া রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। 'নব্যইতালী' সমাজ তাঁহাকে বৈপ্লবিক দলের নেতা হইয়া তাঁহার পতাকায় **'একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য'** এই তিনটী মন্ত্রবীজ লিখিত করিয়া ইতালীকে বৈদেশিকগণের উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিতে বলেন। কিন্তু দুর্ব্বল-হৃদয় আল্‌বর্ট ইহাতে স্বীকৃত হইতে সাহস করিলেন না। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সুবিধা লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এযশ তাঁহার পুত্র প্রথম ভিক্টর ইমানুএলের জন্যই সঞ্চিত রহিল।

তিনি যে বৈপ্লবিক দলের নেতা না হইয়াই রহিলেন এরূপ নহে—বৈপ্লবিক দলকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শুদ্ধ 'নব্যইতালী' পত্রিকা পড়ার অপরাধে তিনি কয়জন নিরপরাধী ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারেন। ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কার্য্য তাঁহাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। 'নব্য ইতালী' পত্রিকা শয্যায় বা নিজের দখলে থাকার অপরাধে তিনি অনেক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারিতে আদেশ দেন। বিচার আদালত একবারে উঠিয়া গেল। পুলিশের একজন নিম্ন কর্ম্মচারী বা একজন নীচাশয় গুপ্তচরের কথামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া তিনি অনেকের প্রতি প্রাণদণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত করিতে লাগিলেন। চ্যাম্রে জেনোয়া ও আলেকজাণ্ড্রিয়াতে এইরূপে বিচারের নামে এত অবৈধ নরহত্যা হইতে লাগিল যে বিশ্বজনীন ঘৃণা ও ক্রোধ আল্‌বার্টের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইল।

আল্‌বার্ট দেখিলেন ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে থাকিতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। সুতরাং তিনি ফরাসিরাজ ফিলিপের শরণাপন্ন হইলেন। ম্যাট্‌সিনি ফরাসি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে নির্ব্বাসিতের আশ্রয়স্থল সুইজর্লণ্ডে

গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সুইস্ রাজধানী জেনিভায় পৌঁছিয়াই তিনি বৈপ্লবিকগণকে পীড্‌মণ্ট আক্রমণের উপদেশ দিলেন।

স্থিরীকৃত হইল যে তিন দল সৈন্য তিন দিক দিয়া গিয়া যুগপৎ পীড্‌মণ্ট আক্রমণ করিবে—একদল সেভএর মধ্য দিয়া যাইবে, একদল সেণ্ট জুলিয়াশের দিকে যাইবে ও আর একদল জেনিভা হইতেই বাহির হইবে। গ্যারিবল্ডীর সহিত স্থিরীকৃত হইল যে তিনি সার্ডিনীয় নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উক্ত সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক বীজ বপন করিবেন। গ্যারিবল্ডী আত্মজীবনীতে ইহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন:—"আমি সার্ডিনীয় রণতরি 'ইউরিভাইসে' প্রথমশ্রেণীর নাবিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাবিকবৃন্দের অন্তরে রাত্রি দিবা বৈপ্লবিক বীজ বপন করিতে লাগিলাম। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইলাম। জাহাজের সমস্ত নাবিক আমার সহিত বিপ্লব সাগরে ঝাঁপ দিতে স্বীকৃত হইল। বন্দোবস্ত হইল যে, স্থলে যদি বিপ্লব কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা সেই রণতরি খানিকে বৈপ্লবিক দলের হস্তে সমর্পণ করিব।"

জাহাজের নাবিকগণকে দীক্ষিত করিয়া তিনি বিপ্লবের সাহায্য করিবার জন্য জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্লেছ সার্জানা নামক নগরের সৈন্যাবাস সকল পথিমধ্যে অবস্থিত ছিল। এরূপ স্থির ছিল তথাকার সৈন্যেরা বারিকের উপর বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিবে—ও তথাকার অধিবাসীরা যুগপৎ রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। এই জন্য তিনি সেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় অভ্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখিলেন না। বরং রাজকীয় সৈন্য সকল দলে দলে বারিকে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন—বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অকৃতকার্য্য হইয়াছে। গ্যারিবল্ডী আসন্ন বিপৎ দেখিয়া এক রমণীর ফলের দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক অবস্থা জানাইলেন। রমণী-সুলভ-কোমল-হৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া, সে নিজের বিপৎ স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে অতি সংগোপনে রাখিল। অবশেষে গ্যারিবল্ডী রজনী-তিমিরে আবৃত হইয়া কৃষক বেশে রমণীর বিপনি হইতে বহির্গত হইলেন। এখন হইতে গ্যারিবল্ডীর অনিয়মিত শ্রম ও অনিশ্চিত আবাসের জীবন আরম্ভ হইল। যে প্রভূত কষ্ট যন্ত্রণায় দীক্ষিত হওয়ায় তিনি দেশের উদ্ধার কার্য্যের নেতা হইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, আজ হইতে সেই সকল কষ্ট যন্ত্রণা তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইল।

বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে পীড্‌মণ্টরাজ পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাওয়ায় ম্যাট্‌সিনির সমস্ত প্ল্যান ব্যর্থ হইয়া গেল।

যে সৈন্যদল নিয়স্ নগর হইতে যাত্রা করিয়া জেনিভা হ্রদ পার হইতেছিল, জেনীভীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার গতিরোধ করিলেন। পবিত্র সম্মিলনী প্রথম ভিক্টর ইমানুএল্‌কে যে পীড্‌মণ্ট রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন, সেই রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যদি জেনীভীয় রাজ্যে সৈন্য সংগৃহীত হয় ও যদি বিনা আপত্তিতে জেনীভীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্য দিয়া সেই সৈন্যদলকে পীড্‌মণ্ট রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যাইতে দেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সমস্ত রাজবৃন্দ জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবেন। এই ভয়ে তাঁহারা সেই অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিলেন।

যে সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি রামেরিন্ সেণ্ট জুলিয়ানোর অভিমুখে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সে সৈন্যদলও রামেরিনের বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প বাধা পাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইল। এরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে এই সেনাপতি শত্রুর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার অধীনস্থ সেনাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। ম্যাট্‌সিনি এই সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া মৃতবৎ হইলেন। সে সময় তিনি জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য ছিলেন। জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া তিনি সে অবস্থাতেও সৈন্যদলের সহিত অম্লান বদনে পদব্রজে যাইতেছিলেন। সেনাপতি যেই সৈন্যদলকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে জেনোয়ায় প্রেরণ করেন—তথায় জীবন নিরাপদ নয় দেখিয়া তিনি সুইজর্লণ্ডে পলায়ন করেন।

যে সৈন্যদল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে বলিয়া স্থির ছিল, সার্ডিনীয় সেনা তাহারও গতিরোধ করিল। সেই সৈন্য মধ্যে এক শত জন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বৈপ্লবিক ছিলেন—সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জনকে ধরিতে পারিলেন—এবং ধরিয়া তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিলেন; আর গ্যারিবল্‌ডীও ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। এইরূপে সেণ্ট জুলিয়ানো অভিযানের পর্য্যবসান হইল।

গ্যারিবল্‌ডী এখন পলাতক—পর্ব্বতমালা বাহিয়া তিনি নাইস্ অভিমুখে ধাবমান। তিনি দিবসে লুকায়িত থাকিয়া রজনীতে ধ্রুবতারার সাহায্যে উদ্দিষ্টস্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সহ্যশক্তি গুরুতররূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। সেটার গিরিমালার দুর্গম গুহা ও কর্দ্দা-গম্য পথের উপর দিয়া ক্রমাগত দশ দিন তাঁহাকে অতি কঠোর পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। দশ দিন পর্য্যটনের পর তিনি নাইস্ নগরে মাতৃস্বসার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দিন গোপনে বিশ্রাম

লাভ করিয়া দুই জন বিশ্বস্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে মার্সেনিস্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভার নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদী নববর্ষাগমে বিষম স্ফীত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর নির্ভীক হৃদয় ও সুদৃঢ় বাহুযুগল কোন বাধা বিপত্তি মানিত না। সেই হৃদয় ও সেই বাহুযুগলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বন্ধুদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া সেই দুস্তর নদীর খরতর স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিমেষ মধ্যে স্রোতস্বিনী তাঁহাকে সার্ডিনীয় রাজ্যের বাহিরে লইয়া গেল।

আপনার শত্রুর গ্রাস হইতে মুক্ত ভাবিয়া তিনি বহিশ্চর ফরাশি রাজ্যের সীমান্তরক্ষকগণের নিকট বিশ্বাস করিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা সে বিশ্বাস রাখিলেন না। সেই স্থানেই তাঁহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীরূপে ড্রাগুইগ্নানে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে এক কুঠারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই কুঠারীতে একটী জানালা ছিল, তাহা মৃত্তিকা হইতে ৭।৮ হাত উচ্চে। সেই জানালার সম্মুখে একটী উদ্যান ছিল। গ্যারিবল্ডী উদ্যানের শোভা দর্শনের ব্যপদেশে জানালার কাছে আসিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে যেই অন্যমনস্ক হইয়াছে, অমনি তিনি এক লম্ফে উদ্যানে গিয়া পড়িলেন এবং তখনই উঠিয়াই পর্ব্বতমালাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহরীরা তাঁহার পলায়নের সংবাদ জানিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগের হস্তবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অনুকূল তারকামালা আবার তাঁহার পথদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি আবার মার্সেনিসাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পলায়নের পরদিন সন্ধ্যার সময় গারিবল্ডী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া তিনি গ্রাম্য পান্থাবাসে প্রবেশ করিলেন। পান্থাবাসের অধিস্বামী অবিলম্বে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা নবাগত অতিথির সেবা করিলেন। সরলহৃদয় পলাতক গ্যারিবল্ডী আবার ফরাশিজাতির সহানুভূতি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া প্রবঞ্চিত হইলেন। গৃহস্বামী নিজ অতিথিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে এখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করা হইবে। গ্যারিবল্ডী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না—তিনি নির্ভীকচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন—কেবল এই মাত্র বলিলেন যে 'গ্রেপ্তারের আদেশটা যেন আহারের পর দেওয়া হয়'।

সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকদল সেই পান্থনিবাসে আসিয়া—কেহ কেহ তামাকু খাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাস পাশা

খেলিতে লাগিলেন—এবং কেহ কেহ বা একটু একটু মদ খাইয়া পান্থনিবাসস্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে আর গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়ার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু পান্থনিবাস-স্বামীর চক্ষু নবাগত ইতালীয় হইতে একবারও অন্যত্র নীত হয় নাই। যেহেতু অতিথির সঙ্গে বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কী না থাকায় তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—পাছে তাঁহাকে আহারের মূল্য না দিয়া অতিথি পলায়ন করে। গ্যারিবল্ডী ইহা বুঝিতে পারিয়া পকেট হইতে মুদ্রা লইয়া তাহাকে দিলেন। ইহাতে তাহার চিত্ত আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল বটে, কিন্তু গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায় সে একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। তিনি সেই যুবকদলকে স্বদেশানুরাগের মোহমন্ত্রে ভুলাইয়া নিজ পক্ষপাতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন একটী গান করিতেছিল; সেই গান সমাপ্ত হইবামাত্র, গ্যারিবল্ডী উঠিয়া কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া সুমধুর স্বরে তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একটী গান ধরিলেন। প্রকৃত তন্ত্রী স্পৃষ্ট হইয়াছিল—সেই গীতের ভাবোচ্ছাসে যুবকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া রহিল। সকলেরই হৃদয় সহানুভূতিতে গলিত হইল। গ্যারিবল্ডীর উন্মাদিনী মূর্চ্ছনা ও দ্রবকারিণী স্বরলহরীতে পাষাণও দ্রবীভূত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী গ্যারিবল্ডীর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। সকলেই একতানে বলিয়া উঠিলেন—'জীব ফ্রান্স (Vive la France!)'—'জীব ইতালী (vive Italia!)'। আনন্দ ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে মহোৎসাহে সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল। গ্যারিবল্ডীকে গ্রেপ্তার করার কথাও আর উত্থিত হইল না। প্রত্যূষে সকলেই অনেক মাইল পর্য্যন্ত সেই স্বজাতি প্রেমিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন—এবং অবশেষে 'ঈশ্বর পথে মঙ্গল বিধান করুন' অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

জেনিভা হইতে পলায়নের কুড়ি দিন পরে গ্যারিবল্ডী নিরাপদে মার্সেলিসে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। সেখানে তিনি পেইন্ নাম ধারণ করিয়া কয়মাস কাল অতিবাহিত করেন। পরে ইউনিয়ন্ নামক জাহাজের মেইটের পদে অভিষিক্ত হইয়া তিনবার ওডেসায় গমন করেন। তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার পর টিউনিসের 'বে' র অধীনে তিনি নৌ সেনার একজন কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে জলযুদ্ধোপযোগিনী ভূয়সী শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ হয়। 'বে (Bay)' র নৌসেনার জন্য মার্সেলিসে একখানি

উৎকৃষ্ট রণতরি নির্ম্মিত হয়। গ্যারিবল্‌ডী ইহাতে আরোহণ করিয়া টিউনিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে সে চাকরী এক প্রকার গোলামী, বুঝিয়াই 'গাউলেটা বন্দরে ইহা রাখিয়া একখানি তুরস্কীয় জাহাজে চড়িয়া মার্সেলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি মার্সেলিসে আসিয়া দেখিলেন—সেখানে বিসূচিকা [ওলাউটা] রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কর্ম্মকাজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে—যাহাদের উপায় ছিল তাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক, যাজক ও দয়াধর্ম্ম ভগিনীরা পরোপকার ব্রত পালনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দীন দুঃখীর অসহায় কষ্টের অবস্থা দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় গলিত হইল। তিনি বিসূচিকা—চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি কয় সপ্তাহ ধরিয়া তথায় থাকিয়া অবিরাম রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আশ্বাসবাক্যে তাঁহাদিগের যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিতে লাগিলেন। দয়াধর্ম্ম ভগিনীরা পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার সাধুতা, সৎসাহস ও উৎকট সহ্যশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ওলাউটা থামিলে তিনি দেখিলেন দেশহিতৈষিদল ইতালীর উদ্ধার-কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আপাততঃ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহার কোন আশা নাই। তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেন যে ইতালীয়গণ চিরকাল কখন নিদ্রিত থাকিবে না—একদিন উঠিবেই উঠিবে। সে সময় নেতার উপযুক্ত লোকের অভাব রহিয়াছে। গ্যারিবল্‌ডীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিধাতা তাঁহাকেই এই নেতা করিয়া পাঠাইয়াছেন! সেই নেতার উপযোগী যে যে গুণের এখনও তাঁহার অভাব আছে, তিনি আমেরিক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পূরণ করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

এই উদ্দেশে তিনি 'নটনীয়ার' নামক জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত 'রাইও জেনিয়ো' রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন সমীপবর্ত্তী রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ তন্ত্রের ব্রাজিল সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রাম চলিতেছে। অস্ত্রবিদ্যা ও নেতৃত্বকার্য্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভের বিশেষ সুবিধা উপস্থিত দেখিয়া, তিনি সেই ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্রকে ব্রাজিল সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(রসেটির সহিত সাক্ষাৎ, রাইওগ্রাণ্ডী সাধারণ তন্ত্রের পক্ষসমর্থন, জলযুদ্ধে অবতরণ ও ব্রাজিলের রণতরি গ্রহণ, মাল্‌ডোনেটায় অবতরণ, তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আদেশ, তাঁহাদিগের পলায়ন, জলপথে গেটা পর্য্যন্ত অভিযান, তীরাভিমুখে অদ্ভুত জলযাত্রা, খাদ্য সামগ্রীর জন্য কষ্টানুপায় গমন, পাম্পা রণবাজি, রমণীকবি, খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তি, রোধির যুদ্ধ, আহত, পারাণা বাহিয়া ঊর্দ্ধে গমন।)

গ্যারিবল্‌ডী নিরাপদে রাই ও জোনিরো আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় অনেকগুলি ইতালীয় নির্ব্বাসিতের সহিত তাঁহার মৈত্রীসংঘটিত হইল—তন্মধ্যে রসেডী সর্ব্বপ্রধানা স্বদেশে বিদেশে দাসত্বমোচন কার্য্যে রসেডী গৃহীত-ব্রত ছিলেন বলিয়াই তিনি গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়-সহচর হইয়া উঠিলেন। তিনি কি রণক্ষেত্রে কি কার্য্যক্ষেত্রে—গ্যারিবল্‌ডীর অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন।

এই সময়—ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ তন্ত্রের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। উক্ত সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি গঞ্জেল্ এবং তাঁহার সভাপতি ঝ্যামিকানী সেণ্ট গ্রীগের দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। রাইওগ্রাণ্ডি পূর্ব্বে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঞ্জেল্ সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, ব্রাজিল্-সম্রাট্ সেই ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, এবং তথায় নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাপতি ও তদীয় সম্পাদককে বন্দী করিয়া লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় গলিত হইল। তাঁহাদিগের অবস্থা হতাশাময় জানিয়াও গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ তন্ত্রের নামে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে রণখ্যাপনের, ব্রাজিলীয় সম্পত্তির আত্মসাৎ করণের এবং ব্রাজিলীয় রণতরি ও বাণিজ্যতরি সকলের ধ্বংস সাধনের অনুজ্ঞা পত্র গ্যারিবল্‌ডী সভাপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন।

দেশহিতৈষীদিগের হস্তে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সাধনোপযোগী উপকরণ সামগ্রী অধিক ছিল না। এই জন্য তাঁহারা প্রথমে সামান্য আকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ষোল জন মাত্র বিশ্বস্ত সহচর লইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিলেন। তিনি গুরুদেবের নামে তরিখানির নামকরণ করিলেন। তিনি 'ম্যাট্‌সিনিকে' মারিকা দ্বীপশ্রেণীর অভিমুখে চালিত করিলেন। সেই দ্বীপশ্রেণীর বৃহত্তম দ্বীপে অবতরণ করিয়া তিনি একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাঁহার খর-

স্রাবী নয়নদ্বয় চতুঃসাগরের বিশাল ঊর্ম্মিমালার উপর যুগপৎ পতিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে আশা ও উল্লাসের এরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হইল—যেন বোধ হইল একটী প্রকাণ্ড রণতরি তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সময়ের হৃদয়ের ভাব তিনি আপনিই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—'মনের উল্লাসে ও অহঙ্কারে আমি বাহুযুগল প্রসারিত করিলাম। আমার ওষ্ঠাধর আনন্দে অস্ফুট ও অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। তখন অসীম সাগর যেন আমার সাম্রাজ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল—আমি কল্পনায় সমস্ত সাগর দখল করিয়া লইলাম'।

অচিরকালমধ্যে ব্রাজিলীয় বন্দর হইতে ব্রাজিলীয় চিহ্নধারী পতাকা উড্ডীন করিয়া একখানি ব্রাজিলীয় বাণিজ্যতরি তাঁহাদিগের দিকে আসিল। বাণিজ্যতরি সম্মুখীন হইবামাত্র 'ম্যাট্‌সিনি' সবেগে তাহার উপর গিয়া পড়িল। সুন্দর তরিখানি উৎকৃষ্ট কফিতে পরিপূর্ণ ছিল। গ্যারিবল্‌ডী ব্রাজিলীয় রাজধানীর নয়ন সমক্ষে—ব্রাজিলীয় সাগর শাখার দুই তিন মাইলের মধ্যেই এই বহুমূল্য শিকার পাইয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। বাণিজ্যতরির নাবিকেরা ব্রাজিলীয় বন্দরের কামানের মুখেই সহসা এই রণতরি দেখিয়া—এবং আত্ম সমর্পণ করিবার এরূপ অসম সাহসিক আহ্বান শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একজন পর্টুগীজ বণিক তাঁহাদিগকে দস্যু ভাবিয়া আত্ম জীবনের নিষ্ক্রয় স্বরূপ এক বাক্স রত্ন গ্যারিবল্‌ডীকে উপহার দিতে চাহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী সে রত্নের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি সেই কম্পবান্ পর্টুগীজকে আশ্বাসবাক্যে বুঝাইলেন যে তাঁহার রত্নজাত ও প্রাণের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

গ্যারিবল্‌ডী 'ম্যাট্‌সিনি পরিত্যাগ করিয়া সেই 'বৃহত্তর বাণিজ্য তরিতে গিয়া উঠিলেন, এবং যুদ্ধের ও আহারের উপকরণ সামগ্রী সকল তাহাতে তুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই কৃতকার্য্যতায় গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্গিগণের অন্তরের সাহস দ্বিগুণ বাড়িল—তাঁহারা প্রফুল্ল মনে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় তাহারা 'ম্যাট্‌সিনি'কে জলমগ্ন করিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বাণিজ্য তরির লোকজনকে তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি সহ একখানি বোটে করিয়া তীরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট হইতে কেবল পাঁচ জন নিগ্রো দাস উপহার লইলেন।

তাঁহারা উরুগোয়ার অন্তর্গত মাল্‌ডোনাডো বন্দরে আসিয়া নিরাপদে পৌছিলেন। মণ্টিভিডিও সাধারণ তন্ত্রের লোকে তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন। রসেটী 'কাফি' বেচিয়া টাকা করিবার জন্য রাজধানী মণ্টিভিডিওতে

গমন করিলেন। সভাপতি ওরাইব্ রসেটীর মুখে কাফির প্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ধরিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মাল্‌ডোনাডোর সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী ও তৎসহচর বৃন্দের কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেন।

গ্যারিবল্‌ডী বন্দরের একটী বণিকের নিকট 'কাফি' বিক্রয় করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে, শুনিয়া গ্যারিবল্‌ডীকে 'কাফি' দিবে বলিয়া বণিক স্থির করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি রজনী যোগে গুলিপূর্ণ পিস্তল হস্তে বণিকের বাটীতে গেলেন। বণিক্ তাঁহার আসন্ন বিপদ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন। গ্যারিবল্‌ডী নির্ভীক্ চিত্তে বলিলেন যে অগ্রে 'কফির' দাম লইব—পরে যাইব। এই বলিয়া তিনি বণিকের বক্ষঃস্থলের দিকে পিস্তলের মুখ ধরিলেন এবং শুদ্ধ এই কথা বলিলেন 'আমার টাকা!'।

গ্যারিবল্‌ডীর এই আহ্বানে ও উগ্রমূর্ত্তিতে বণিক্ বুঝিলেন যে টাকাটা দিতেই হইবেক। তখন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে কফির মূল্য—দুই সহস্র মুদ্রা অবিলম্বে গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডীও জাহাজ ছাড়িয়া রসেটীর অনুসন্ধানার্থ প্লাটানদী বাহিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চলিলেন। পথে গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল—অনেক কষ্টে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া গ্যারিবল্‌ডী রসেটীর অনুসন্ধান করিতে জীসস্ মেরিয়া নামক স্থানে আসিয়া জাহাজ লাগাইলেন। জাহাজের খাদ্য সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল। জাহাজের জলীবোটও আক্রান্ত বণিক্‌গণকে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তীরে যাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, গ্যারিবল্‌ডী চারিটী শূন্য পিপের উপর একটী টেবিলের চারিটী পায়া রাখিয়া, তাহার উপর বসিয়া একটীমাত্র সঙ্গী লইয়া সেই তরঙ্গময় উপকূলে গমন করিলেন। সেই অদ্ভুত দারুময় উড়ুপ তরঙ্গবেগে ভীষণ নৃত্য করিতে করিতে তীরে আসিয়া লাগিল। তিনি মরিস্ নামক সঙ্গীকে ভোলা রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া অদূরে দৃশ্যমান গৃহ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

সম্মুখে বিরাজিত বিশাল 'পম্পাস্' নামক ক্ষুদ্রবনী গ্যারিবল্‌ডীর মনে বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব উদ্দীপিত করিল। উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে বহু মাইল ব্যাপিনী—রমণীয় তৃণ ও পুষ্পে পরিশোভিতা সেই ক্ষুদ্রবনীকে যেন প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত রমণীয়-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থাবলী বলিয়া গ্যারিবল্‌ডীর মনে প্রতীতি জন্মিল। গো, মহিষ, অশ্ব, হরিণাদি পশুপাল সকল মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বাধীনতার শান্তিময়ী ও বিশ্রামদায়িনী ছায়ায় বিস্রব্ধ মনে তথায় চরিতেছে—তাঁহাদিগের

প্রমোদ-নৃত্যের ও অনিয়ন্ত্রিত গতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সেখানে কেহ নাই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণি জগতের এই অপূর্ব্ব শোভা ও চিত্তাপহারিণী স্বাধীনতা দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর উত্তেজনাশীল রুধির খরতর স্রোতে তাঁহার ধমনী মণ্ডলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবদ্‌ভক্তিতে ও বিস্ময়ে তাঁহার মন অভিভূত হইল। তিনি সেই ভক্তি গদ্‌গদ ভাবে সেই গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গ্যারিবল্‌ডী যখন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন, গৃহস্বামী তখন গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। গৃহস্বামিনী নবাগত অতিথির যথোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গৃহস্বামিনী যদিও স্পেন-বাসিনী তথাপি ইতালীয় ভাষায় অতি চমৎকার কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় কবিত্ব পূর্ণ ছিল—এবং বিবিধ কলায় সবিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতি, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের আলোচনায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন—যে কোথা দিয়া রাত্রি গত হইল সে বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য রহিল না। গরিব মরিসের কথা গ্যারিবল্‌ডী একবারে ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলে, গ্যারিবল্‌ডী বলীবর্দ্দের বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যুষে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় হইয়া চিন্তামগ্ন সহচরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরিস্, গোমাংসের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বিলম্বজনিত সমস্ত রাগ, দুঃখ ভুলিয়া গেল।

গ্যারিবল্‌ডী আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই একটী বলীবর্দ্দ নদী তীরে আনীত ও হত হইল। তাহার মাংস সেই টেবিলের উপর উত্তোলিত হইলে গ্যারিবল্‌ডী সেই যানে আবার জাহাজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই জল যাত্রা ইতিহাসে একটী অদ্ভুত ঘটনা। ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনই বিপজ্জনক। অনেক ঘণ্টার চেষ্টাতেও টেবিল জাহাজের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিল না। তখন জাহাজ নঙ্গর ও পাল তুলিয়া টেবিল্ অভিমুখে ধাবিত হইয়া টেবিলকে ধরিল। জাহাজের নাবিক বৃন্দ ক্ষুধায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন—যে তাঁহারা টেবিল-পরিশোভী মাংস দেখিয়া সেনাপতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জাহাজের গতি পূর্ব্বমত অনিশ্চিত রহিল। কোথায় যাইলে বন্ধুবর রসেটীর দেখা পাইবেন গ্যারিবল্‌ডী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

ক্রমশ।

দর্শন।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বিশেষ জ্ঞান বা সামান্য জ্ঞান বাহ্যেন্দ্রিয় গোচর বিষয়জ্ঞান নহে; উহা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ (Affection) জনিত ইন্দ্রিয় শক্তির প্রসারণ (Extension) জন্যা প্রতিকৃতির জ্ঞান। এই প্রতিকৃতি (সঙ্কেত) তিন প্রকার। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। শরীরাদি-চেষ্টাকৃত বা লিখিত ভাষার নাম কায়িক সঙ্কেত, কথিত ভাষার নাম বাচনিক সঙ্কেত এবং মানসকৃত মানসিক সঙ্কেত। বস্তুতঃ সমস্ত সঙ্কেতই একমাত্র মানসিক সঙ্কেতের অন্তর্ভূত। ঐ মানসিক সঙ্কেতই জ্ঞানের হেতু। কোন কোন ইন্দ্রিয় রহিত ব্যক্তিও ঐ সঙ্কেত গ্রহণে সমর্থ।

প্রমাণ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত হইলেও ঐ বিভাগ সাধারণ বুদ্ধির বেদ্য নহে। বিশেষ, প্রমাণদ্বয় পরস্পর এরূপ সম্মিলিত যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এতদুভয়ের মধ্যে একের অভাব হইলেও প্রকৃত প্রমাণের অনুপপত্তি হয়।

একটি বস্তুর প্রমাণে (সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে) দুইটী সম্বন্ধেরই প্রয়োজন। প্রথম—সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পদার্থের সমবেতশক্তির সমন্বয়ে বিভাবিত বস্তু-সন্নিকর্ষ বোধ করাইবে এবং দ্বিতীয় সম্বন্ধ অর্থাৎ বিশেষ সম্বন্ধ ঐ পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলিকে অপর পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম হইতে চিন্তাশক্তির সাহায্যে পৃথক রূপে উদ্ভাবিত বস্তুর নির্ণয় করাইবে।

বৃক্ষ দর্শনেন্দ্রিয়ে চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দৃশ্যের সহিত উপস্থিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ-প্রমাণে উহার কাণ্ডকে ভূম্যাদি দৃশ্য হইতে পৃথক্ এবং শাখা ও পত্রাদিকে অংশরূপে বোধ করিতে হইবে। দৃষ্টি-গোচর সমস্ত দৃশ্যের সন্নিকর্ষ জ্ঞান বিভাবনা শক্তি হইতে উদিত হয়; কিন্তু অবয়বাদিবিশিষ্ট বৃক্ষরূপ বিশেষ পদার্থের জ্ঞান উদ্ভাবনা-শক্তি-সাপেক্ষ। প্রমাণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ অংশ দ্বয় স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণের সম্পূর্ণতাসাধনে সমর্থ হয় না। উভয় অংশের মিলনই প্রমাণ।

মনে করুন,—একজন মনুষ্য কেবল বিভাবন শক্তি বিশিষ্ট; অর্থাৎ লৌকিক সন্নিকর্ষজনক ইন্দ্রিয় (Sensitive organ) বিশিষ্ট। কিন্তু তাহার অলৌকিক সন্নিকর্ষজনক ইন্দ্রিয় (Perceptive organ) নাই; অর্থাৎ সে ব্যক্তির ইন্দ্রি-

য়ের সহিত বাহ্য পদার্থের সংযোগ ও তজ্জনিত ক্ষণিক আসক্তি বা বিরক্তি মাত্র হয়, কিন্তু সে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের ভাবনাশক্তি-বিরহিত ও উপস্থিত প্রত্যক্ষের অনন্তর ধারণাশক্তিশূন্য। যদিও নানা পদার্থ ক্রমান্বয়ে বিভাবনাশক্তি বলে তাহার ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয়, তথাপি উদ্ভাবনাশক্তির অভাবে ঐসকল পদার্থের পরস্পর ভেদ অনুভূত হয় না। কারণ, ভেদ জ্ঞান ধারণাশক্তি ও ভাবনাশক্তি জনিত বস্তুর সামানাধিকরণ্য (Juxtaposition) হইতে উৎপন্ন হয়। জন্তু, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি সমস্ত বিষয়ই ক্রমান্বয়ে একটির পর আর একটি করিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেও উহাদের চিন্তা ও ধারণাজন্য পরস্পর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চিন্তা হইতে পারে না। তচ্চিন্তাভাবে উপমিতির অভাব এবং তদভাবে বস্তু জ্ঞানেরও অভাব হয়।

এইরূপ মনুষ্যের মনে অস্ফুটভাবে যে সকল ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা হয়, ভাবনা ও ধারণার অভাবে একের অপগমে অপরের আবির্ভাব অনুভূত হয় না। সুতরাং উপমিতির (Comparison) অসম্ভাবনা প্রযুক্ত ব্যক্তিজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান ও অসম্ভব। ঐ মনুষ্য যে বিষয় মনন করিবেন তিনি তাহাদিগের বিশেষ জ্ঞানে অক্ষম। যাহা দর্শনাদি করেন, তাহাও কি বস্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। কেবল ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ও তদ্বৃত্তির প্রসারণে ক্ষণিক সুখ বা বিরক্তি উপলব্ধি করেন। ইহা দ্বারা সন্নিকর্ষের রীতি বা প্রমাতা ও প্রমেয়ের ভেদ পর্য্যন্তও অনুভূত হয় না। এই প্রকার জ্ঞানকে প্রকৃত প্রমাণ বলা যায় না, উহা প্রমাণের অঙ্কুর মাত্র।

যদি এরূপ হয় যে, এক ব্যক্তি সন্নিকর্ষেন্দ্রিয় ও ধারণাশক্তিবিশিষ্ট কিন্তু তাঁহার ভাবনা শক্তি নাই। তদ্রূপস্থলে, ক্রমান্বয়ে সমাগত বিষয়গুলি তাঁহার মনে কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করে, অথচ প্রমাতা স্বকীয় ইচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টা দ্বারা ঐ গুলিকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে বা উহাদের পুনরানয়ন ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ; এক কথায় সে ব্যক্তি কতক গুলি স্থায়ী সহজজ্ঞান বা বিভাবনাশক্তিবিশিষ্ট। এরূপ হইলেও উদ্ভাবনাশক্তি না থাকাতে প্রমাণ অসম্পূর্ণই থাকিবে। কারণ, স্মৃতির অভাবে প্রতিকৃতি জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে উপমিতি ও তজ্জনিত বিশেষ জ্ঞানাদিরও অভাব হয়।

সম্প্রতি আমরা আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইব। মনে করুন, এক ব্যক্তি সন্নিকর্ষেন্দ্রিয়, ধারণা ও ভাবনা শক্তি বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয় সকল ধারণাশক্তির অস্তিত্ব বশতঃ মনে কিয়ৎকালের জন্য—অপর বিষয়ের উপস্থিতির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিল, উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা দ্বারা তাহার গুণ সকলের একাধারে সমবায় স্থির করিল এবং অন্য বিষয়ের গুণ হইতে উহার গুণাবলিকে

বিশেষিত করিয়া ঐ পদার্থটিকে কতকগুলি বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট একটি বিশেষ পদার্থরূপে সিদ্ধান্ত করিল। এইরূপে একটী বিষয় ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে অনুপস্থিত কোন বিষয়কে স্বীয় চেষ্টায় পুনরানীত করে এবং তাহার সহিত উহার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য চিন্তা দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মবত্তার সিদ্ধান্ত করণে সমর্থ হয়। এক্ষণে বিভাবনা ও উদ্ভাবনা শক্তির সাহায্যে প্রমাণের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হইল। ইহাই প্রকৃত প্রমাণ। কারণ, এইস্থলে আমরা প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি এই তিনেরই ভেদ বুঝিলাম।

প্রমাণের এইরূপ বিভাগ দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত। কিন্তু মনুষ্যের সংস্কার ঈদৃশ দৃঢ় হইয়াছে যে ঐ সকল কার্য্যের অত্যন্ত সত্বরতা প্রযুক্ত কার্য্যকালে উক্ত ভেদ অনুভূত হয় না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষোৎপন্ন নামাদিব্যপদেশ রহিত ভ্রমভিন্ন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধসাপেক্ষ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ব্যতিরেকে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। দ্রব্য ক্রিয়া কিম্বা গুণ নির্দ্দিষ্টকাল বা আধার অথবা কাল ও আধার উভয়কে অধিকার করিয়া থাকে। উদ্ভাবনাশক্তির সহায়তা বিনা কেবল বিভাবনা শক্তি দ্বারা বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। পদার্থের পরম্পরা সম্বন্ধে উপস্থিতি অর্থাৎ উক্ত পদার্থের প্রতি কৃতি বা সঙ্কেত জ্ঞান অনুমিতির কারণ। এবং অনুমান প্রত্যক্ষের কার্য্য।

এইরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমাণের ভেদ অবগত হওয়া গেল। এক্ষণে আমরা প্রমাতা কর্ত্তৃক উপলব্ধ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের জ্ঞানরূপ প্রমাণের অবস্থা বিশেষকে বিভাবন এবং ঐ সকল জ্ঞানের পুনরুপস্থিত্যাদি জ্ঞানরূপ প্রমাণের অবস্থা বিশেষকে উদ্ভাবন নামে অভিহিত করিবার কারণ অবগত হইলাম। প্রথম অবস্থাতে বিষয়ের উপস্থিতি চেষ্টা ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। বিভাবন ও উদ্ভাবন শক্তির সমবেত কার্য্যই প্রমাণের সাধন। উভয়ের প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বিষয়ের উপস্থিতি ভাবনাশূন্য অতএব স্বভাবসিদ্ধা; কিন্তু শেষোক্ত ঘটনায় বিষয়ের উপস্থিতি ভাবনাজন্যা অতএব কৃত্রিমা।

যখন আমি একজন পরিচিত ব্যক্তিকে দর্শন করি, তাঁহার উপস্থিতি আমার মানসিক চেষ্টা দ্বারা সাধনের আবশ্যক হয় না। তিনি স্বয়ং আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইলেই দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন আমি একজন অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করিব, তখন তাঁহার আকার মনে আনয়ন করিতে চেষ্টার প্রয়োজন। এইরূপ দৃষ্ট ব্যক্তিরও অনুভবে কিম্বা দৃষ্ট ব্যক্তিকে পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া অবধারণে উপমিতি জনক চিন্তার প্রয়োজন।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত হওয়া গেল যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপাদান দুইটি। একটি প্রমাতা অপরটি প্রমেয়। প্রত্যক্ষকালে কেবল প্রমাতা ও প্রমেয়ের অপরিস্ফুট ক্ষণিক সন্নিকর্ষ বোধ হয়। এই প্রমাণে তদুভয়ের স্বরূপ অবগতি হয় না। প্রমাতা তৎকালে একটি বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট এই মাত্র বোধ করাইয়াই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিবৃত্ত হয়।

এই প্রমাণে আমরা দুইটি পদার্থ অনুভব করি। একটি আধার অপরটি কাল। ঐ কাল ও আধার জ্ঞান কি, বা কিরূপে হয়, তাহার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষকালে অবগত হই না। কিন্তু অস্ফুটভাবে কাল ও আধারের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এক্ষণে কাল ও আধার বস্তুই বিচার্য্য হইলেও উপস্থিত প্রস্তাবের অযোগ্য বোধে আপাততঃ স্থগিত রাখা হইল। সম্প্রতি এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কাল ও আধার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও উহারা স্ব স্ব গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। আধার জ্ঞান ও কাল জ্ঞান আমাদিগের ঐন্দ্রিয়িক প্রসারণ ও সন্নিকর্ষ মূলক আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। প্রত্যক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইন্দ্রিয়গোচর গুণগণের আধার স্বরূপ কাল ও আধার স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত না হইলেও কাল ও আধারের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, বাহ্যজগতের প্রত্যক্ষ বিভিন্ন অবস্থায় নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইলেও কোন কালেই বা কোন অবস্থাতেই উহাদের অস্তিত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না সত্য বটে, কিন্তু অস্তিত্বের অভাব ও অসম্ভব। আমরা কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে পারি; কিন্তু নিরাধার বা গুণের আধার গুণের অনুভব করিতে পারি না। আধার বা বিশেষ জ্ঞান, সামান্য জ্ঞান, ও কাল জ্ঞান এই তিন জ্ঞানেরই প্রকৃতি একই রূপ। তিনটির মধ্যে কোনটিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গোচর না হইয়াও সম্বন্ধ বিশেষ দ্বারা নিজ নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। আধার ব্যক্তির বোধক, সামান্য জাতির বোধক এবং কাল অবস্থার বোধক। ইন্দ্রিয় শক্তির প্রসারণ হইতে আপেক্ষিক ভাবে ব্যক্তি ও জাতি জ্ঞান এবং ঐ শক্তির সন্নিকর্ষ হইতে আপেক্ষিক ভাবে কাল জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ী ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফল স্বরূপ। উভয়ের মধ্যে একের অভাব হইলেই প্রমাণের অসঙ্গতি হইবে।

সন্নিকর্ষ। সন্নিকর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত;—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ (Sensation) ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ (Perception) ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রসারণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত সঞ্চালন বা সন্নিকর্ষজনিত

জ্ঞান বিশেষ। সুতরাং অলৌকিক লৌকিকের কার্য্য বা পরাবস্থা।

জ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত;—প্রথম প্রমাতৃ জ্ঞান, দ্বিতীয় প্রমেয় জ্ঞান। প্রমাণে উভয়ে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করে। উভয়ের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ বিশেষ হইতেই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অতঃপর ঐ সম্বন্ধ প্রকারই বিশেষ রূপে আলোচিত হইতেছে।

আমাদিগের শরীরের দুইটি অংশ। প্রমাতা ও ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—স্বাধীন ও পরাধীন। চেতন শরীরের নাম প্রমাতা এবং অচেতন শরীরের নাম ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ শরীরের যে অদৃশ্য অংশ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে চেতন শরীর বা প্রমাতা এবং যে যে অংশ ঐ জ্ঞান কার্য্যের সহায়তা করে, তাহাকে ইন্দ্রিয় বা জড় শরীর বলে। স্বাধীন ও পরাধীন সমস্ত জড় শরীর অস্থি ও চর্ম্মাবরণে আবৃত অস্থিদণ্ড বিলম্বিত সূক্ষ্ম শিরা সমূহের সমষ্টি। ঐ সকল শিরা ও অস্থ্যাদি শরীরের দক্ষিণ ও বাম ভাগে সমকার্য্যকারী সমসংখ্যক দুই সমাংশে বিভক্ত; সুতরাং সমস্ত শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দুইটি দুইটি। পূর্ব্বোক্ত শিরা সকল ও দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম জ্ঞানজনক শিরা এবং অপর ভাগের নাম ক্রিয়াজনক শিরা। জ্ঞানজনক শিরা সকল ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে নীত করিয়া বস্তুজ্ঞান সম্পন্ন করে এবং ক্রিয়াজনক বা গতিজনক শিরা সকল তৎতৎ বস্তুসম্বন্ধীয় ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল স্বাধীন ও পরাধীন নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। যে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রাক্‌কালে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিশেষ লক্ষিত হয়, তাহারাই পরাধীন ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাতে যে সকল ইন্দ্রিয় ইচ্ছাশক্তির অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই পরাধীন ইন্দ্রিয়। এবং যে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রাক্‌কালে মস্তিষ্কের ঐ ইন্দ্রিয়কে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না, তাহারাই স্বাধীন ইন্দ্রিয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয় প্রায় সকল সময়েই কেবল ভৌতিক নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। স্বাধীন ক্রিয়াগুলি আমরা নিষেধ করিতে ও জানিতে পারি এবং পরাধীন ক্রিয়াগুলি ইচ্ছার অভাবে ও আমাদের অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক।—মস্তকস্থ শ্বেতাভ কোমল পদার্থ বিশেষকেই মস্তিষ্ক (Brain) কহে। মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। ঐ সকল অংশ বিশেষের ক্রিয়া বিশেষের পরই সমস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী মজ্জা বা কোমলাংশ আঘাত হইতে রক্ষার জন্য প্রথমতঃ চর্ম্ম ও তদনন্তর অস্থিময় আবরণে আবৃত। মস্তিষ্ক প্রধানতঃ স্বসম্পূর্ণ পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত।

প্রত্যেক অংশ হইতেই কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বিনির্গত হইয়া দেহের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদিত করিয়া আছে। ঐ সকল শিরা যথাসময়ে পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে পদার্থের প্রতিকৃতি ধারণে প্রবর্ত্তিত করে। উহারা মেরুদণ্ডের গাত্রাবলম্বনে শৃঙ্খলের ন্যায় অবস্থিত। যে সকল শিরা মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত তাহাদের নাম গতিজনক শিরা। উহারাই ইন্দ্রিয়ের গতিবিধান করে এবং যাহারা উক্ত মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে বিলম্বিত তাহারাই জ্ঞানজনিক শিরা। ঐ সকল শিরা ইন্দ্রিয় হইতে পদার্থের প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে আনয়ন পূর্ব্বক জ্ঞান সম্পাদন করে। যখন আমরা এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহে হস্তার্পণ করি, অথবা চক্ষুতে কোন বস্তু পতিত হয়, তখন জ্ঞানজনক শিরা সকল ঐ উত্তাপ প্রতিকৃতি বা পতিত বস্তুর প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে আনয়ন পূর্ব্বক গতিজনক শিরা দ্বারা লৌহ হইতে হস্তাপসরণ বা চক্ষু নিমীলন ক্রিয়া সম্পাদন করে। উক্ত ক্রিয়া তাড়িত ক্রিয়ার ন্যায় অতি সত্বর নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের অধোভাগস্থ পূর্ব্বকথিত মস্তিষ্কের প্রধান অংশ দ্বয়ের ঠিক মধ্য প্রদেশকে কৈশিক কেন্দ্র (nerve centre) বা মন (Mind) বলে। উহাই মস্তিষ্ক দ্বয়ের সন্ধিস্থল। ঐ অংশ হইতেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কাতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সকল প্রধান দুই অংশে বিভক্ত; জড়েন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। জড়েন্দ্রিয় কতকগুলি অস্থি ও স্নায়ু বা শিরার সমষ্টি মাত্র। জড়েন্দ্রিয়ের নিজের স্ফুট চৈতন্য নাই। সুতরাং জড় শরীরের অংশভূত হৃদয়, ফুস্‌ফুস, উদর, লিঙ্গ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, কোষ্ঠ, শ্বাসপ্রণালী প্রভৃতি শরীরাংশ সকল অস্থিময় গৃহে অবস্থিত হইয়া জীবনোপযোগী কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করে। পরিপাক, শ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পোষণ ও রস বিভাগাদি ক্রিয়া সমূহ ঐ সকল অঙ্গ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

প্রাণীর শরীর জীবিতাবস্থায় প্রতিনিয়তই যথাক্রমে ক্ষয় ও বৃদ্ধি ভজনা করিয়া থাকে। ক্ষয়, শ্বাস প্রভৃতি নিঃসারক ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং বৃদ্ধি পরিপাক ও রক্তসঞ্চালনাদি পোষক কার্য্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রী বদনস্থ হইলেই দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত ও লালা মিশ্রিত হইয়া গলনলী পথে অধঃকৃত ও পাকযন্ত্রস্থ হয়। তথায় ঐ ভুক্ত দ্রব্য অম্লাদি রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত এবং সার ও অসার নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়। তদনন্তর ভুক্তবস্তুর সারভাগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া রক্তাধারে উপস্থিত হয় ও অসারাংশ অধোগামী হইয়া বহির্গমন করে। রক্তাধারগত ভুক্তসার বা রক্ত শিরা বিশেষ দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্র নীত হইয়া পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ক্রমে ঐ রক্ত

দূষিত হইলে পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত ও শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার পোষণ ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। কোন কারণে রক্ত সঞ্চালন রহিত হইলেই মস্তিষ্কের ক্রিয়ারাহিত্য ও জীবন বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্ক যতক্ষণ জাগরিত থাকে অর্থাৎ কার্য্য করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না উহার ক্লান্তি হয় সেই পর্য্যন্ত শারীরিক রক্তসঞ্চালনাদি সকল ক্রিয়াই তীব্রভাবে হইতে থাকে। উহার বিশ্রাম সময়ে রক্তাদি সঞ্চালনের গতিও মৃদু হয় এবং তখনই নিদ্রার আবির্ভাব হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। দর্শন—চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় (Organ of sight)। আমরা অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা অধিক জ্ঞান লাভ করি। ঐ কার্য্যের বাধার নিরাকরণার্থ চক্ষু অধিক সহিষ্ণু রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয় হইতে দৃশ্য-পদার্থ-সন্নিকর্ষজনিত সুখ ও দুঃখের জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হইয়া থাকে। চক্ষু দর্শন জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। পদার্থের সাক্ষাৎসম্বন্ধ দর্শন জ্ঞানের কারণ নহে। কারণ, পদার্থের সহিত দর্শন জ্ঞানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ঘটে না। তৈজস পরমাণু বা কিরণাংশ বস্তুতে পতিত হইলে বস্তু নিজ শক্তি দ্বারা কিরণান্তর্গত কতকগুলি বর্ণ আত্মশরীরে বিলুপ্ত করে এবং অবশিষ্ট বর্ণ ঐ বস্তুতে প্রকাশিত হয়। ঐ বস্তু প্রতিফলিত কিরণ চক্ষুর ন্যুব্জাকৃতি উপরিভাগে পতিত হয়। চক্ষুর উপরিভাগের অর্দ্ধগোলাকৃতিত্ব প্রযুক্ত উক্ত কিরণাংশ চক্ষুর্গোলকেই পতিত হয়। উক্ত গোলক বা তারকা গোলাকার ও সচ্ছিদ্র। ঐ ছিদ্র কিরণের তারতম্য অনুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঐ কিরণ তারকার পশ্চাদ্ভাগ-সম্বদ্ধ শিরার মুখভাগস্থ কোমল স্বচ্ছ আবরণে বিপরীত ভাবে পতিত হয়। উক্ত আবরণ নিপতিত কিরণ তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সচ্ছিদ্র জালবৎ আবরণের অভ্যন্তর দিয়া দর্শনশিরায় পতিত হয় এবং উক্ত শিরা মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পরমাণু (Ether) সমূহের কম্পন সহকারে মস্তিষ্কে নীত হইয়া দর্শনজ্ঞান বা রূপজ্ঞান নিষ্পন্ন করে। দৃশ্য পদার্থের দূরত্ব, আকার, পরিমাণ এবং চক্ষুর ও তৎপতিত প্রতিবিম্বের আকার, অবস্থা ও পরিমাণাদি পর্য্যালোচনা করিলে দর্শন জ্ঞানকে সহজ না বলিয়া সংস্কারজ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কেবল রূপের বোধ হয়, তাহা নহে; সময়ে সময়ে কঠিনতা ও বন্ধুরতাদি ও অনুমিত হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য দৃশ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্নিকর্ষের দর্শন জ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্যকারণ ভাব দেখা যায় না; অতএব দর্শনেন্দ্রিয়কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদিন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট-গুণাতিরিক্ত তদ্‌গুণের বাহ্য আধারভূত পদার্থের অস্তিত্বের অনুমাপক স্বরূপে স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। ইহা পরম্পরা সম্বন্ধে যে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ করে তাহাও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্যবস্তু

নহে। চক্ষু দ্বারা কাঠিন্যাদি জ্ঞান সংস্কার সাপেক্ষ। প্রাগাত্মপ্রবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়জন্য অতএব প্রমাতৃবোধক রূপজ্ঞান আলোকেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে দর্শনশক্তির বা দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রসারণ মাত্র।

রসন। (Taste)—রসনা রসনেন্দ্রিয়ে। রসকেও রূপের ন্যায় বস্তুর ধর্ম্ম বলা যায় না। কারণ, উহা বস্তুর ধর্ম্ম হইলে ইন্দ্রিয়বৈকল্যেও রসের বৈরূপ্য ঘটিত না। অতএব রস রসনেন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইয়া রসন-শিরামধ্যস্থ অণুসমূহের যথারীতি কম্পন সহকারে রস প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে নীতি করিয়া রসজ্ঞান নিষ্পাদন করিলেও রসেনেন্দ্রিয় দ্বারা তদিন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। রসজ্ঞান পূর্ব্ববৎ প্রমাতার রসনশক্তির বা রসনেন্দ্রিয়ের প্রসারণ মাত্র বোধ করাইয়াই নিবৃত্ত হয়।

ঘ্রাণ (Smell)—নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যখন আমরা কোন পুষ্পাদি আঘ্রাণ করি; শারীরশাস্ত্রমতে ঐ পুষ্পাদির পরমাণু বায়ু কর্ত্তৃক নাসাবিবরে নীত হইলেই গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এক পদার্থ ঐরূপ গন্ধীয় পরমাণু বিসর্জ্জন করিলেও তাহার পরিমাণের হ্রাস হয় না। বিশেষতঃ গন্ধাদিদ্রব্য ব্যতিরেকেও বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা গন্ধাদিজ্ঞান সাধিত হইতে পারে। গন্ধের বস্তুধর্ম্মত্ব হইলে অবস্থা বিশেষে গন্ধ তারতম্য ঘটনাও সম্ভব হইত না। সুতরাং গন্ধজ্ঞানও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণে অসমর্থ। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রমাতৃপ্রবর্ত্তিত রসন শক্তির বা রসনেন্দ্রিয়ের প্রসারণ জ্ঞান মাত্রই হইয়া থাকে।

স্পর্শন (Touch)—সর্ব্বশরীরব্যাপী ত্বকই স্পর্শেন্দ্রিয়। অনেকেই বলেন, স্পর্শেন্দ্রিয়জ জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সহজ জ্ঞান। স্পর্শেন্দ্রিয় অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় স্পর্শগুণ গ্রাহক নিজের বিশেষ গুণবিশিষ্ট হইয়াও প্রসারণাদি কতকগুলি সামান্য গুণবিশিষ্ট। ঐ সকল গুণ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়েরই রূপাদি বিশেষ জ্ঞান হইত না। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সর্ব্বশরীর ব্যাপকত্বই তাঁহাদিগের যুক্তির প্রধান সাধন। কিন্তু আমরা ঐ মতের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি বিশিষ্ট নহি। আমরা বলি, স্পর্শেন্দ্রিয় অপরাপর সকল ইন্দ্রিয়েরই সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। উহা দ্বারাও ইন্দ্রিয় শক্তির প্রসারণ জ্ঞান ভিন্ন অপর কোন জ্ঞানই জন্মে না। স্পর্শ জ্ঞান ও অপরাপর জ্ঞানের ন্যায় সন্নিকর্ষজ জ্ঞান এবং প্রমাতার অনুমাপক। স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইয়াও যখন প্রমাতার ইচ্ছাজনিত প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে স্পর্শজ্ঞান সাধন করিতেই অসমর্থ তখন উহাকে অপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট বোধ করা ভ্রম মাত্র। ঘনত্বাদি জ্ঞান সংস্কারজ ও আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। আমাদিগের শরীরের আণবিক সংযোগ অপেক্ষা যে পদার্থের আণবিক

সংযোগ নিবিড় তাহাই ঘন, কঠিন ও গুরুরূপে অনুভূত হয় এবং যাহা অপেক্ষাকৃত বিরল তাহাই তরল, কোমল ও লঘুরূপে অনুভূত হয়। দৈর্ঘ্যাদি জ্ঞান ও শারীরিক প্রসারণ জন্য আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। উষ্ণতা ও শৈত্য আণবিক কম্পনজনিত উত্তাপের তারতম্য অনুসারে শারীরিক অণু সকলের সঙ্কোচন ও প্রসারণের অল্পতা ও আধিক্যের আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। ফলতঃ সমস্ত স্পর্শজ জ্ঞানই সংস্কারজ এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানবৎ সমভাবে উৎপন্ন ও তৎসমধর্ম্মী।

শ্রবণ (Hearing)—কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রবণজ্ঞানও অপরাপর জ্ঞানেরই ন্যায় সন্নিকর্ষজ জ্ঞান। সুতরাং স্পর্শ জ্ঞানেরই রূপান্তর মাত্র। শব্দিত বস্তু সঞ্চালিত বায়বীয় পরমাণু দ্বারা আনীত শব্দে শ্রবণ বিবর প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের আঘাতে শ্রবণ শিরা মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পরমাণু সকলের কম্পন সহকারে শব্দ প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে নীত হইলেই শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। শব্দের দূরত্ব ও মধুরতাদি জ্ঞান কম্পন পরিমাণ অনুসারে সংস্কার বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণজ্ঞান ও পূর্ব্ব পূর্ব্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়শক্তির প্রসারণ ভিন্ন অপর কোন বাহ্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে না।

ইন্দ্রিয় সকল যখন প্রমাতার ইচ্ছাধীনেই পরিচালিত হয় তখন ইন্দ্রিয় সকলকে প্রমাতার জনক বলা যাইতে পারে না পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের কারণ বলিলে স্মরণাদির অনুপপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রমাতার অস্তিত্বের প্রমাণ কর্ত্তা। ইন্দ্রিয় বিশেষের অভাবে বা বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সন্নিকর্ষের অভাবে কিম্বা কোন কোন ইন্দ্রিয়শক্তির প্রসারণাদিরও হানি হইলেও তত্তদিন্দ্রিয়জন্য সংস্কারের ধ্বংস হয় না, বিশেষতঃ মৃত শরীরে জ্ঞান কার্য্যের অভাব দৃষ্ট হয় এবং জীবিত শরীরে কোন অবস্থাতেই প্রমাতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। তখন কেবলমাত্র জড়কে জ্ঞানের হেতু বলিয়া জড়-ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চেতন প্রমাতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। এইরূপ চেতনকেও কেবল মাত্র জ্ঞানের কারণ বলা যায় না। কারণ, জ্ঞান ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয় শক্তির প্রসারণ ভিন্ন উৎপন্ন না হইলেও সন্নিকর্ষাভাবে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব কোন কালেই বিলুপ্ত হয় না। সুতরাং জড় ও চেতন এতদুভয়ের সন্নিকর্ষই জ্ঞানকারণ রূপে সিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রমাণের উপাদানত্রয়োক্তিও সঙ্গত হইল। প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি; অথবা প্রমাতা, ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট বাহ্যবস্তু এবং ইন্দ্রিয় শক্তির প্রসারণ এই তিনটিই প্রমাণের উপাদান ও সাধন। প্রমাণের বিভাবন ও উদ্ভাবন নামক অংশদ্বয়ের ন্যায়, এই উপাদানত্রয়ের মধ্যে একের অভাব হইলেই প্রমাণের অনুপপত্তি হইবে।

সঞ্চালন শক্তি (Locomotive faculty) পূর্ব্বে যে স্বাধীন ও পরাধীন ভেদে ইন্দ্রিয়ের দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বাধীন ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ও পাকযন্ত্রাদি যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার বিষয় এ প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। ইহাতে কেবল পরাধীন ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদির বিষয়ই আলোচিত হইবে। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হয় তাহারই নাম সঞ্চালনী বা প্রবর্ত্তনী শক্তি। ঐ শক্তি প্রমাতার ইচ্ছার অধীন। উহা ইন্দ্রিয়ের স্বায়ত্ত শক্তি নহে। আমরা সকল সময়ে আমাদিগের ইচ্ছার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। ভ্রমণ কালে আমাদিগের গমন প্রবৃত্তি ও গতি ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইলেও আমরা সকল সময়ে তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হই না। ইচ্ছা প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তি বেগের হেতু। ঐ বেগ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের পরিচালনরূপ শক্তি প্রকাশ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের বেগ ব্যাহত হইলেই আমরা বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি করি। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ বাহ্য উপলব্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ করে না। উহা দ্বারা আমাদিগের চেষ্টার ব্যাঘাতজনক বিষয় মাত্র উপলব্ধ হয়—উহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির বাধামাত্র প্রকাশ করে। ঐ বাধা হইতে আমরা স্বীয় চেষ্টার বিরোধী বিষয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। শ্রান্তি প্রভৃতি স্নায়বীয় কার্য্যজ্ঞানও আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির বাধাজনক অবস্থা বিশেষের জ্ঞানমাত্র। ইহাও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

গুণ (Quality)।—গুণ দুই প্রকার; —সামান্য ও বিশেষ। যে গুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় তাহাই রূপাদি বিশেষ গুণ, এবং যে সকল গুণ পরম্পরা সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় তাহারাই সংখ্যাদি সামান্য গুণ সামান্যগুণগুলি সকল ইন্দ্রিয়েরই বেদ্য। গুণ গুণাধারে অবস্থান করে না; দ্রব্যই গুণের আধার। গুণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর উপলব্ধি করাইয়া দেয় না। পরম্পরা সম্বন্ধে গুণ দ্বারাই বস্তুসত্তা অনুভূত হইয়া থাকে।

সংস্কার (Acquired pereeption)। প্রথমতঃ পদার্থের উপলব্ধি হইয়া তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপলব্ধি ও ধারণাজন্য সংস্কার হইতে অনুমান হইলেই বস্তুজ্ঞান হয়। অতএব সমস্ত প্রমেয় জ্ঞানই সংস্কারজ। আমরা যৎকালে পুস্তকাদি পাঠ করি, প্রত্যেক অক্ষর ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরের সংস্কার হইতে যে অনুমান হয়, সেই প্রত্যক্ষ জন্য অনুমানই পদজ্ঞানের ও অর্থ জ্ঞানের কারণ। ঐ পদার্থজ্ঞান প্রত্যক্ষ, সংস্কার ও তদনন্তরজ অনুমান হইতে সমুৎপন্ন হয়। শ্রবণাদি জ্ঞানও ঐরূপ। সংস্কারবশতঃ উক্ত ক্রম লক্ষ্য হয় না। সুতরাং জ্ঞানের ঐককালিকতা বোধ ভ্রান্তি মাত্র।

মনঃসংযোগ (Attention) আমাদিগের সাধারণতঃ বোধ হয় যে, যে পদার্থের সহিত আমাদিগের মনঃসংযোগ হইবে, অগ্রে সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয়ীর গোচর হইলেই মনঃসংযোগ হয়; অর্থাৎ বিষয় সন্নিকর্ষই মনঃসংযোগের হেতু। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে মনঃসংযোগ না হইলে বিষয়জ্ঞান হয় না। মনঃসংযোগই বিষয় জ্ঞানের কারণ। সময়ে সময়ে বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে কি দর্শন কি শ্রবণ কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হয় না। বিপক্ষেরা কোন অদ্ভুত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ কোন তীব্র দৃশ্য বা শব্দাদি দ্বারা অন্যচিত্ত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণের প্রমাণ দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই স্থির হইবে যে, পদার্থ ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলেই বিভাবন শক্তি দ্বারা সেই পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় বটে, কিন্তু মনঃসংযোগের অভাবে উদ্ভাবন শক্তির কার্য্যের অভাব প্রযুক্ত বস্তুর অনুমান হয় না। সুতরাং বস্তুজ্ঞানও হয় না। বস্তুজ্ঞানে, প্রথম বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, তদনন্তর মনঃসন্নিকর্ষ, অবশেষে চিন্তার আবশ্যক। এই তিনের মধ্যে একটির অভাব হইলেই বস্তুজ্ঞানেরও অভাব হয়।

কল্পনা (Imagination), স্মৃতি (Memory) ও আশা (Hope) দর্শন শাস্ত্রের মতানুসারে একই এবং একই শক্তির কার্য্য। অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত নামভেদ মাত্র। বিভাবিত বা প্রত্যক্ষ বস্তুর ও তৎসমধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু প্রতিকৃতির বর্ত্তমানকালে মনে উপস্থিতির জ্ঞানই কল্পনা। অতীতকালে যে বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল তাহার প্রতিকৃতির উপস্থিতি জ্ঞানই স্মৃতি। ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিকৃতির মনে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাসূচক জ্ঞানই আশা নামে অভিহিত হয়। অনুপস্থিত বন্ধুর আকার জ্ঞানই কল্পনা। ঐ আকার আমার বন্ধুরই এইরূপ জ্ঞানই স্মৃতি এবং ঐ আকার পরেও আমার মনে উদিত হইবে এইরূপ সম্ভাবনাই আশা নামে কথিত হয়।

মানস প্রত্যক্ষ (Internal intuition) এতাবৎকাল বাহ্য প্রত্যক্ষের (External intuition) বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয় কিছু আলোচনা করিব। ঐ বিষয় আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ মনোবৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং আদৌ তাহাই সমারব্ধ হইতেছে।

মনোবৃত্তি বা বুদ্ধি অজন্যা ও সম্পাদ্যা ভেদে (Involuntary or intellectual and voluntary or emotional) দ্বিবিধা। চিন্তা নিরপেক্ষা বুদ্ধির নাম অজন্যা বুদ্ধি এবং চিন্তাসাপেক্ষা বুদ্ধির নাম সম্পাদ্যা বুদ্ধি। অজন্যা বুদ্ধি সম্পাদ্যা বুদ্ধির ন্যায় ইচ্ছাশক্তির বশীভূতা

থাকে না। এই বুদ্ধি বৃত্তিভেদে তিন প্রকার। পাশব বৃত্তি, পাশব মতি ও মানব মতি। মানবের যে বৃত্তি পশুর সদৃশী তাহারই নাম পাশব বৃত্তি। মানবের যে মতি পশুর তুল্যা তাহা পাশবমতি এবং যে মতি মানব সাধারণী তাহাই মানবমতি। সম্পাদ্যা বুদ্ধিও বৃত্তি ভেদে চতুর্ব্বিধা। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বিষয় জ্ঞান, বিষয়সম্বন্ধ জ্ঞান এবং চিন্তন। ঐ প্রত্যক্ষও শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। দর্শনাদি প্রত্যক্ষই শারীর প্রত্যক্ষ। এবং প্রণয়াদি প্রত্যক্ষের নাম মানস প্রত্যক্ষ। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ও তাহার গুণের জ্ঞানই বিষয়জ্ঞান এবং তদ্বিষয়ক সম্বন্ধ জ্ঞানের নামই বিষয় সম্বন্ধ জ্ঞান। এবং বিচার সাধন জ্ঞানের নামই চিন্তন।

পূর্ব্বোক্ত পাশববৃত্তি প্রণয়, স্নেহ, অনুরাগ, ক্রোধ, হিংসা, গুপ্তি, লোভ, সিসৃক্ষা ও স্থৈর্য্য এই নববিধ। এই সকল বৃত্তি যথাসম্ভব হইলে উপকারিণী হইয়া থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত হইলে অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

১। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির পরস্পরের প্রতি যে আসক্তি হয় তাহাই প্রণয় নামে কথিত হয়। এই প্রণয়ই পরিবার গঠনের ভিত্তিস্বরূপ এবং সমাজ নির্ম্মাণের সূত্রপাত।

২। সন্তানের প্রতি যে প্রীতি তাহাকেই স্নেহ বলে। এই পশুস্বভাবসুলভ স্নেহবৃত্তি না থাকিলে মানব ঈদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতেন না। সুতরাং মানব সমাজের বৃদ্ধিও হইত না।

৩। বন্ধু, পরিজন, সমাজ, গৃহ ও দেশাদির প্রতি যে মমতা তাহারই নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ না থাকিলে সমাজবন্ধন বা দেশের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না।

৪। বিরক্তিজনক আচরণ হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয় তাহারই নাম ক্রোধ। ক্রোধ হইতেই উহার প্রতিকারের ইচ্ছা হয়। এই বৃত্তি না থাকিলে পৃথিবী অল্পকাল মধ্যেই অসদাচার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

৫। অসদাচারের প্রতিকার চেষ্টাই হিংসা। পূর্ব্বোক্ত ক্রোধ এবং এই হিংসা মানবের রক্ষক এবং নাশক। ক্রোধ এবং হিংসা অতিরিক্ত হইলেই লোকের অনিষ্ট সাধন করে। উক্ত বৃত্তি দ্বয়ের অভাবও অভিপ্রেত নহে। কারণ, ক্রোধ ও হিংসা না থাকিলে দুষ্টগণ দুর্দ্দান্ত ভাবে দেশের সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করিত। কালে দেশ হইতে শিষ্টগণ অপসারিত হওয়াতে দুষ্টগণেরই একাধিপত্য হইত।

৬। যাহা আমরা অপরকে জানাইতে ইচ্ছা করি না তাহার গোপন চেষ্টার নামই গুপ্তি। এই বৃত্তি হইতে পরচিত্তাবগতি ও পরবিনোদনাদি দ্বারা যেরূপ উপকার হয় সেইরূপ মিথ্যাপ্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা অপকারও হইয়া থাকে। ইহারও আধিক্য নিতান্ত অপকারক।

৭। অর্জ্জনেচ্ছাকেই লোভ বলে। ইহাও কখন সৎ ও কখন অসৎ হইয়া থাকে। পরের অপকার সাধন পূর্ব্বক যে অর্জ্জনেচ্ছা তাহাই অমঙ্গল জনিকা। এবং তদ্বিপরীত ইচ্ছাই সদিচ্ছা। অর্জ্জনেচ্ছার অত্যাধিক্য অপকারক হইলেও যথাসম্ভব অর্জ্জনেচ্ছার উপকারিত্ব আছে। এই বৃত্তি ব্যতিরেকে কি বিদ্যা কি ধন কিছুই অর্জ্জিত হইত না।

৮। সর্জ্জনেচ্ছার নাম সিসৃক্ষা। এই বৃত্তিও মানবের পশু সাধারণ বৃত্তি। এই সর্জ্জনেচ্ছা পক্ষীপশু প্রভৃতি হইতে ক্রম বিকাশে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণেচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই মানব নানা দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বৃত্তি হইতেই শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

৯। মনের স্থিরতা বা চাঞ্চল্যের অভাবই স্থৈর্য্য। এই বৃত্তি হইতে আমরা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই বৃত্তির উপকারাংশই অধিক। স্বার্থহানি স্থলে স্থৈর্য্যই অপকারক। ইহাই স্মৃতির কারণ।

পাশব মতি অভিমান, যশোলিপ্সা, সাবধানতা ও দয়া এই চারিভাগে বিভক্ত।

১। স্বীয় গৌরবরক্ষিণী মতির নাম অভিমান। ইহা উপকারিণী বৃত্তি। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব গৌরব হানির ভয়ে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। এই অভিমান যখন গর্ব্বে পরিণত হয়, অর্থাৎ 'আমার ন্যায় উন্নত আর কেহ হইতে পারে না' এইরূপ বোধ হয় তখন ইহা মানবের অবনতির সূত্রপাত করে।

২। খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছাই যশোলিপ্সা। ইহাও সৎমতি এবং উন্নতি সাধনী। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ ও অপকার সাধনী।

৩। স্বসম্বন্ধীয় বিষয়ের রক্ষণেচ্ছাই সাবধানতা বা সতর্কতা। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব দুষ্ট হইতে ও অপকার হইতে অনেক সময়ে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কিন্তু কাপুরুষের সাবধানতা গৌরবসূচক নহে।

৪। পরদুঃখনিবারণেচ্ছার নামই দয়া। ইহা মানবের একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি। কিন্তু এই দয়া অযোগ্য পাত্রের উদ্দেশে হইলে ইহার অসদ্ব্যবহার হয়।

মানব মতি অর্থাৎ মানবের যে মতির পশুর সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না তাহার নামই মানব মতি। এই মতি ভক্তি, সত্যানুরাগ, সঙ্কল্প, স্মৃতি, কল্পনা, আশা, মোহ, নৈপুণ্য, অনুকরণ এই নয় প্রকার।

১। ভক্তি মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব উপাসনাদি সৎকর্ম্ম গুরুজন সেবাদি ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়। অজ্ঞানতা এই ভক্তিকে অপাত্রে ন্যস্ত করে।

২। সত্যানুরাগ বৃত্তিও উৎকৃষ্ট বৃত্তি। ইহা হইতেই নীতির ও ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই বৃত্তি না থাকিলে সৎ অসৎ বিবে-

চনা রহিত হইয়া মানব পশুতুল্য হইতেন।

৩। সঙ্কল্প—কার্য্যে দৃঢ়তার নামই সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প সৎসঙ্কল্প হইলেই মানবের উন্নতি করায়ত্ত হয়। কিন্তু অসৎ কর্ম্মের সঙ্কল্পই বিনাশজনক।

৪।৫।৬। কল্পনা, স্মৃতি ও আশা এই তিন বৃত্তিই সম্ভবপর হইলেই মানবের উপকার নতুবা অপকার ও অগৌরব হইয়া থাকে। এই বৃত্তিত্রয়ের অভাবে মানবের জীবন ধারণই ব্যর্থ। মানবের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহারই কারণ এই বৃত্তিত্রয়। এই বৃত্তি সমূহই মানবের মানবত্ব প্রমাণ করে। তদ্ভিন্ন মানবের পশু হইতে পার্থক্য থাকিত না।

৭। নিজের অসাধ্য অজ্ঞাত বা অবোধ্য কোন অদ্ভুত বস্তু বা ক্রিয়া সন্দর্শনে যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহারই নাম মোহ। এই বৃত্তি না থাকিলে কেহ কোন অসাধারণ বস্তুর বা ক্রিয়ার গৌরব করিত না। ইহা না থাকিলে অনেক লোকের ধর্ম্মভাব জন্মিত না। কিন্তু এই বৃত্তিরও অপকৃষ্ট অংশ আছে। ইহা হইতেই যাবদীয় কুসংস্কারের উৎপত্তি। অজ্ঞতাই এই বৃত্তির দূষক এবং জ্ঞানই ইহার গুণাধায়ক।

৮। নৈপুণ্য।—শিক্ষা দ্বারা যে দক্ষতা জন্মিবে তাহারই নাম নৈপুণ্য। সৎবিষয়ক নৈপুণ্যই মানবের উপকারক এবং তদ্বৈপরীত্য অপকারক।

৯। পরবৃত্তির সাদৃশ্য লাভের চেষ্টাই অনুকরণ। অর্থাৎ যিনি যে গুণশালী তাঁহার সেই গুণের ন্যায় নিজ গুণের অর্জ্জন চেষ্টার নাম অনুকরণ। এই বৃত্তি অনুকার্য্যের গুণ অনুসারে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অজন্যা বুদ্ধির বিভাগ শেষ হইল। এক্ষণে সম্পাদ্যা বুদ্ধির বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বুদ্ধি প্রত্যক্ষ, বিষয় জ্ঞান, বিষয় সম্বন্ধ জ্ঞান এবং চিন্তন, এই চারিভাগে বিভক্ত।

১। প্রত্যক্ষও শরীর ও মানসভেদে দ্বিবিধ। মানস প্রত্যক্ষ একই। শারীর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভেদে পঞ্চ। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, রাসন ও স্পর্শ। এ বিষয় পূর্ব্বেই সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

২। বিষয় জ্ঞানের সাধন অস্তিত্ব জ্ঞান, আকার, পরিমাণ, গুরুত্ব, এবং রূপাদি। এই পঞ্চ গুণ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহারই নাম বিষয় জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে অস্তিত্ব জ্ঞানই প্রধান জ্ঞান। অপর জ্ঞানগুলি ঐ জ্ঞানেরই আনুসঙ্গিক আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। এ বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে।

৩। বিষয় সম্বন্ধ জ্ঞান। যে সকল ভাব দ্বারা বিষয় সকলের পরস্পর সংশ্রব জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহারই নাম বিষয় সম্বন্ধ জ্ঞান। ইহা অষ্টবিধ। যথা;—অবস্থান, সংখ্যা, রীতি, ঘটনা, কাল, দিক, স্বর, ও ভাষা। গুণ-তারতম্য অনুসারে নির্ব্বাচিত স্থানে বাসের

প্রবৃত্তিই অবস্থান। ইহা মানবের গুণতারতম্যে উৎকৃষ্ট ও উপকারক এবং অপকৃষ্ট ও অপকারক হইয়া থাকে। একত্ব দ্বিত্র্যাদিগণনাই সংখ্যা। সংস্থান প্রণালীর নাম রীতি। কার্য্যোৎপত্তির নাম ঘটনা। ক্রিয়া নিচয়ের মানস সন্নিকর্ষই কাল জ্ঞান। বাহ্যবস্তু সন্নিকর্ষে মনের প্রসারণ জ্ঞানই আধার বা দিকের জ্ঞান। স্বরজ্ঞান সাধারণ এবং অসাধারণ ভেদে দ্বিবিধ। জীবের বাক্য জ্ঞানের নাম সাধারণ স্বরজ্ঞান এবং সঙ্গীতের উচ্চনীচ ভাবাপন্ন স্বরের জ্ঞানই অসাধারণ স্বর জ্ঞান। ভাষা জ্ঞানই স্বরের শেষ জ্ঞান।

৪। যে বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহারই নাম চিন্তন। এই বৃত্তি দুই ভাগে বিভক্ত—উপমিতি এবং ব্যাপ্তি।

প্রসিদ্ধ বস্তুর সাধর্ম্ম্যে সাধ্যসাধন রূপা বৃত্তিই উপমিতি। লিঙ্গের সহিত লিঙ্গীর সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যে সামানাধিকরণ্য জ্ঞান তাহাই ব্যাপ্তি; অর্থাৎ ব্যাপ্য পদার্থের মূলে ব্যাপকের অবস্থান এবং মূলে ব্যাপকের অনবস্থানে ব্যাপ্যেরও অনবস্থান অথবা কার্য্যকারণভাব হইতে, নিয়ামক স্বভাব হইতে এবং ভূয়োদর্শন হইতে যে স্বাভাবিক অবিনাভাবসম্বন্ধ নির্ণীত হয় সেই সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। অবিনাভাব শব্দের অর্থ,—অবিনা ভাব অর্থাৎ থাকিলে থাকা এবং ন বিনা ভাব অর্থাৎ না থাকিলে না থাকা। যে থাকিলে যে থাকে এবং যে না থাকিলে যে না থাকে তাহাদের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের নামই অবিনাভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি।

বুদ্ধির ভেদ সবিস্তারে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মানসিক অবস্থা ও তাহার গতির বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

মনের অবস্থা দুইটি,—প্রকৃতি ও বিকৃতি। বিশুদ্ধ সত্বগুণের বা অন্তরঙ্গা বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নাম প্রকৃতি এবং মিশ্র সত্ত্বগুণের (রজগুণোমিশ্র সত্ত্বের, বা বহিরঙ্গা ও তটস্থা বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নাম বিকৃতি। শুদ্ধ সত্ত্বের সন্নিকর্ষে শুদ্ধসত্ত্বের এবং মিশ্র সত্ত্বের সন্নিকর্ষে মিশ্র সত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। বাহ্যবস্তুর বা তৎপ্রতিকৃতির সন্নিকর্ষে মিশ্রসত্ত্ব-সন্নিকর্ষ এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা সত্যজ্ঞানানন্দ-সন্নিকর্ষই শুদ্ধসত্ত্ব সন্নিকর্ষ। শুদ্ধসত্ত্বের স্ফূর্ত্তিরূপ মনের প্রকৃত অবস্থা হইতে যে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে যথাক্রমে নিষ্কাম ইচ্ছা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলে। নিষ্কাম ইচ্ছা শব্দে আপাততঃ বৈয়র্থ্য ও অসম্ভাবনা অনুমিত হয় বটে কিন্তু উহা অসম্ভব বা নিরর্থক নহে। যে ইচ্ছা কেবল আত্মার উদ্দেশেই স্ফুরিত হয়—যে ইচ্ছার সহিত বাহ্য বস্তুর সংযোগ নাই; তাহাই নিষ্কাম ইচ্ছা। এই বিষয় তত্ত্ববিজ্ঞান ভাগে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। এক্ষণে মনোবিজ্ঞান ভাগের উপযোগী বিষয় অর্থাৎ মনের বিকারাবস্থাই প্রদর্শিত হইতেছে। মনের

বিকারাবস্থা ইচ্ছা ও বিবেক ভেদে দ্বিবিধ।

ইচ্ছা (Will) ও বিবেক। ইচ্ছা সুখ ও দুঃখের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সুখসংশ্লিষ্ট ইচ্ছার নাম লিপ্সা, দুঃখসংশ্লিষ্ট ইচ্ছার নাম জিহাসা। শিরঃপীড়া দুঃখসংশ্লিষ্ট ; কিন্তু ঐ শিরঃপীড়াকে ইচ্ছা বলে না। শিরঃপীড়াজনিত জ্ঞানের কারণ ইচ্ছা ; এবং তজ্জনিত বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ দুঃখ জ্ঞানের কারণ বিবেক। বিভাবনা শক্তির কার্য্য ইচ্ছা এবং উদ্ভাবনা শক্তির কার্য্য বিবেক। পীড়াদি হইতে বা অপর অবস্থা হইতে যাহা অনুভূত হয় তাহারই পূর্ব্বাবস্থা ইচ্ছা এবং পরাবস্থাই বিবেক। ইচ্ছা বিবেকের কারণ এবং বিবেক ইচ্ছার কার্য্য। পীড়াদি জনিত সুখ ও দুঃখ বিবেক শক্তি দ্বারা অনুভূত হইলে যে লাভেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা হয় তাহাকেই লিপ্সা ও জিহাসা কহে। শারীর কার্য্য মাত্রই ঐরূপ। প্রমাতার ইচ্ছাক্রমে বাহেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে বিবেক শক্তি দ্বারা অনুভূত সুখ ও দুঃখ হইতে উৎপন্ন লাভেচ্ছা ও ত্যাগেচ্ছা লিপ্সা ও জিহাসা নামে উক্ত হইয়া থাকে।

লিপ্সার ফল আনন্দ আসক্তি ও প্রবৃত্তি এবং জিহাসার ফল বিষাদ, বিরক্তি ও নিবৃত্তি। ঐ লিপ্সা-জিহাসাত্মিকা ইচ্ছার দুইটি অবস্থা। একটি কর্ত্রধীনা, অপরটি কর্ম্মাধীনা (Subjective and objective) কর্ত্রধীনা মনোবৃত্তির নাম কামনা এবং কর্ম্মাধীনা মনোবৃত্তির নাম বাসনা। পূর্ব্বোক্ত কর্তৃগতা কামনাই কার্য্যে পরিণতা হইয়া বাসনা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। সিদ্ধির সম্ভাবিত স্থলে উক্ত কামনা হইতে যে অবস্থা জন্মে তাহাকে আশা কহে এবং সিদ্ধির অসম্ভাবিত স্থলে যে অবস্থা হয় তাহারই নাম নিরাশা। পূর্ব্বোক্তা অজন্যা বুদ্ধি এবং পাশব বৃত্তি প্রভৃতি উহার বৃত্তিভেদ সকল ঐ বাসনারই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। এবং সম্পাদ্যা বুদ্ধি এবং প্রত্যক্ষাদি উহার বৃত্তিভেদ সকল উক্ত কামনারই বৃত্তিভেদ মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

[১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

শীতপ্রধান দেশে আবাস করাতে প্রাচীন আর্য্যজাতি শীঘ্রই বস্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করেন। তাঁহারা নানাপ্রকার পশুর রোম দ্বারা এক প্রকার বস্ত্র বয়ন করিতেন। মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট চর্ম্ম এবং বৃক্ষের বল্কল বস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাঁহারা সূচীনির্ম্মিত নানাপ্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা মৃত্তিকা দ্বারা নানাপ্রকার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া আহারীয় দ্রব্য পাক করিয়া আহার করিতেন ; আমমাংস ভক্ষণ করা এই প্রদেশেই রহিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বর্ণ দ্বারা নানাপ্রকার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিতেন ; স্বর্ণ এবং তাম্র প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইত, লৌহ কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার হইত। তাঁহারা এই প্রদেশে নানাপ্রকার ধাতুময় অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। তৎকালে আর্য্য-সমাজে সোমরস এবং একপ্রকার সুরা প্রচলিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন প্রাচীন কালে বর্ত্তমান কালের পচাই সুরার ন্যায় এক প্রকার সুরা আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। পশুমাংস, ধান্যাদি শস্য এবং দুগ্ধ প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রধান আহার্য্য বস্তু ছিল।

, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই প্রদেশে আর্য্যসমাজে একপ্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন প্রকার লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইয়োরোপীয় জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রত্যেকে বাস করা পর্য্যন্ত প্রাচীন আর্য্যসমাজে কোন প্রকার লিপিকার্য্য প্রচলিত ছিল না ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। ইয়োরোপীয় জাতিগণ হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই প্রদেশে এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ গাথা রচনা করিতেন বলিয়া তত্ত্ববিৎগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই স্থানে আর্য্যসমাজে একপ্রকার রাজনীতি প্রচলিত ছিল, বোধ হয় দলপতি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দলপতি একপ্রকার কর আদায় করিতেন কিন্তু কি প্রকারে কর ইত্যাদি আদায় হইত তাহা অনুমান করা যায় না।

এই প্রদেশে আর্য্যজাজির মধ্যে এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আমাদিগের দেশে যে সকল দেবতাগণ পূজিত হইয়া থাকেন ; ইহাঁরা পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। বৈদিক দেবতাগণ মধ্যে অনেক দেবতা প্রাচীন এথেন্স

এবং রোম নগরে পূজিত হইয়াছেন। অদ্যাপি প্রায় একরূপ শব্দে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকাস্থ নানাদেশে পরমাত্মা আহূত হইয়া থাকেন। পরে সিকদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ভারতীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ আবাস করার সময়ে তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের উপাসনা প্রচলিত ছিল। অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ অদ্যাপি পারসিক এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন।

'প্রাচীন আর্য্যজাতির' বাসস্থানের পূর্ব্বদিকে তুরাণীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ আবাস করিতেন। তৎকালে আর্য্য জাতির সে প্রদেশে প্রবেশ করা সুকঠিন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা মৃগয়াবলম্বী ছিলেন তাঁহাদের বিস্তৃত স্থানের আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা প্রত্নৌকের পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ ইয়োরোপখণ্ডে গমন করেন। ইহার পর পশুপালক এবং কৃষিজীবিগণ কোন কারণ বশতঃ প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমদিকে কোনস্থানে আবাস স্থাপন করেন। পশুপালকদিগের সহিত কৃষিজীবিগণের বহুকাল একত্র অবস্থান করা সুকঠিন; পশুপালক মাংসাশী কৃষিজীবিগণ মল মূত্র ভক্ষণ শীল; পশুপালকগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে বলিদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন; কৃষিজীবিগণ নানাপ্রকার ফলোপহার দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদন করেন। পশুপালকগণ পশুচারণ করিতে এক স্থানে হইতে স্থানান্তরে গমনশীল; কৃষিজীবিগণ একস্থানে অবস্থানে করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনে তৎপর; পশুপালকদিগের দেবগণ যোদ্ধা এবং পরাক্রান্ত; কৃষিজীবিদিগের দেবগণ স্থির ধীর এবং শান্ত। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ অনুমান করেন যে এই সমস্ত কারণে এই দুই দলে কলহ উপস্থিত হওয়ায় কৃষিজীবিগণ এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। পশুপালকগণ পশ্চাৎ পারস্য দেশে গমন করিয়া তথায় আবাস স্থাপন করেন।

ভারতবর্ষেয় প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হয়। হিন্দুদিগের দেবগণ সুর বলিয়া কথিত; তাঁহারা সর্ব্বদা অসুরদিগের ভয়ে ভীত; সুরগণ অনেক সময়ে অসুরগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। অসুরগণ সর্ব্বদা সুরদ্বেষী, হিংসা প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। অসুরগণ এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হওয়া সত্বেও তাহারা আর্য্য জাতির আরাধ্য; আমরা বর্ত্তমান সময়ে যাহাদিগকে সুর বলিয়া গ্রহণ করি প্রাচীনকালে তন্মধ্যে কেহ কেহ কখন অসুর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলর বলেন যে ঋগ্‌বেদে কোন কোন স্থলে (৮) ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ অসুর বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(৮) সমষ্টিতে ২৬ স্থলে

অসুর শব্দ আবস্তি ভাষায় অহুর এবং সুর শব্দ হুর রূপ ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার 'ম' স্থানে আবস্তি ভাষায় 'হ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিন্ধু শব্দ হইতে আবস্তি ভাষায় হিন্দু শব্দের উৎভব এবং তাহাই পশ্চাৎ সংস্কৃত ভাষায়ও কুত্রাপি ব্যবহৃত হইয়াছে। পারসিকদিগের দেবগণ অসুর বলিয়া কথিত; দেবদ্বেষিগণ হুর এরং আমাদের অসুরগণের ন্যায় নানাপ্রকার দোষে রঞ্জিত বলিয়া বর্ণিত। ফলতঃ আমরা অসুরদিগকে যেরূপ বর্ণনা করি পারসিকগণ হুরদিগকে তদ্রূপ বর্ণনা করেন। অসুর এবং সুরগণ উভয় দল পূর্ব্বে হিন্দু এবং পারসিকগণের আরাধ্য ছিল; উভয় দলে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পরে কৃষিজীবিগণ সুরদিগকে আরাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং পশুপালকগণ অসুরদিগকে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নি এবং সূর্য্যদেব উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্য রহিল। এইরূপ দুই দলে বহুকাল পর্য্যন্ত কলহ হওয়ায় কৃষিজীবিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে উপনীত হন তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। জলপ্লাবন সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেন। জল প্লাবনের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে তাহারা এই দেশে উপস্থিত হন এতৎব্যতীত এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহারা অনুর্ব্বর পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুবেষ্টিত সপ্ত সিন্ধুর উর্ব্বরতা শক্তি দেখিয়া একদা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে তাঁহারা সিন্ধুনদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতের অনার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল। অনার্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বিলক্ষণ পরাক্রমশালী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে বর্ণিত আছে যে সম্বর নামে জনৈক অসুর তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুলিতর। তিনি একোনশত নগরের অধিপতি ছিলেন। এই সকল নগরে তিনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। আর্য্যগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হওয়াতে আর্য্যগণ অতিকষ্টে পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে ভীষণ যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করেন। বল নামক অন্য এক পরাক্রম অসুর আর্য্যজাতির গোধন হরণ করেন। তাঁহারা একদা বলকে পর্ব্বতের গুহায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বধ করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। (৯) শুষ্ক নামক জনৈক অনার্য্যপতি সর্ব্বদা আর্য্যজাতির প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন। আর্য্যজাতি তাহাকে প্রকাশ্য সমরে বধ করিতে না পারিয়া কৌশল করিয়া

(৯) ঋগ্‌বেদে ১।১১।৫

হত্যা করেন। (১০) ঋগ্‌বেদে বৃত্রাসুর নামক এক জন প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ভারতের আদিম নিবাসী কি দেশান্তর হইতে আর্য্যদিগকে আক্রমণ করেন তাহা নিরূপণ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইনি আর্য্যজাতি, ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করেন। তিনি পশ্চাৎ আর্য্যদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতি অনেক সময়ে অসভ্য আদিম নিবাসিগণের আবাসস্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিতেন। অগ্নি দ্বারা অনার্য্যদিগের অধিকৃত অরণ্য ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিত। আর্য্যগণ এইরূপে নানা প্রদেশ অধিকার করেন। যুদ্ধ করার প্রয়োজন হইলে আর্য্যজাতি স্ব স্ব শরীর বর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়া অতীব সাহস সহকারেও অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা যুদ্ধে লৌহ নির্ম্মিত ক্ষেপনশীল নানাপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

বৈদিক সময়েই আর্য্যজাতি সপ্তসিন্ধু হইতে ক্রমে ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের নানা-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে অশ্বপালন করিতেন। যুদ্ধে অশ্বরোহী সৈন্য নিযুক্ত হইত কিন্তু বৈদিককালে কোন হস্ত্যারোহী সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় তাঁহারা তৎকালে হস্তীকে যুদ্ধশিক্ষা দিতে কৃতকার্য্য হন নাই। গো মেষ মহিষ প্রভৃতি নানাপ্রকার পশু পালন করিতেন। গো-ধন তাঁহাদের প্রধান ধন ছিল। গো দ্বারা তাঁহাদের নানাকার্য্য সম্পাদিত হইত। গো দ্বারা তাঁহারা হল চালনা করিতেন; গো দুগ্ধ এবং গো মাংস তাঁহাদের উপাদেয় খাদ্য ছিল। তৎকালে গোচর্ম্ম অপবিত্র ছিল না; গোচর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রদত্ত নানাপ্রকার আহার্য্য বস্তু গোচর্ম্মোপরি রক্ষিত হইত।

বৈদিক সময়ে আর্য্য নারীগণের অবস্থা উন্নত ছিল। এক্ষণে যেমত হিন্দু সমাজে নারীগণের অবস্থা নিতান্ত হেয়; তাঁহারা সামাজিক কোন কার্য্যে যোগ প্রদান করিতে পারেন না প্রাচীনকালে তাঁহারা এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিলেন না। তৎকালে বিবাহ প্রথা আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল; দম্পতী এক হইয়া দেবগণের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন; দম্পতী গৃহের কর্ত্তা কর্ত্রী ছিলেন। কোন কোন নারী বিবাহ বন্ধনে গ্রথিত না হইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে কর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা উপযুক্ত মতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্‌বেদের কিয়দংশ তৎকালিক আর্য্য মহিলাগণ কর্ত্তৃক রচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নারীগণ মধ্যে

(১০) ঋগ্‌বেদে ১১১৬

যাহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন তাহারা প্রাচীনকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন।

আর্য্যনারীগণ প্রাচীন কালাবধি অলঙ্কার প্রিয়, তাহারা নানাপ্রকার পুষ্পের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করিতেন এবং সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট ধাতুময় অলঙ্কারও ব্যবহার করিতেন।

আর্য্যসমাজে প্রাচীনকালে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় আজীবন বিরহ যন্ত্রণায় সন্তাপিতাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেন না। ব্রাহ্মণেরা অনেক সময়ে রাজন্য এবং বৈশ্য বিধবাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিতেন। প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে সহমরণ প্রচলিত ছিল না; এ নিষ্ঠুর নিয়ম তৎকালে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎকালে সুচতুর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মবিগর্হিত কুৎসিত প্রথা এই দেশে প্রচলিত হইয়া আর্য্যসমাজ কলুষিত করিয়াছে।(১১)

(১১) সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভটাচার্য্য ঋগ্‌বেদের যে ঋক্‌টি অবলম্বন করিয়া সহমরণ বেদসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন সে পাঠ প্রকৃত পাঠ নহে। বাস্তবিক তিনি পাঠের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। ঐ ঋক্‌টি দ্বারা বরং সহমরণ প্রচলন না থাকা প্রমাণ হয়।

ইমা নারী রবিধবা সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংস্পৃশন্তাম্।

অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ইহার শেষ ভাগ 'জলযোনিমগ্নে' এই পাঠ ধরিয়াছেন। বাস্তবিক এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মকারগণ লৌহ এবং স্বর্ণ দ্বারা নানাপ্রকার কারুকার্য্য সম্পাদন করিত। সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রেণীর সূত্রপাত এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিগণের সংখ্যা অল্প ছিল। সাধারণতঃ তৎকালে আর্য্যজাতি বৈদিক সময়ে কৃষিকার্য্য দ্বারা যবব্রীহি ইত্যাদি নানাপ্রকার শস্য অর্জন করিতেন। উদ্ভিজ্জ ব্যতীত তাঁহারা নানাপ্রকার মাংস ভক্ষণ করিতেন, তন্মধ্যে গোমাংস উপাদেয় খাদ্য ছিল। আর্য্যগণ উদূখলে মুষল দ্বারা সোমলতা পেষণ করিয়া সোমরস দেবতাদিগকে প্রদান করিতেন এবং তাহা প্রচুর পরিমাণে পান করিতেন। আর্য্যগণ নিতান্ত সোমরস প্রিয় ছিলেন। সোমলতা হিমালয় প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

এই সময়ে আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা করিতেন। ইদানীন্তন কালে যে সমস্ত অসংখ্য দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের আরাধ্য, বেদে ইহাদের অনেকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণগণ দেবগণের প্রীতিসাধনার্থ নানাপ্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। ঋগ্‌বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; শতপথ ব্রাহ্মণে রাজসূয় যজ্ঞের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোমেধ যজ্ঞও

বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল। পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বতী সরস্বতী নদীর তীরস্থ প্রদেশ বৈদিক যজ্ঞাদির বিহিত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালে আর্য্যজাতির মধ্যে নানাপ্রকার দেব-গণের উপাসনা প্রচলিত থাকিলেও বৈদিক সময় হইতে তাঁহারা পরমাত্মার বিবরণ অবগত ছিলেন। বৈদিক দেব-গণ ঐশ্বরিক শক্তিতে বিভূষিত; কোন দেব কাহার অধীন নহেন। বেদে পৌত্তলিক উপাসনার দৃষ্টান্ত হয় না। বোধ হয় তৎকালে পৌত্তলিক উপাসনা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দেবতা-দিগের উদ্দেশে সোমরস, দুগ্ধ এবং শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিতেন।

বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল না। নানাজাতীয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম-ণের কার্য্য সম্পাদন করিতেন; কার্য্যতা দ্বারা ভেদ ব্যতীত, জন্ম দ্বারা কোন প্রকার জাতিভেদ থাকা অনুমান হয় না। তৎকালে যাহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা-রাই ব্রাহ্মণ; যাহারা যুদ্ধ ব্যবসা অব-লম্বন করিয়াছেন তাহারাই ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এক স্থান ব্যতীত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দশম মণ্ডল অপেকাকৃত আধুনিক এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ এই স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতি অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করেন। এই সময়ে সমুদ্রযানারোহণ করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন। ঋগ্বেদের এক স্থানে লিখিত আছে তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ তৎ-পুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্র মগ্ন হইয়া যায় এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া উপ-কূলে নীত হন্ (১২)। ইহা দ্বারা আর্য্য-জাতি রণপোত প্রস্তুত করিতে পারি-তেন অনুমান করা যাইতে পারে। যাহারা বিবেচনা করেন যে ফিনিসিয়া বাসিগণ প্রথমত সমুদ্র যান নির্ম্মাণ করেন তাহারা নিতান্ত ভ্রমান্ধ, ঋগ্-বেদে ফিনিসিয়ার নাম পর্য্যন্ত শ্রুত হওয়া যায় না।

এই সময়ে আর্য্য সমাজে এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে হিরণ্য পিণ্ড নামক মুদ্রায় উল্লেখ আছে; এই হিরণ্য পিণ্ড কিরূপ আকার বিশিষ্ট; ইহাতে কোন চিহ্ন মুদ্রিত ছিল কি না তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পশ্চাৎবর্ত্তী গ্রন্থে হিরণ্য পিণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; তৎপরিবর্ত্তে সুবর্ণ নিষ্ক প্রভৃতি নানাপ্রকার মুদ্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময় হইতে আর্য্যসমাজে নানা-প্রকার শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়।

(১২) প্রথম অষ্টক ১৭শ অনুবাক

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতি মলমাস তত্ত্ব অবগত ছিলেন (১৩)। ঋগবেদে উল্লি-খিত আছে যে অত্রিগোত্রীয় ঋষিগণ প্রথমতঃ সূর্য্যগ্রহণ গণনার মূল আবিষ্কার করেন (১৪)। এতাদৃশ প্রাচীন কালে মলমাস তত্ত্বের বিবরণ অবগত থাকা নিতান্ত বিস্ময়জনক। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে যখন জগতের অন্যান্য জাতি অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তৎকালে যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শাস্ত্রের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হয় নাই তাহার পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতি নানাপ্রকার শাস্ত্রে মস্তিষ্ক বিলো-ড়িত করিয়া অপেক্ষাকৃত সভ্যাবস্থায় উন্নত হন্।

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতিগণ দৈবসিক কার্য্য সমাধা করিয়া অবসর মতে সময় সময় ঋগ্বেদ রচনা করেন। ইহা জগ-তের সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রাচীন; ইহা হইতে আর্য্যজাতির তদানীন্তন সামা-জিক অবস্থার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। মানব জাতির প্রাচীন তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ঋগ্বেদ অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

ক্রমশঃ

শ্রী——

(১৩) প্রঃ অষ্টক ২ অধ্যায়

(১৪) চতুর্থ অষ্টক ২ অধ্যায়

পজিটিভিজম ও পারত্রিক ধর্ম্ম।

ঈশ্বর পরকাল বিরহিত হইয়াও কম্-টের কার্য্যময় জীবন আমাদের পক্ষে এক আদর্শ জীবন। পরহিতাচারী পরের ব্যথার ব্যথী কম্ট যাহা বুঝিতেন কার্য্যত তাহা করিতেন। তাঁহার জীবন কেবল ঔপন্যাসিক ভাবময় ছিল না, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যখন যে ভাব নি-হিত হইত, তাহা কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া ফল প্রসব না করিয়া দুই দিনের জন্য লোকরঞ্জন ছায়াক্রীড়ায় সাঙ্গ হইত না। কম্ট ঈশ্বরের নাম করেন নাই, পরকালের ভয় করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাঁহার কার্য্য দেখ, তাঁহার নববিধান দেখ, তাহাতে শিষ্টা-চার বিরুদ্ধ যদি কিছু দেখিতে পাও তাহা হইলে কম্টের কথা শুনিও না। কম্টের নববিধানে ছিদ্র থাকিতে পারে, কম্টের ধর্ম্মাদর্শ সম্পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু কম্টের ধর্ম্মে পরপীড়ন আছে

কি? কম্‌টের উদ্দেশ্য মহৎ কি না তাহা ভাল করিয়া দেখ। আজি কালিকার দিনে কম্‌টকে আচার্য্য স্থানীয় করিতে পারিলে কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের সম্ভাবনা ত দেখি না। কম্‌টের যে যে অংশ সচ্ছিদ্র তাহা সাবধানে গ্রহণ করিলেই চলিবে। অত বড় এক জন দার্শনিক ২৪ বৎসর ধরিয়া বহু পাঠে বহু আয়াসে যে রত্ন সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন এক কথায় তাহা কিছু নয় বলা ভাল নয়।

সম্প্রতি কৃষ্ণকমল বাবু ভারতীতে পজিটিবিজম কাহাকে বলে? শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যে অল্পাংশ লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া কম্‌টের ধর্ম্মের একটা সমালোচনা সম্ভবে না। কৃষ্ণকমল বাবু নিজেই বলিয়াছেন,—কম্‌টের ৩০০০ পৃষ্ঠা পূর্ণ দশখণ্ড গ্রন্থের ভাব দুটি প্রবন্ধে দেখান, আর মুখ গহ্বরের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখান দুই এক। ইহাতে কি বুঝা যায় না, কম্‌টের নব বিধানের আদর্শের কিছুই ভারতীতে প্রকাশিত হয় নাই? কম্‌ট যাহা বলিবেন তাহাই যে শীর্ষস্থানীয়, এমন কথা আমরা বলি না। কম্‌ট বা দ্বিজেন্দ্র বাবু কেহই ভূমিষ্ঠ হইয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান গলাধঃকরণ করেন নাই। কম্‌ট আপন ক্ষমতা বলেই কম্‌ট, দ্বিজেন্দ্র বাবু আপন ক্ষমতা বলেই দ্বিজেন্দ্র বাবু। ক্ষমতা দেখিয়া আমরা ক্ষমতাবানের সন্ধান লইব, ক্ষমতাবান যখন যাহা বলিবেন তাহাই ভাল এটি বুঝা সঙ্গত নয়। ঘাত প্রতিঘাত দলাদলি বড় ভাল জিনিস, ঘাত প্রতিঘাত দলাদলি চিরকাল থাকুক। যে দিন মানবসমাজে অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনা থাকিবে না, এক মহাত্মা যাহা বলিবেন সকলে অবনত মস্তকে তাহাই পালন করিবেন সে দিন উন্নতির আশা ভাসিয়া যাইবে, দারুণ আধোগতি ঘটিবে, উহার সহিত পশুত্বের প্রভেদ থাকিবে না। মনুষ্যের মনুষ্যত্বই নব নব বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার অনুরাগ। যে দিন এ স্পৃহা মিটিয়া যাইবে, সে দিন মনুষ্য-সমাজে ঘোর জড়ত্ব উপস্থিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন,—জগতের মূল সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বর বাদ দিলে ধর্ম্ম থাকে না। জগতের মূল সত্য যাহাই হউক না তাহা আমাদের বড়ই পূজনীয়। সৌর জগতের, জড় জগতের শৃঙ্খলা কি জগতের মূল সত্য, না জ্ঞান মূল সত্য? মূল সত্য কথাটায় বড় ভজকট আসিয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস, যখন এতকাল ধরিয়া আমাদের হৃদয় তৃষিত চাতকের ন্যায় জগতের মূল সত্যের পানে চাহিয়া রহিয়াছে এবং যুগ যুগান্ত হইতে কিছু কিছু করিয়া তাহাকে আপন আয়ত্তীভূত করিয়া আসিতেছে তখন মূল সত্যকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করা পণ্ডশ্রম। দ্বিজেন্দ্র বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন,—ইহারই নাম গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া। আমাদের হৃদয় কোন কারণে যদি কোন বিষয়ের দিকে

ধাবিত হয় তাহা হইলে কি বুঝিব আর ভাবনা নাই, হৃদয় যাহা খুঁজিতেছে তাহা আজি হউক কালি হউক পাইবই পাইব? আমরা আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ পাইতে বড় ভাল বাসি, যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া আমরা প্রদীপের একটা প্রকাণ্ড উপাসনা জুড়ি, তাহা হইলে আমরা কি আশ্চর্য্য প্রদীপ পাইবই পাইব? ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে না প্রদীপের গল্প হইতে হৃদয়ের অনুরাগের উৎপত্তি? ঈশ্বর খাড়া করিয়াছি বলিয়া কি, হৃদয় ঐ কারণে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয় না? হৃদয়ের অনুরাগ মূল সত্যের অস্তিত্বের বলবৎ প্রমাণ নহে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর তুল্য এক জন প্রধান শ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষীও মাথার দিব্য দিয়া বুঝাইতে চাহেন, মূল সত্যে বিশ্বাস কর, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ধরিয়া লও। যে দিকে আমাদের হৃদয় ধাবিত হয় সে দিকে যে সত্যের আকর আছে তাহা কে বলিল? অধিক লোকের মনে যাহা জাগরূক তাহা অকাট্য প্রমাণ নহে, তাহা জলন্ত সত্য নহে। হৃদয় সত্যের আকর্ষণে কুত্রাপি ধাবিত হয় না, সংস্কারের গুণেই হৃদয় আবহমান কাল ধাবিত হইয়া আসিতেছে; তবে প্রভেদ এই,—খুঁজিতে খুঁজিতে কখন কখন সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। একটা কথা বলিয়া উপমাটা বিশদ করিতেছি। মনে করুন, বঙ্গ মহিলাদের নিকটে আমি যদি বলি,—তারকেশ্বরের তারকনাথ কি স্মিথ সাহেব না কেলি সাহেব, যে তিনি রোগীকে ঔষধ বলিয়া দেন? প্রস্তরের কথা কহিবার প্রমাণ নাই, তারকেশ্বরের তারকনাথ খণ্ড প্রস্তর মাত্র, তাঁহার কিছুই ক্ষমতা নাই। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় দার্শনিকের ভাষায় ন্যায়ের জোরে বঙ্গ মহিলার নিকটে এ গুলি যদি আমি বলি, বলিবার পরে ব্যাখ্যার বিনিময়ে উপদেশের পুরস্কার স্বরূপ অধঃপাতে যাও মুখে কুট হবে ইত্যভিধেয় নানা-মিষ্ট বাক্যে অভিহিত হইয়া শেষে একটা মস্ত গাধা বলিয়া বিবেচিত হইব না কি? মূর্খ সম্প্রদায়ের ঈশ্বরে দেব দেবীতে অচলা ভক্তি ত অনেকেই দেখিতে পান। এ প্রত্যক্ষ ঘটনা নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াও কি দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিবেন, তাহাদের ভক্তি হৃদ্গত নহে? বোধ হয়, তাঁহার ন্যায় এক জন ভূয়োদর্শী ফস করিয়া এ কথাটা বলিয়া ফেলিবেন না। বঙ্গ মহিলাদের হৃদয় যে দিকে আকর্ষিত হয়, সে দিকে আমাদের হৃদয়কেও কি চালাইতে হইবে? দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি বলেন, ওটা শিক্ষার দোষ, তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি, ঈশ্বর পরকাল বিশ্বাসও শিক্ষার দোষ, ঈশ্বর বিশ্বাস সেই দায়িত্ব জ্ঞান। পর জীবনে ভয় ভালবাসা সব আসিয়াছে। যার ঈশ্বর বিশ্বাস নাই, তার পরকাল চিন্তা দায়িত্ব ভাব উপলব্ধ হইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর বড় নজির হাবার্ট স্পেন্সর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—জগতের

মূলে এক সত্য 'বিদ্যমান'। হার্বার্ট স্পেন্সর যাহাকে অজ্ঞেয় শক্তি বলেন তাহার সমালোচনা নিষ্ফল। ওটা কেবল কথার কৌশল, যাহা অজ্ঞেয় তাহা সবই অজ্ঞেয় তাহার কিছুই বুঝি না। যাহা বুঝি, তাহার সব না হউক কতক বুঝি। যাহা কতক বুঝি, তাহার কতক আদর্শও দিতে পারি, যাহার কোন আদর্শ দিতে পারি না, তাহা বুঝিও বটে, না বুঝিও বটে বলিয়া গোলমেলে কথায় সারিতে পারি না। ক অজ্ঞেয় বলিলে 'ককে' না বুঝিলে কেমন করিয়া বিশেষ লক্ষণ দিয়া বলিব 'ক' অজ্ঞেয়? আরো একটা কোন বিষয় অজ্ঞাত বলা ভাল, অজ্ঞেয় বলিয়া একেবারে সাফ সিদ্ধান্ত করা ভাল নয়। তবেই দেখা যাইতেছে, শক্তির যখন কিছুই ধারণা হয়নি তখন শক্তি সম্বন্ধে কোন দিকে এখন ঠিক জবাব দিতে পারি না। হার্বার্ট স্পেন্সরের অজ্ঞেয় শক্তি একটা প্রামাণিক যুক্তি নহে। অসত্যের সহস্রবার জয় দেখিয়াও দ্বিজেন্দ্র বাবু (এখানে সত্য অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে) আশা করিয়াছেন কালে সত্যের জয় হইবেই হইবে। যে দিন সত্যের জয় হইবে সে দিন সত্যের পূজা করিব। কালে সত্যের জয় হইতে পারে, না ও হইতে পারে। জ্ঞান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জগতের মূলে জগৎ পরিচালনার সহিত উহার কি নিয়ন্তৃত্ব আছে তাহা বুদ্ধির দোষে আমরা অদ্যাপি বুঝিতে পারি নাই। একটা রোগের প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে তাহা লোকে পূজাও করিবে, ব্যবহারও করিবে। এক জন কবির কবিতা ভাল হইলে তাহা পড়িয়া লোকে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে ও তাঁহাকে বরমাল্যও দিবে, এরই নাম কি সত্য?। এই জ্ঞান গুণের পূজায় কে কবে খড়্গ হস্ত? ইহাত প্রামাণিক বাদ বলে। প্রামাণিক বাদ বরং ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। দ্বিজেন্দ্র বাবু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বড়ই ব্যস্ত, আমাদের বোধ হয়, তাঁহার অপেক্ষা কম্‌ট কম ব্যস্ত ছিলেন না। আধ্যাত্মিক বলিলে আত্মন্ সম্বন্ধীয়ই বুঝায়, আত্মন্ বলিলে আপনই বুঝি। আত্মবাদ কে অস্বীকার করে? আত্মবাদ স্বীকৃত হইলে আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত হয় না। মৃত্যু পর্য্যন্ত আত্মার স্থায়িত্ব অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের স্থিতি অস্বীকার করিবার কারণ নাই। যিনি ইহার বিপক্ষে বলিবেন, তিনি এ পক্ষ খণ্ডন করিয়া সে পক্ষের বিশেষ প্রমাণ দিবেন, নচেৎ তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। ইহা ছাড়া অধিক কিছুত সহজ বুদ্ধিতে যোগায় না। কম্‌ট পাকত কেন স্পষ্টইত বলিয়াছেন, —উন্নতি আমাদের উদ্দেশ্য। পজিটিভিজম বলে, আপনার স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া অপরের স্বার্থ একেবারে ভুলিও না। দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহা ছাড়া অধিক কিছু বলিয়াছেন কি? হইতে

পারে, কম্‌টের ধর্ম্ম আপামর সকলের উপযোগী নহে, হইতে পারে অধিকারী ভেদে, জ্ঞানী অজ্ঞানী ভেদে কম্‌টের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি জগতে এমন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে যাহা আপামর সকলেরই কল্যাণকর, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে কম্‌টের পজিটিভিজমকে কেহ ধর্ম্ম সিংহাসনে বসাইতে কল্পনাও করিবেন না। ঈশ্বরের দৌলতে পরকালের ভয়ে কত দুর্বৃত্ত শাসিত আছে, তাহা না দেখিয়া পজিটিভিজমের বিপক্ষে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা উচিত নহে। সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে রাজ শাসনের প্রভাবে অধিকাংশ লোক দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হয়, কেহ কেহ দুর্বৃত্তদের অবমাননা লাঞ্ছনা নিগ্রহ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হয়, কেহ কেহ অবস্থাগত কোমল প্রকৃতি অনুসারে পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু হতচৈতন্য হইয়া লোকে যখন এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় (যেমন কাম, ক্রোধ, ক্ষুধা, লোভ প্রভৃতি) তখন তাহা ভাল কি মন্দ বিচার্য্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইবার সময় থাকে না। সময় গুণে তাহা ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। এক প্রবৃত্তি সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে যদি দোষ হয় তাহা হইলে ঈশ্বরমুখী বৃত্তি সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে মত্ততার ফলে নানাবিধ অমঙ্গল (যাহা সচরাচর হইয়া থাকে) ঘটিতে পারে। যদি বিচার করিয়া ভাল মন্দ করিতে হয়, তাহা হইলে মূসার বিধি বেদবাক্য অথবা কোরাণ আদেশ ভাবিয়া যা তাই পালন করিবার আবশ্যকতা থাকে না। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন সহানুভূতি প্রবৃত্তি প্রবল হইলে পাত্রাপাত্রের অনপেক্ষায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। একথার উত্তরে কম্‌টের হইয়া কেহ বলিতে পারেন না কি, ধর্ম্মবুদ্ধি কথাটায় এমন কি গুণ আছে, সহানুভূতিকে ছাঁটিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিকে পুস্তকে পত্রিকায় বসাইলে সর্ব্বকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে নিরাপদে সমাহিত হইয়া যাইবে? যদি উভয়ই সমান হয় তাহা হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধিকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায় না, প্রমাণ না দিয়া কেবল পরকাল ও ঈশ্বর খাড়া করিয়া আপাততঃ ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের (যা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম) একীকরণ করিয়া লাভ কি? সহিতে হয় কাঁদিতে হয় সত্যের জন্য সহিব সত্যের জন্য কাঁদিব।

কম্‌টের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান বিস্তার। জ্ঞান বিস্তৃত না হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। সামাজিক বন্ধন সমাজিক কল্যাণ জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিতেছে। জ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে যদি পরকালে মতি যায় তাহা হইলে সকল জ্ঞানীই পরকাল মানুক, কিন্তু তা যতক্ষণ না হয় প্রাচীন মত বলিয়া ও ভাবের মর্য্যাদা করিব কেন? পরকালজনিত সমাজের ইষ্টানিষ্টের তুলনা করিতে চাহি না, পরকালের প্রমাণ পাইলেই মানিতে প্রস্তুত আছি। জননী শিশুকে শাসন করিতে

গিয়া, বাধ্য করিতে গিয়া অতি শৈশব-কালে পদে পদে জুজুর ভয় দেখাইয়া যে এক মহাভ্রান্তি শিশুর হৃদয়ে শিরায় শিরায় গাঁথিয়াছেন তাহা আর ইহ জীবনে সহজে দূরীভূত হয় না। জননী যদি দুঘা মারিয়া দোরস্ত করিতেন, তাহা হইলে তত আইসে যাইত না, অন্ধকার রাত্রে বাঙ্গালি বাবুদের স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া উঠিতে হইত না। অধিক কি বলিব, অনেকের জুজুর ভয়ে চোর ধরিতে অনেক সময় বল জোগায় না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন,—"যদি জগতেরই অনন্তকাল উন্নতি চলিতে পারে তবে, কি জগতের ব্যথার ব্যথী সুখের সুখী মনুষ্য দুই চারি দিন পৃথিবীতে মহারব লম্ফ ঝম্ফ আস্ফালন করিয়া কিয়ৎ-কাল পরেই জন্মের মত সাড়া শব্দ বিস-র্জ্জন দিয়া অগাধ মহাশূন্যে পরিণত হইবে। তাহা যদি হয় তবে জগতের মূলস্থিত ন্যায়ের গাত্র চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। জগতের মূলেতেই এই-রূপ ন্যায়ের বিপর্য্যয় দশা! ইহা যদি এক বার মনেতেও ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিতে আমাদের হস্তপদ একেবারেই অসাড় হইয়া পড়ে। মূল সত্য যদি সত্য সত্যই লক্ষ্যবিহীন—উদ্দেশ্য বিহীন হ'ন কিম্বা মূলে সত্যের উদ্দেশ্য সত্য সত্যই আত্মার বিনাশ ও জগতের অমঙ্গল হয় তবে কখনই আমরা মঙ্গল কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত,—তাহা হইলে মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমা-দের পক্ষে ঘোরতর বিড়ম্বনা।" আমরা আমাদের শোচনীয় পরিণাম, আমিত্বের পরিণাম ভাবিতে ব্যথা পাই সত্য, চারি দিক অন্ধকার দেখি সত্য, কিন্তু তা বলিয়া উপায় কি? সঙ্কটাপন্ন পীড়া-কালে আমরা অমৃতময় স্বাস্থ্যের উপা-সনা করি, দরিদ্রতানলে পুড়িতে পুড়িতে রাজপদের কামনা করি, শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইতে অরিন্দম হইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু হয় কি? এ জগতে আমাদের কয়টা বাসনা পূরণ হইয়াছে, কয়বার অশ্রুধার মুছিয়াছে? দুই দিনের জন্য আসিয়াছি বলিয়া কি আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইব? দুই দিনের জন্য আসিয়াছি জানিয়া শুনিয়া পরো-পকারে আত্মোৎসর্গ করাই মনুষ্যত্ব,—ইহারই নাম ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম, ইহাকেই বলে নিষ্কাম ধর্ম্ম। যেখানে ধাক্কার ভয় মোণ্ডার লোভ সেখানে ধর্ম্মের মূল্য কি? সেখানেত অধিকাংশ নিবৃত্তিমুখী সাধনা, প্রবৃত্তিমুখী সাধনা ক্বচিৎ আসে, যাহা আসে তাহা আবার ঘোরতর স্বার্থ পরতার গাঢ় শ্যামবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আসে। এ নিমিত্ত যদি জগৎ পদ্ধতিকে অসম্পূর্ণ বলিতে হয় তাহা বলিব। তাহা না বলিয়া আমরা অমর কল্পনা করিলে লাভ কি? এখানে মূল সত্য প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান যাহা তাহাই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির আচার দেখিয়া আমরা নিষ্ঠু-রতা দয়া উভয়ের জলন্ত অস্তিত্বের কি

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইনা? ব্যাঘ্র প্রকৃতি কখন কি বৌদ্ধ প্রকৃতির সদৃশ হইতে পারে? তাহার কি জ্ঞানের পথে অগ্র-সর হইবার পন্থা আছে? এই যে চক্ষের সাম্‌নে জলপ্লাবন, বজ্রাঘাত, ঝটিকা, ভূমিকম্পে সহস্র সহস্র নরনারী হা হা করিতে করিতে কাতরে এ ওর কোলে চির দিনের জন্য ঢলিয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়াও কি বলিব না প্রকৃতি নিষ্ঠুরা? যে ইহাতে প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরা বলিতে চাহে না, সে প্রকৃতির অন্ধ সেবক। প্রকৃতির মূলে যদি আদৌ অন্যায় না থাকিত তাহা হইলে ধরিয়া লইতাম, আমাদের বিনাশ সাধন প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহার সহস্র অন্যায় দেখিতেছি, তাহার এ অন্যায় বিচিত্র নহে। এ জগতে একজন জন্মান্ধ জন্মরুগ্ন জন্ম কাঙ্গাল এক জন জন্মকমললোচন জন্ম সুস্থ, জন্মদীন কেন? ছোটকে পীড়ন না করিয়া ক্ষুদ্রের বুকের উপর মহৎকে না হাঁটাইলে যাহার সুখ হয় না, তাহার মূলে যদি ন্যায় বিপর্য্যয় না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ন্যায় বিপর্য্যয় কথাটা চলিত হওয়াতেই ন্যায় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

পিপীলিকা সমাজের মধুমক্ষিকা সমা-জের একতা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু ঠাও-রাইয়াছেন, যে, আমরা পিপীলিকার মধুমক্ষিকার দশা পাইলে ঢের উন্নতি লাভ করিব। একতা কি উন্নতির অঙ্গ নহে? পিপীলিকা মধুমক্ষিকা সমাজে যাহা আছে জ্ঞানী মানুষের তাহা নাই। এমন অনেক বিষয়ের প্রমাণ আছে ইতর জন্তুর মধ্যে যাহা বিদ্যমান শ্রেষ্ঠ জন্তুমধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। পিপী-লিকার মধুমক্ষিকার যদি আত্ম-রক্ষণী শক্তি, ভাবী অমঙ্গল নিবারণ উপায়, শত্রু-দমন কৌশল, ভাষা জ্ঞান, পরার্থ পরতা পদার্থ নিচয়ের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে পিপীলিকা মধুমক্ষিকাদের সহিত আমাদের কিছুই পার্থক্য থাকিত না, তাহা নাই বলিয়া তাহারা পিপীলিকা মধুমক্ষিকা, আমরা মনুষ্য। কিন্তু যার জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবু পিপীলিকা মধুমক্ষি-কার দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন তাহা তাহা-দেরও যেমন আছে আমাদেরও তেমন আছে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু এক স্থলে বৃত্তি জ্ঞানের পার্থক্য ঘটাইয়া রাজা উজিরের উপমা ধরিয়া ইংলণ্ডের রাজাকে রাজশক্তির দুটো কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। বৃত্তি কথাটায় আজকাল বড় গোল বাধি-য়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু কি বলিতে চাহেন, এক একটি বৃত্তি এক একটি শিরা? বৃত্তিও যা, জ্ঞানও তা, জ্ঞানও যা বিষয় বস্তু সংসর্গভাব ইচ্ছাও তা ইহা ছাড়া বৃত্তি শব্দে আমরা অধিক কিছু ত বুঝি না। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ কতকাল সাপেক্ষ তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত। বর্ত্তমানে ভূতকালের কত জ্ঞান, দূষিত বোধ হই-তেছে, ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান দূষিত বোধ হইবে তাহা কে বলিতে

পারে ? কোন অনুষ্ঠান যখন তখন অনুষ্ঠিত হইলে সেইখানেই আমরা বৃত্তি বসাই। গোপাল বারবার মদ্যপান করিলে আমরা বলি গোপালের মদ্যপান করিবার বৃত্তি বড়ই প্রবলা। এই ত বৃত্তি। বৃত্তি জ্ঞান হইলে জ্ঞানের পরিশুদ্ধতাই প্রার্থনীয়, এর সঙ্গে রাজা উজিরের কোন সম্বন্ধ নাই। শারীরিক বৃত্তি বলিলে বরং খাটে ; মানসিক বৃত্তি বলিলে মন যেমন সেই ধরণেরইত বৃত্তি হইবে তাহা ছাড়া অধিক সঙ্গত ধারণা যাঁর হয় তিনি তাহাই বুঝুন।

উপসংহারকালে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট নিবেদন, তিনি কম্‌টের গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া সমালোচনা করুন। কৃষ্ণকমল বাবুকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া আসরে নামা ভাল নহে। কৃষ্ণকমল বাবু যদি কোন স্থানে ভুলেন, কি কোথায় একটু কারিগরি করেন, তাহা হইলে তাহাই কম্‌টের উক্তি বলিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিকের কলিকাতায় শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এ অবস্থায় পজিটিভিজমের উপর দ্বিজেন্দ্র বাবু কলম চালাইলে কম্‌টের চিরসঞ্চিত যশের উপর আঘাত পড়িবে ; কেবল কৃষ্ণকমল বাবুকে দুটো কথা শুনালেই যথেষ্ট হইবে না। যিনি জগতের ক্ষুধিতদিগকে স্মরণ করিয়া কাতরে প্রাতঃসন্ধ্যা-নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে উদর পূরণ করিতেন, তিনি যেই হউন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি দুঃখীর দুঃখ ঘুচান মানবের একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়া জীবন তাহাতেই অতিবাহিত করিয়া উত্তরকালীন লোকদিগের জন্য পরার্থপরতার উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি দেবতা নহেন তবে দেবতা কে ? ঈশ্বর পরকাল পরিত্যজ্য হইলে যদি ধর্ম্মজীবন লাভ না হয়, তাহা হইলে কম্‌টের ধর্ম্মজীবন লাভ হইত না। কম্‌ট যদি ঈশ্বর পরকাল বাদ দিয়া পবিত্রভাবে আপন জীবলীলা সাঙ্গ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাঁহারা কম্‌টের অনুগামী হইবেন তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে আপন আপন গন্তব্য পথে যাইতে পারিবেন, কোন কূট তর্ক তাঁহাদের মঙ্গলময়ী যাত্রায় বাধা দিতে পারিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গবাসীর ইউরোপ যাত্রা।

[১৯২ পৃষ্ঠার পর]

ষ্টীমার হইতে ইউরোপীয় মজুরে ঘাড়ে করিয়া আমাদিগের জিনিষ সকল নামাইল। এই স্থান হইতে সাহেব মুটে প্রথম দেখা গেল। ইহারা বড় বলবান এবং বড় বড় মোট ঘাড়ে করিয়া অবাধে লইয়া যায়। 'ডগানা অর্থাৎ কষ্টম হাউস সমুদ্রের তটে, সেই স্থানে আমরা সকল জিনিষ পত্র ইতালীয় রাজ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরীক্ষার নিমিত্ত লইয়া গেলাম। আমাদিগের বাক্স খুলিয়া কতক জিনিষ তাহারা পরীক্ষা করিল এবং তামাক, চুরট, মদ্য আনাইয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করাতে আমরা সে সকল বস্তু আনয়ন করি নাই জ্ঞাত হইয়া সকল বাক্স আর না খুলিয়া, লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। আমরা ইণ্ডিয়া হোটেলে উপস্থিত হইলাম। এ সময় বেলা প্রায় ৭ টা, কিন্তু হোটেলের সকল লোকে নিদ্রিত ছিল। আমি গমন করিলে একজন ইংরাজী বলিতে পারে (InterPreter) ব্যাখ্যাতৃ আসিয়া অবস্থিতি করিবার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই ব্যক্তি বলিল যে হোটেলের অধ্যক্ষ কোলাপুরের রাজ কুমারকে সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমাদিগের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল এজন্য ব্রিণ্ডিসিতে এক দিবস অবস্থিতি করিলাম, বিশেষ শুনিলাম অদ্য ইণ্ডিয়ান মেল যাইবে, ইহাতে অনেক যাত্রীর জনতা হইবে, কাজেই পরদিবস প্রাতের ট্রেনে গমন করা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। ব্রিণ্ডিসি ইউরোপের একটী সামান্য গ্রাম। ভারতবর্ষীয় মেল ডাক এখান হইতে বরাবর লণ্ডন যায়, এজন্য এখানে বিলাত গমনেচ্ছুক অনেক যাত্রী আসিয়া থাকেন। এখানে ১৬০০০ সহস্র লোকের বসতি। অনেক বড় বড় বাড়ী আছে। অনেক বাড়ীর ছাদে মৃত্তিকা রাখা হইয়াছে, তাহাতে বড় বড় কমলালেবু, পীচ প্রভৃতি ফলের গাছ হইয়াছে। এস্থলে দেখিবার যোগ্য বিশেষ কিছু নাই। একটী প্রাচীন রোমক তোরণ দেখিলাম। তাহা খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রিণ্ডিসিতে কবিবর ভর্জিলের খৃষ্ট জন্মের ১৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। তিনি যে গৃহে পীড়িতাবস্থায় ছিলেন, তাহার ধ্বংশ বর্ত্তমান আছে।

ব্রিণ্ডিসি হইতে লণ্ডন অতি দ্রুতগামী ভারতবর্ষীয় মেল, ট্রেনে ৪৫ ঘণ্টায় গমন করা যায়। আমরা এখান হইতে প্রাতে ৯ টার সময় আহারাদি করিয়া

রওনা হইয়া বৈকাল বেলায় ফজিয়া নামক ইতালীয় ক্ষুদ্র নগরে পঁহুছিলাম। এখান হইতে ট্রেন অন্য পথে যাইবে এজন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ফজিয়া ষ্টেসনের (Buffet) অর্থাৎ আহারের ঘরে যাইয়া আহারাদি করিলাম। আহারান্তে এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। নগরটী যদিও ছোট কিন্তু অনেক বড় বড় বাটী আছে ও এখানে ব্যবসায়ী লোক অনেক বাস করে। চক্ষু স্থির করিয়া পথের সাধারণ লোক আমাদিগকে দেখিতে লাগিল কিন্তু সেই দৃষ্টিতে আমাদিগের উপর অসম্মান প্রকাশ হয় নাই। এখানকার শস্য ব্যবসায়িগণ মৃত্তিকা মধ্যে বড় বড় পাতাল ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শস্য পুরিয়া রাখে।

আমরা ৪ ঘণ্টা ফজিয়ায় অবস্থিতি করিয়া রেলের গাড়িতে পারিস রওনা হইলাম। আমাদিগের দেশের ন্যায় ইউরোপের রেল গাড়িতে সুখে রাত্রে হস্তপদ বিস্তার করিয়া শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইবার সুবিধা নাই। এখানে যাত্রী অনেক হইয়া থাকে সুতরাং বসিয়াই সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে হয়। রাত্রে সাড়ে তিনটার সময় চারিদিক্ এদেশ পরিস্কার হইয়া যায়, অন্ধকার থাকে না এবং পাঁচটার সময় প্রভাত, বেশ রৌদ্র দেখা দেয়। প্রভাতের আলোক হইবা মাত্র আর নিদ্রা হইল না, কাজেই চক্ষু মুদিয়া জপের অবস্থায় অনর্থক বসিয়া থাকা বিড়ম্বনা বোধ করিলাম। রেলের গাড়ি নক্ষত্রবেগে দৌড়িতেছে। পথের ধারের অতি অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা দেখা যাইতে লাগিল প্রকৃতি দেবীর এতাদৃশ মনোহর বেশ আর পৃথিবীর কোন দেশেই দেখা যায় না। পর্ব্বত, কন্দর, নির্ঝর, নূতন সংরোপিত দ্রাক্ষা লতা, নবপত্র শোভিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, প্রভৃতি সন্দর্শনে সেই করুণা নিধান জগৎ পিতাকে স্মরণ হইল।

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া থাকি॥"

ষ্টেসন গুলির নিকট প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামগুলি কোনটী বা পর্ব্বত উপরে স্থাপিত, কোনটী বা ভূমির উপর চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ বেষ্টিত। দূর হইতে গ্রামগুলি সুন্দর দেখাইতেছে। জনকোলাহল নাই, কৃষকগণ অশ্বারোহণে কেহবা পদব্রজে ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলিয়াছে। ষ্টেসনে সকল স্থানেই আহারের বন্দোবস্ত আছে এবং ইচ্ছামত আহার করিবার বস্তু পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রে মণ্টসেনিস নামক পার্ব্বতীয় সুড়ঙ্গ পথ পার হইলাম। এটী মানব জাতীর এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই কার্য্যে টিউরিনের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হস্তক্ষেপণ করেন, তৎপরে ইতালীয় ও ফরাসীশ উভয় রাজকোষের কোটি কোটি অর্থ ব্যয় দ্বারা প্রস্তুত হয়। রেলের গাড়িতে ইহা পার হইয়া যাইতে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে। আমরা এই সুড়ঙ্গ পার হইলেই ফরাসীশ রাজ্যে পঁহুছিলাম। মোদান ষ্টেসনে গাড়ি আসিবামাত্র একজন ফরাসীশ আফিসার আসিয়া, আমাদিগকে সকল জিনিস সমেত কাষ্টম হাউস ঘরে লইয়া গেল। তথায় সকল বস্তু কর্ম্মচারিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কহিল যে কোন বস্তু আমাদিগের লঙ্গে শুল্ক দিবার যোগ্য নাই। এ সকল জিনিস লইয়া পুনর্ব্বার গাড়িতে আরোহণ করিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। রাত্র মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদিগের বঙ্গদেশের মাঘ মাস অপেক্ষাও শীত বোধ হইতে লাগিল এবং রেলের রগ্ গায়ে দিয়া সকলে জড়সড় হইয়া বসিয়া নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলাম। নিদ্রা বড় সুবিধামত হইল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে ফরাসীশ পল্লীগ্রামের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। অদ্য মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি হইতেছে। শ্যামল তৃণের উপর বৃষ্টি বিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া আমাদিগের কাহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

ক্রমশঃ

ভারতীয় অসবর্ণ বিবাহের বিষয়।

ভারতমাতা প্রথমাবস্থার এক জাতীয় লোকের জননী ছিলেন। তখন ঐ এক জাতীয় লোক নানা সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে লাগিল। কোন সম্প্রদায় কৃষি, কোন সম্প্রদায় বাণিজ্য, কোন সম্প্রদায় পশুপালন, কোন সম্প্রদায় শিল্প, কোন সম্প্রদায় রাজ্যরক্ষা, কোন সম্প্রদায় যজন যাজনাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই সকল সম্প্রদায়ের বংশ বৃদ্ধি হইলে উহারা সকলে ঐক্য হইয়া ৪টি জাতিতে পরিণত হইল। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেন। যাঁহারা রজোগুণে ভূষিত তাঁহারা রাজা, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়; যাঁহারা রজস্তমোগুণে মিশ্রিত তাঁহারাই বৈশ্য অর্থাৎ বণিক্; যাঁহারা কেবল তমোগুণাবলম্বী তাঁহারাই শূদ্র অর্থাৎ দাস জাতি হইলেন। যখন চতুর্ব্বর্ণ সংগঠিত হইল, তখন তদুপযুক্ত শাস্ত্র সকল প্রচারও হইল। আদিম শাস্ত্র

সকল অকর্ম্মণ্য তামাদি হইয়া পড়িল। তৎপর ঐ চাতুর্ব্বর্ণ হইতে অনুলোম আর প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন ভারত জননী পাপপুঞ্জ প্রসব করায় ভারতের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অমঙ্গল ও ঘৃণার্হ পাপজনক কর্ম্ম সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একালের বিধি ব্যবস্থা সকলও নূতন রকম প্রচার হইল। অসবর্ণ বিবাহ রহিত হইল। যতকাল পাপজনক অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তত দিন ঐ অসবর্ণ বিবাহজ সন্তান আর অবৈধ স্বজাতীয় স্ত্রী সংসর্গ প্রজার দ্বারা যাবদীয় দুষ্কর্ম্মের এমনি প্রাদুর্ভাব হইল। যে রাজার রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। এ নিমিত্ত শাস্ত্রকর্ত্তারা অর্থাৎ আইন কর্ত্তারা অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই আইন হিন্দু সমাজে অদ্যাপি চলিতেছে। বিষ্ণুপুরাণে সঙ্কর জাতি সম্বন্ধে যে আইন প্রচার হইয়াছিল অগ্রে তাহাই লেখা যাইতেছে।

"দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ। প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ নতু বর্ণসঙ্করকোনৃপঃ।

দুষ্টদমন শিষ্টপালন করিলে রাজা অভিমত লোক লাভ করিতে পারেন। এরূপ না করিলে রাজাই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টিকর্ত্তা হন। বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যের অমঙ্গলজনক। দুইবর্ণ মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর জন্মে। এ সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা—

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ। সর্ব্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্ধওস্য বিভ্রমাৎ॥

মনু বলিয়াছেন পৃথিবীতে যদি রাজ্যের ব্যতিক্রম হয় তবে তাবৎ প্রজা দূষিত আর ধর্ম্মের ও কর্ম্মের বাঁধ ভগ্ন হয়। ধর্ম্ম কর্ম্মের বাঁধ ভগ্ন হইলে পর সকল প্রজাই প্রকুপ্ত হয়। এজন্য রাজ্য হইতে বর্ণসঙ্কর জাতিকে দূর করা কর্ত্তব্য। যথা—

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসাজায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ। রাষ্ট্রীকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

যে রাজ্যে বর্ণদূষক ও প্রজানাশক বর্ণসঙ্কর জাতি জন্মিয়া প্রশ্রয়ের সহিত বর্দ্ধিত হয় সেই রাজ্য রাজার সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

এই বিশাল বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে ৩৬ রকম হিন্দুজাতি আছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলি শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত কেবল অল্প সংখ্যক বৈদ্য ও বণিকজাতি যাহা আছে তাহাও শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত নহে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার সকলি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। কায়স্থ জাতি যে কি কারণে শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বিচারতঃ ইহাঁরা সঙ্করজাতি নহেন। ইঁহারা মূলজাতি সত্য কিন্তু ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রধর্ম্মী হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থ ভিন্ন আর ততটি জাতি

যদ্যপি মিশ্রজাতি তথাপি ইহারা হিন্দু-রাজাদিগের রাজত্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এইক্ষণ উহারা এক একটি মূল জাতি হইয়া পড়িতেছে। ইহাদিগের বিমিশ্রণে অর্থাৎ বিপরীত ভাবে মিশ্রিত হইয়া তদ্দ্বারা প্রজা উৎপন্ন যাহাতে না হইতে পারে ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়স্থগণের অনুলোম প্রতিলোমে প্রকৃতি পুঞ্জ না জন্মিতে পারে, তাহারি কারণ অসবর্ণা বিবাহ প্রথা আইন কর্ত্তাদিগের দ্বারা যে প্রকারে রহিত হইয়া গিয়াছে তাহার কতিপয় প্রমাণ এই স্থলে লেখা যাইতেছে যথা।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥

কন্যানাম সবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ইত্যাদি উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্য পুরানীয় বচনং।

দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রহ্মচর্য্যব্রত আর কমণ্ডলু নামক জলপাত্র ব্যবহার আর স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা আর দত্তা কন্যার বিবাহ আর অসবর্ণ বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি ক্রিয়া সকল কলিযুগের জন্য সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত পণ্ডিতদিগের দ্বারা নিবারণ হইয়াছে। এখন যেরূপ পৃথিবীর অবস্থা অর্থাৎ ভারতের অবস্থা তাহাতে সবর্ণ বিবাহজ সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ হওয়া সুকঠিন হইয়াছে। তদুপরি অসবর্ণ বিবাহজ সন্তান সন্ততি কি প্রকারে প্রতিপালন হইবে। যখন এই ভারত বাসী প্রজা সংখ্যা অত্যল্প ছিল আর ভারতমাতা প্রচুর পরিমাণে ফলমূল আদি খাদ্য দ্রব্য প্রসব করিয়াছিলেন তখন অসবর্ণ বিবাহ ও ১২ রকম সন্তান আর ৮ প্রকার বিবাহও প্রচলিত থাকায় আর ভারতীয় খাদ্য দ্রব্যাদি অন্যবর্ষে বা দ্বীপে রপ্তানি হইত না বলিয়া ভারত বাসী প্রজা ও রাজা সকল পরম সুখে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। "স্বতঃপাপিষ্ঠ দিবসাৎ পৃথিবীগতযৌবনা"॥ কালগতিকে দিন দিন পাপ সঞ্চয় হওয়ায় পৃথিবী গতযৌবনা হইয়াছেন। ইহাতে ভারতমাতা ২৫।২৬ কোটি সন্তানকে কি প্রকারে প্রতিপালন করিবেন।

পুরাকালে ভারতমাতা যে পরিমাণে প্রজা ও খাদ্য দ্রব্য প্রসব করিয়াছিলেন এখন তদপেক্ষা শতগুণ অধিক প্রজা যেমন প্রসব করিতেছেন অতি কষ্টে তদুপযুক্ত ভরণ পোষণের সামগ্রীয় প্রসব করিতেছেন বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার কিয়দংশ অন্যান্য বর্ষে ও দ্বীপে রপ্তানি হওয়ায় ভারত সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষে পতিত হইতেছে। পুরাকালে ক্রমাগত তিন বৎসর অজন্মা হইলে কখন কখন দুর্ভিক্ষ হইত। এখন এক বৎসর অজন্মা হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। ভারত মাতার প্রাচীনত্ব আর প্রজা সংখ্যার আধিক্যতা ও ভোক্ষ্য দ্রব্য রপ্তানি এই কএক কারণেই বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইতেছে।

যখন কেবল রপ্তানি ছিল না তখন এক বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমাগত তিন বৎসর কাল ভোগ করিলেও খাদ্য দ্রব্যের অনাটন হইত না। সকল গৃহস্থের ঘরে বর্ষভোগ্য সামগ্রী থাকিত। কোন কোন্ সদ্‌গৃহস্থের ঘরে ৩।৪ বৎসরের খাদ্য প্রস্তুত থাকিত। ইহাদিগের দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় অনেক সাহায্য পাওয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন রাজভাণ্ডারও প্রচুর পরিমাণে শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। রাজা তাৎকালিকী প্রথানুসারে প্রজাদিগের নিকট হইতে মুদ্রাকর গ্রহণ না করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ অর্থাৎ ফসলের অংশ লইয়া তাহা গ্রামে গ্রামে রাখিয়া তদ্দ্বারা আত্ম ও প্রকৃতি পুঞ্জ রক্ষা করিতেন। ইহাতে দুর্ভিক্ষ জন্মাইতে পারিত না। কদাচিৎ কখন দুর্ভিক্ষ হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রাম্য রাজভাণ্ডার দ্বারা নিবারণ হইত। এখনকার ন্যায় প্রজাপালনের রীতি পদ্ধতি ছিল না। এখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে করিতে প্রজাপুঞ্জ শমন সদনের অতিথি হইয়া পড়িতে থাকে। এখন যত দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে আর যাহা স্বচক্ষে দেখা যাইতেছে তাহাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার চতুর্থাংশ না মরিলে রাজার দৃষ্টি হয় না।

এই প্রাচীন ভারতে এইক্ষণ এত রকম প্রজা বাস করিতেছে যে তাহা নির্ণয় হওয়া কঠিন। প্রথম ৩৬ বর্ণ হিন্দু তৎপর ৪।৫ প্রকার মুসলমান, তার পর ৩।৪ প্রকার খ্রীষ্টান তার পর ২।৩ রকম পার্সি, ২।৩ রকম বৌদ্ধ, চীন, মগ, তার পর কত রকম পাহাড়েজাতি, তার পর ২।৩ রকম শিখ, তার পর দুই তিন রকম ব্রাহ্ম। ইহার পর আবার অসবর্ণ জাতিজ নূতন রকম সঙ্করজাতি প্রজা সৃষ্টি হইলে ভারতের যে কিছু দূরবস্থা ঘটিবে তাহা বাক্‌পথাতীত। অতি প্রাচীন কালে ও মধ্য সময়ে বেণ বৌদ্ধ রাজাদিগের রাজত্বকালে যে সকল বর্ণসঙ্করজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল এখন তাহাদিগের বংশাবলিতে ভারত মহাভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল বর্ণসঙ্করদিগের সংসর্গে অন্যান্য জাতির মহা অনিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত শাসনকর্ত্তাদিগের জেল সম্বন্ধীয় লিপিতে প্রকাশ যে ভারতবর্ষীয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জেল সমূহে হিন্দু কএদীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মুসলমান কএদী অল্প, তদপেক্ষা খ্রীষ্টান কএদী আরও অল্প, ইহা অপেক্ষা অন্যান্য জাতি কএদীর সংখ্যা আরও অল্প।

হিন্দু কএদীর মধ্যে সঙ্করজাতি হিন্দু কএদীই অধিক। সঙ্করের মধ্যে আবার অপসদ সঙ্কর হইতে অপধ্বংসজ সঙ্কর অধিক পরিমাণে কারাগারে বাস করে। অপধ্বংসজ সঙ্কর জাতি সকল সমাজ ও রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন হিন্দু রাজারা সঙ্কর জাতিকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। বিশেষতঃ অপধ্বংসজ সঙ্কর জাতি দ্বারা রাজ্য বিপ্লব হইবে বলিয়া হিন্দু রাজা সকল তাহাদিগকে সর্ব্বদা কারাবাসী করিতেন।

অপধ্বংসজ সঙ্কর জাতির প্রধান কার্য্য চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুপ্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম, অপসদ সঙ্কর জাতির তত ঘৃণার্হ কর্ম্ম ছিল না বলিয়া তাহারা রাজ্য মধ্যে বাস করিতে পারিত। অপধ্বংসজ সঙ্কর জাতির মধ্যে কতক ব্যাধবৃত্তি, কতক চাণ্ডাল জাতি, কতক ডোম জাতি, কতক কাওরা জাতি, কতক বাগ্‌দি জাতি, কতক তিওর জাতি, কতক কাপালী জাতি, কতক হড্ডিকা জাতি, কতক চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইলে উহারা এইক্ষণ পৃথক পৃথক মূল জাতি হইয়া গিয়াছে। আবার উহাদিগের সংঘর্ষণে পুনর্ব্বার অসবর্ণ বিবাহ প্রভাবে যদি জঘন্যাতিজঘন্য অপধ্বংসজ জাতির সৃষ্টি হয় তাহা হইলে রাজ্যের যে কিতক অনিষ্ট ঘটিবে তাহা বাঙ্‌মনাতীত।

মনে কর হাড়ী কি বাগ্‌দির ক্ষেত্রে মুসলমানের ঔরসে আর কাওরার ও ডোমের ঔরসে ফিরিঙ্গীর ক্ষেত্রে সন্তান জন্মিলে সে সকল সন্তান যে কিরূপ ভারতের উপকারী হইবে তাহা ভগবান নারায়ণই জানিতেছেন। অপিচ—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে যে সকল অসবর্ণ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অপসদ অপধ্বংসজ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া জন্মায় তাহারা যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া কালযাপন করে তখন অনার্য্য জাতিজ অপসদ আর অপধ্বংসজেরা যে সর্ব্ব জাতির ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিবে না তাহারি বা কি প্রমাণ।

এইক্ষণ আর্য্য জাতিজ অপসদ আর অপধ্বংসজের কর্ম্মের প্রমাণ দেখান যাইতেছে।

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃস্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানামেব কর্ম্মণি॥
মনুঃ।

এই শ্লোকের ভাবার্থ লেখা হইয়াছে। অতঃপর বর্ণসঙ্করের সংক্ষপবৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেনচ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
ইতি মনুঃ।

ব্যভিচার দোষে আর বিবাহের অনুপযুক্ত বর কন্যার বিবাহে জাত সন্তানকে এবং স্বকর্ম্ম ত্যাগীর সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায়। যাহারা স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্ম না করে তাহাদিগকে স্বকর্ম্ম ত্যাগী বলে।

ভারতীয় প্রাচীন মুনি ঋষিরা যোগসিদ্ধ প্রভাবে দিব্য জ্ঞান দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া অভ্রান্ত বাক্য দ্বারা রাজ্য শাসনাদি ঐহিক আর দৈব পৈত্র্য পারলৌকিক ক্রিয়ার যে সকল বিধি ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় অমোঘ ফলপ্রদ। উহাঁরা ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল ভবিষ্যৎ রাজ্য বলিয়াছিলেন তাহার ৮৶১৫ পাই সফল হইয়াছে। বাকী এক পাইও শীঘ্র ফলিবে। এমত

স্থলে তাঁহাদিগের দৈববাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রথার পক্ষপাতী হওয়া কোনমতেই হইতে পারে না। আর ভারতের বর্ত্তমান যেরূপ অবস্থা দেখা শুনা যায়, তাহাতেও সদ্‌যুক্তি অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে পারে না। চালাইলে ভূরি ভূরি অনিষ্ট ঘটিবে। যদ্যপি অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সুফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে মুনি ঋষিরা তাহাতে অনুমোদন করিতেন। এই এক কথা। অপর কথা এই যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহের নিতান্ত পক্ষপাতী তাঁহারা ত এ পর্য্যন্ত হাড়ি, ডোম, চাণ্ডাল, কাওরা, মুচি, মুসলমানের সে যে বিবাহ করেন নাই এবং উহাদিগকে কন্যাও দিতেছেন না। ইহারিবা কারণ কি। ইঁহারা ত জাতি মানেন না। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে যাঁহারা হারাইয়া মারাইয়া কাশ্যপ গোত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আর্য্য সন্তান সকল হিন্দু আর্য্য জাতিতে মিশিতে না পারায় তাঁহারদিগের ছেলে মেয়ের বিবাহ জন্য আর যে সকল অনার্য্য জাতি ঐ দলে মিশিয়াছে তাহাদিগের ছেলে মেয়ে উদ্ধারের নিমিত্ত অসবর্ণ বিবাহ। এইরূপ বিবাহে অনার্য্যদিগের একাদশ বৃহস্পতি। ইহারা কামার কি কুমার কি শুঁড়ি হইয়া অবাধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে গ্রথিত হইবে ইহার পর সৌভাগ্য আর কি আছে। গাধায় ঘোড়ায় মিশ্রিত হইলে যেরূপ খচ্চর জাতি পশু উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাতেও ঠিক সেই প্রকার ফল ফলিবে। কাকের ঔরসে গরুড়াণি পক্ষিণীর গর্ভে যেমন শকুনি জন্মে, গরুড় জন্মিতে পারে না তদ্রূপ মেথরের ঔরসে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়স্থ জাতীয়া কন্যার গর্ভজ সন্তান হইবে। ইহারা সদ্‌গুণশালী পণ্ডিত বা বীর হইতে পারে না।

এমন যেন কেহ মনে না করেন যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থবর্ণ কথায় কথায় কি অন্য প্রকারে বিলোপ হয়। ভারতবর্ষের জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণে ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণ বৈশ্য পীতবর্ণ শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইবেই হইবে। যেমন বর্ণ, প্রকৃতিও তদনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এ সকল প্রাকৃতিক নিয়ম কি কথায় কথায় অন্যথা হইতে পারে। যখন ভারতের জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণ প্রকৃতি দেবী পরিবর্ত্তন করিবেন, তখন একবর্ণা একধর্ম্মা ভারতমাতা হইতে পারেন। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হন তাঁহারা প্রকৃতি দেবীর সহিত ঐক্য হইয়া চলিলে ভারতের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে নচেৎ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তদনুরূপ ফল পাইবেন।

ভারত কখন হিন্দুধর্ম্ম হইতে একেবারে বিচ্যুত হইবেন না। একেবারে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়াও ভাল নহে। যাঁহাদিগের সংস্কার এই যে হিন্দুধর্ম্মই ভারত অবনতির কারণ। তাঁহাদিগের এই কষ্টার্জ্জিত সংস্কার অত্যন্ত মলিন ও অনর্থকর। যত দিন তাঁহাদিগের এ সংস্কার থাকিবে তত দিন তাঁহারা কষ্ট ভোগ করিবেন। হে ভারতবাসি বন্ধুগণ, তোমরা ভারতীয় জল, বায়ু, ও মৃত্তিকার আর ভারতে নিপতিত সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণজ গুণ নিত্য নিত্য সম্ভোগ যেমন করিতেছ তেমনি ভারতীয় যুগানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চল। যুগ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে চলিলে কষ্টভোগ করিতে হইবে। যেমন যুগ ও যেমন বর্ষ তাহার মত চল। যুগ আর বর্ষোপযোগী শাস্ত্র সকল দেখ। তবেই জানিতে পারিবে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য কি প্রকার। এতদন্যথায় শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

শাক্যসিংহের আবির্ভাব কাল।

বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা যায় না। শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস পরম্পরা অনুসন্ধান করিলে এবং তদুক্ত যুক্তির আশ্রয় লইলে কতকটা জানা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে এমন স্থির হয় না যে, শাক্যসিংহ ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। অনেক ইংরাজ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব তাঁহাদের খৃষ্ট জন্মের অন্যূন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন, অন্যে বলেন, তিনি খৃষ্টের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইংরাজগণের এ নির্ণয় কিং মূলক তাহা আমরা জানি না; কাজে কাজেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে পৃথক্ অনুসন্ধান করিতে হইল।

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহ্লন পণ্ডিত এক স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, তুরষ্কবংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক এই তিন ব্যক্তি যখন কাশ্মীরের রাজা কাশ্মীর তখনবৌদ্ধ পরিব্রাজকে পরিপূর্ণ। ভগবান লোকনাথের অর্থাৎ

বুদ্ধের পুরপ্রয়াণের ১৫০ বৎসর পরে কাশ্মীরে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।* এই সময়েই নাগার্জুন নামক জনৈক বৌদ্ধ ভূপতি জন্মিয়াছিলেন।

কহ্লন পণ্ডিত ১০৭০ শকাব্দে সুব্রত পণ্ডিতের রাজ কথা, ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী, নীলমত পুরাণ, পূর্ব্বরাজগণের প্রতিষ্ঠিত বস্ত, অনুশাসন ও প্রশস্তিপট্ট প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সুক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অধিক ভ্রম থাকিবার সম্ভবনা নাই। তিনি যথন স্বগ্রন্থে উপরি উক্ত কালের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমরা উক্ত কাল সাদরে গ্রহণ করিতে পারি, বিশ্বাস করিতেও পারি। এই কাল অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, গণনায় কত বৎসর হয় তাহা দৃষ্ট করুন।

কল্যব্দের অতীত		...	৬৫৩।০
গোনর্দ্দ রাজা	...	...	৩৫।৬
দামোদর	...	...	৩৫।৬
বাল গোনর্দ্দ	...	...	৩০।০
ক্রমিক ৩৫ জন রাজা		...	১২৬৬।০
লব	...	...	৩৫।০
কুশেশয়	...	...	৩।৮
খগেন্দ্র	...	...	৬০।০
সুরেন্দ্র	...	...	৩০।৬
গোধর	...	...	৩৬।৭
সুবর্ণ	...	...	৬০।০
জনক	...	...	৬০।০
শচীনর	...	...	৭১।০
*অশোক	...	...	৬২।০
জলোক	...	...	৩০।০
দ্বিতীয় দামোদর		...	২৫।০
			২৪৯২।৯

এইরূপ রাজ্যকাল তালিকার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরাদির সমকালিক গোনর্দ্দ রাজার রাজ্য কাল আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দামোদর রাজার রাজ্যকাল সমাপ্ত হইতে কলির প্রারম্ভাবধি ২৪৯২।৯ বৎসর ও মাস লাগিয়াছিল। ইহার পরেই হুষ্কজুষ্কাদি রাজার রাজ্যকাল; তাহার রাজ্যকাল ৬০।০ সমুদায় একত্রিত করিলে ২৫৫২।৯ লব্ধ হয়। ইহার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। ২৫৫২।৯ বৎসরের ১৫০ বাদ দিলে ২৪০২।৯ থাকে। সুতরাং কহ্লন পণ্ডিতের গণ-

* অথাভবন্ স্বনামাঙ্ক পুরত্রয় বিধায়িনঃ।
হুষ্ক জুষ্ক কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয় স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥
স বিহারস্য নির্ম্মাতা জুষ্কোজুষ্ক পুরস্যযঃ।
জয় স্বামি পুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ স বিধায়কঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মট চৈত্যাদি চক্রিরে॥
প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীর মণ্ডলম্।
ভোগ্যমাস্তে চ বৌদ্ধানাং প্রব্রজ্যোর্জ্জিত তেজসাম্॥
ততো ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুর নির্বৃত্তেঃ।
অস্মিন্ সহ লোক ধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ॥

* এই অশোক চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র অশোক নহে। ইনি শচীনরের পিতৃব্য পুত্র, শকুনির প্রপৌত্র এবং কাশ্মীরের রাজা। চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র অশোক বর্দ্ধন ও প্রচণ্ডাশোক নামে বিখ্যাত।

নায় কলির ২৪০২।৯ মাসের কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী হন ইহা নির্ণীত হয়। ধারাবাহিক পঞ্জিগণনার দ্বারা জানা যায় যে, কল্যব্দ এখন ৪৯৮৬ হইয়াছে। ৪৯৮৬ হইতে ২৪০২ বাদ দিলে ২৫৮৪ থাকে; কাজে কাজেই বলিতে হইতেছে, ভগবান বুদ্ধ ২৫৮৪ বৎসরের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন।*

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু গ্রন্থে অন্য এক সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান শাক্যসিংহ মগধের রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় রাজগৃহ নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে মহাবুদ্ধ শাক্যমুনি রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক। রাজা বিম্বিসার চন্দ্র গুপ্তের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ, যথা—

বিম্বিসার।
।
অজ্ঞাত শত্রু।
।
দর্ভক।
।
উদয়াশ্ব।
।
নন্দি বর্দ্ধন।
।
মহানন্দী।
।
নন্দ (৮ পুত্র সমেত)
।
চন্দ্র গুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে নন্দগণ ১০০ বর্ষকাল সিংহাসন ভোগ করেন। নবনন্দের অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিম্বিসারের রাজ্যাধিকার ছিল।* বিষ্ণুপুরাণের লিপি ও উক্ত প্রকার অনুমান সত্য হইলে, ইহাও সত্য হইবে যে, ভগবান্ শাক্যসিংহ চন্দ্রগুপ্ত রাজার অন্যূত ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিত যথন রাজ্য করেন, কলি তখন ১২০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে।

"তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।"

* কেহ কেহ বলেন রাজতরঙ্গিনীর এই নির্ণয় সম্যক শুদ্ধ না হইতেও পারে। কেন না অন্যান্য প্রমাণের সহিত উক্ত নির্ণয়ের মিল হয় না এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্গিনী পুস্তক খানি বিশেষ শুদ্ধ নহে; ইহাতে অনেক ভুল আছে।

† "গচ্ছ রাজগৃহং তহিং বুদ্ধো ভগবাং প্রতিবসতি।
শ্রেণীরস্য রাজ্ঞো বিম্বসারস্য যাচিত বাসো প্রতি বসতি।"
[মহাবস্তু অবদানে, ছত্রবস্তু।

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, শিশুনাগ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত ১০ জন রাজা ৩৬২ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। দশ জন রাজার রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর হইলে তন্মধ্য হইতে শিশুনাগ, ক্ষেম ধর্ম্মা, ক্ষত্রৌজা, এই তিন ব্যক্তির রাজ্যকাল হইতে ১৫০ বৎসর বাদ দিয়া তৎপরবর্ত্তী বিম্বিসার প্রভৃতি ৭ জন রাজার রাজ্যকাল ২০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এই সময়ের পর, সপ্তর্ষি মণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র গত হইবেন, নন্দ তখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে ন এবং কলিও সেই সময় হইতে প্রবল হইবে। যথা—

"প্রয়াস্যন্তি যদা চৈত্র পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলি বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র অতিক্রম করিতে অন্যূন ১১০০ বৎসর লাগিয়াছিল। পূর্ব্বের বারো শত, আর এই এগার শত সমুদায়ে একত্রিত করিয়া কলির ২৩০০ শত বৎসর পরে নন্দরাজ্য হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত হয়। এই নিশ্চয় সত্য হইলে ইহাও সত্য হইতে পারে যে, কলির ২৩০০ বৎসর পরে, ২৪০০ বৎসরের মধ্যে বুদ্ধাবতার ঘটনা হইয়াছিল। অতএব আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধদেবের আয়ু এক্ষণে ২৬০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হয়; কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহাঁর আয়ু ২৪০০ শতের অধিক হয় নাই।

ভাগবত মহাপুরাণে ভবিষ্য অবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্মকাল নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ততঃ কলৌ• সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নার্জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

"কলৌ সম্প্রবৃত্তে" এই কথার দ্বারা কলির সম্যক বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ লব্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ অনুসারে অর্থাৎ—

"তদা নন্দাৎ প্রভৃতেষ্যর কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

কলি মহাপদ্ম নন্দ রাজা হইলেই তৎসময়ে কলির বৃদ্ধি হইবে। এই বচন অনুসারে স্থির হয় যে, নন্দের সময় অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধাবতার হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ভাগবত বচন ও এই বিষ্ণুপুরাণ বাক্য তুল্যার্থ মিলাইয়া লইলে অবশ্যই স্থির হইবে যে, জিন পুত্র বুদ্ধ প্রথম নন্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যগয়া প্রবেশে আবির্ভূত অর্থাৎ খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ সত্য হইলে শাক্যসিংহকে চন্দ্রগুপ্তের অনধিক ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলা যাইতে পারে এবং ইহাতে ইংরাজ পণ্ডিতগণের অনুমানকে কিছু পরিমাণে সত্য বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মগধ দেশে প্রদ্যোতন নামে এক রাজবংশ বিদ্যমান ছিল।*

নন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদ্যোতন বংশ সত্য সত্যই বৌদ্ধ আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা আমাদের বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই। প্রদ্যোতনশেষ হইলে ক্ষত্রৌজা, ক্ষেমধর্ম্মা, কাকবর্ণ ও শিশুনাগ, এই চারি জন মাত্র রাজা ক্রমে প্রাপ্ত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন; তাহার অব্যবহিত পরে রাজা বিম্বিসার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ভগবান শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া, মগধে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।* ইহা আমরা মহাবস্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই।

এই সকল অনুসন্ধান লব্ধ প্রমাণের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাতে বুদ্ধ দেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ঠিক ৫৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। উহার অধিক পূর্ব্বে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই স্থির হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন

• "অপরে ত্বেবমাহুঃ। ইদং প্রদ্যোতন কুলং মহাবলঞ্চ মহাবাহনঞ্চ পরচমূশিরসি বিজয় লব্ধঞ্চ তৎপ্রতিরূপ মস্য বোধিসত্ত্বস্য গর্ভ প্রতি সংস্থানায়েতি।" [ললিত বিস্তর. ৩ অং।

* নন্দিবর্দ্ধনান্তাঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। ততশ্চ শিশুনাগাদয়ঃ।
[বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ২ ৪অং।

পরোপকারিতা ও কৃতজ্ঞতা।

পরোপকারিতা আর কৃতজ্ঞতা এই দুইটি কার্য্য ভারতীয় হিন্দু জাতির যেমন প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এমন ধর্ম্ম পৃথিবীর আর কোন জাতির নাই বলিলেও বলা যায়। কোন্‌কালে প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তিমান মানব দেহ ধারণ করিয়া ত্রিলোককণ্টক মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি দৈত্য দানব যে বিনাশ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তথাপি সেই অতি পুরাতন উপকার আজি পর্য্যন্ত ভারতীয় হিন্দু জাতি ভিন্ন আর কোন জাতিকে মনে করিতে দেখা বা শুনা যায় না। এতদ্ভিন্ন সেই প্রকৃতি দেবী পুরুষ বিগ্রহ হইয়া রাবণাদি নিশাচর ও কংসপ্রমুখ দৈত্য বধ করত পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন তাহা হিন্দুমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা রস হিন্দু জাতির মনে পুরুষানুক্রমে থাকে বলিয়া হিন্দুরা উপকারকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানে সেই সকল মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। একবার কি দুইবার আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন তাহা

নহে বৎসর বৎসর আরাধনা করিয়াও মনের বেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভাদি দৈত্য বিনাশকারিণী প্রকৃতিদেবী যে প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ত্রৈলোক্যের ভার হরণ করিয়াছিলেন, হিন্দুরা শাস্ত্র প্রমাণানুসারে সেই সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিতেছেন। প্রথমে সুরথ রাজা যে মূর্ত্তির আরাধনা করেন পরে রাজা রামচন্দ্রও সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। সুরথ রাজা বসন্তকালে দেবীর আরাধনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরাও তদনুসারে বাসন্তী ও রামচন্দ্রের নিয়মানুসারে শারদীয়া পূজা করিয়া আসিতেছি।

এইক্ষণ এই পূজা প্রকারত্রয়ে সমাধা হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তাঁহারা কেবল সাত্ত্বিকমতে, যাঁহারা রাজসিক লোক তাঁহারা রাজসিক মতে, যাঁহারা তামসিক লোক তাঁহারা তামসিক রূপে দেবীর আরাধনা করিতেছেন। কি সাত্ত্বিক কি রাজসিক কি তামসিক সকল ভাবেই অন্ন বস্ত্র অর্থ দান করা হয়। কেহ কেহ এই পূজোপলক্ষে ছোট আদালতের কয়েদীদিগকেও মুক্ত করিয়া থাকেন। অধিক কি, কি খাদ্য দ্রব্য, কি বস্ত্র, কি অপরাপর লোক ব্যবহার্য্য দ্রবা সামগ্রী এতাবতই দ্বিগুণ ত্রিগুণ মহার্ঘ্য হয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান কি অন্য জাতি তাবত ব্যক্তিই শারদোৎসবে মগ্ন হয় বলিয়া দ্রব্য সামগ্রী এত দুর্ম্মূল্য হয়। এ পরব সর্ব্ব জাতীয় আনন্দ বর্দ্ধক। এত দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃহৎ পর্ব্ব ভারতে আর দেখা যায় না। কেহ কেহ শারদোৎসব ১৫ দিন পর্য্যন্ত কেহ কেহ নয় দিন, কেহ কেহ চারি দিন, কেহ কেহ দুই দিন, কেহ বা এক দিন মাত্র পরব করিয়া থাকেন। এরূপ কল্প আর কোন মহা পূজায় নাই। বাঙ্গালীরা দুর্গোৎসবে প্রতি বৎসর যে ব্যয় করেন তাহাতে তাঁহারা কাতর হন না। এই বঙ্গদেশের মধ্যে যত নগর ও মহা নগর গণ্ডগ্রাম গ্রাম পল্লি আছে প্রায় তাবৎ স্থানে এ মহোৎসব হইতেছে। অনুমান সমগ্র বঙ্গদেশে লক্ষাধিক দুর্গোৎসব হয়। গড়ে ৫ শত টাকা করিয়া প্রত্যেক দুর্গোৎসবে ব্যয় হইলে পাঁচ কোটি টাকা করিয়া প্রতি বৎসর ব্যয় হইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালী যেমন তেমনি আছেন। দুর্গোৎসব করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ দেউলিয়া পড়েন নাই।

ইহা ভিন্ন কোজাগর লক্ষ্মী পূজা জগদ্ধাত্রী ও শ্যামাপূজা, সরস্বতী পূজা, বাসন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজায়ও প্রতি বৎসর যে কত টাকা ব্যয় হয় তাহা পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এ সকল পূজা ব্যতীত রথযাত্রা স্নানযাত্রা দোলযাত্রা চন্দনযাত্রা গোষ্ঠযাত্রা ঝুলানযাত্রা জন্মাষ্টমী রামনবমী প্রভৃতি উৎসব আছে। এই সকল যাত্রা আর মহোৎসবে বাঙ্গালীরা যেমন মাতেন তেমনি খরচ পত্রও করেন। ইহা ভিন্ন পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ,

বিবাহ, উপনয়ন চূড়া, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কার্য্যেও যাঁহার যেমন বিভব তিনি তদ্রূপ ব্যয় করিতেছেন। ইহা ব্যতীত কুটুম্বিতা রক্ষার্থ তত্ত্ব লওয়া। এব্যাপার প্রায় বৎসরের মধ্যে ৬।৭ বার করিতে হয়। বাঙ্গালী ভাগ্যবন্ত ব্যক্তির এক ২টি কন্যার বিবাহে যে ব্যয় হয় তাহাতে সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি অক্লেশে বড় দরের লোকের ন্যায় সংসার চালাইতে পারেন। এমন অসঙ্গত ব্যয় আর কোন জাতির দেখা বা শুনা যায় না। হিন্দুস্থানেও এই প্রকার নিয়ম। রাজপুতনায় যে ক্ষত্রিয়ের কন্যা হয় তিনি তাহাতে আপনাকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত করিতেন এখন তত নাই। পাইক পাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে রূপ মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করিয়াছিলেন ওরূপ শ্রাদ্ধ শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ বৈ ইংরেজাধিকারে আর কেহই করিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন লক্ষ, দুই লক্ষ, তিন লক্ষ টাকা অনেকেই ব্যয় করিয়া পিতৃ মাতৃর নিকটে অঋণী হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ক্রিয়ার কথা বলা গেল উহাতে কৃতজ্ঞতা ও পরোপকারিতা দুই আছে। দৈব ক্রিয়া গুলিতে যেমন কৃতজ্ঞতা ও পরোপকারিতা আছে পিতৃ কার্য্যেও ঠিক ঐ প্রকার দেখা যায়। কেবল আভ্যুদয়িক কার্য্যে কিছু কিছু পরোপকার আছে এইমাত্র। বঙ্গবাসী হিন্দুগণ মধ্যে অনেক মহাত্মা দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল আত্ম ও পরোপকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এরূপ দান কুমারিকা খণ্ডে বৈ পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নাই। এই বঙ্গরাজ্যে ইংরেজ রাজত্বে অদ্যাপি দেব সেবার্থ হিন্দুজাতি যে প্রকার ব্যয় বিধান করিতেছেন তাহাতে প্রত্যহ যে কত লোক আহার ও বেতন পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

নাটোরের মহারাজার ও বর্দ্ধমান আর দিনাজপুরের আর নদীয়ার মহারাজাদিগের ঠাকুর সেবা পূর্ব্বে যেরূপ হইত এখনও প্রায় সেইরূপ হইতেছে। এরূপ দেব সেবা বঙ্গে আর কুত্রাপি দেখা যায় না হেতু ইহা প্রথম শ্রেণী ভুক্ত এতদ্ভিন্ন জেওকাদিতে রাণী কাত্যায়নীর ঠাকুর সেবা আর কলিকাতা জানবাজার নিবাসিনী রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সেবার ও তৎকন্যা জগদম্বা দাসীর মণিরাম পুরের ঠাকুর বাড়ীর খরচের পারিপাট্যের অবধি নাই। তদ্ভিন্ন চাঁচড়ার রাজাদিগের ঠাকুর সেবায় যে কত লোকের নিত্য নিত্য উপকার হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এ সকল ঠাকুর সেবা দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত।

বঙ্গে আর অনেক ঠাকুর সেবা হইতেছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত অনবগত। সে সকল ঠাকুর সেবা তৃতীয় শ্রেণী

ভুক্ত। বঙ্গবাসী হিন্দু জাতির ঘরে ঘরে যে ঠাকুর সেবা হয় তাহাকে নিত্য সেবা বলে। এ সকল সেবা চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত। ঐ সকল সেবায় পূজকই প্রতিপালন হয়। যে সকল হিন্দুর বাড়ীতে দেব দেবীর সেবা নাই সে বাড়ীকে বাঙ্গালী হিন্দুরা শ্মশান বলিয়া বোধ করেন। এ নিমিত্ত নিত্য ঠাকুর সেবার এত বাহুল্য।

এখন বাঙ্গলার আতিথ্যের বিষয় সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। মহানগর ভিন্ন বঙ্গের প্রতি গ্রামের গৃহস্থ প্রকৃতি হিন্দুর বাটীতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুই প্রহরের মধ্যে যিনি অতিথি বলিয়া পরিচয় দিবেন তিনি সম্মান সহ সেই বাটীতে আহার পাইবেন। ২।১ জনের অধিক হইলে ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে যাইতে হয়। যাঁহাদিগের বাটীতে একযোগে ২০।৩০ জন অতিথি আহার পায় তাহাকে শতব্রত বলে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীরা যে প্রকার ভক্তির সহিত আতিথ্য করিতেন এখন কতিপয় কারণে সেরূপ আতিথ্য করা দেখা যায় না। শ্রীরামপুরের ৺ গোলোকচন্দ্র রায় এ প্রদেশে নিঃস্বার্থ ভাবে যে প্রকার আতিথ্য করিয়া গিয়াছেন ওরূপ আতিথ্য আর কোন বাঙ্গালী যে করিয়াছিলেন এরূপ দেখা বা শুনা যায় নাই। উক্ত রায় মহাশয়ের যে বিষয় বিভব অধিক ছিল এমত নহে। ইনি শ্রীরামপুরের দেনমার্ক গবর্ণরের প্রধান কার্য্যকর্ত্তা ছিলেন। বেতন একশত টাকার অধিক ছিল না। চুরিও করিতেন না অথচ প্রচুর আয় ছিল। ইনি অতিথিদিগকে ইচ্ছামত ভোজন সামগ্রী দিতেন। যিনি যাহা আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহাই দিতেন। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলেন। আমি ঐ শ্রীরামপুরের ৺ বাবু রমানাথ গোস্বামীর নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

চুঁচড়ার হালদার শ্রেষ্ঠ বাবু নীলমণি হালদার সদা সর্ব্বদা কলিকাতায়ই থাকিতেন। বাঙ্গালীতে নীলমণি হালদারের ন্যায় বাবু তৎকালে আর যে কেহ ছিলেন এ কথা শুনা যায় নাই। ইনি আপন পিতার বৈতরণীর কারণ ওজন করে করে চাউল ডাল লবণ তৈল ঘৃত চিনি ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য না দিয়া চুঁচড়ার নিকটস্থ ঝিঁক্‌রাপোতার গঞ্জ উৎসর্গ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য গরিব বাঙ্গালীদিগকে দান করিয়াছিলেন। এই তাঁহার একটি সামান্য বাবুয়ানার কথা জানাইলাম। সেই নীলমণি হালদার গোলোক রায়ের আতিথ্যের পরীক্ষা করা আবশ্যক এইরূপ মনে করিয়া হালদার বাবু আপন মোরসাহেব ও ইয়ার সকলকে ও নিজে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া অপরাহ্ণ বেলায় গোলোক রায়ের অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তখন উক্ত রায় মহাশয় শ্রীরাম-

পুরের গবর্ণর সাহেবের কাছারিতে আছেন। এখানে আগত অতিথি হালদার বাবুর ৫০।৬০ জন কৃত্রিম অতিথির আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অতিথিশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ অতিথিদিগকে মহাপুরুষ জ্ঞানে যথোপযুক্ত আদর করিতে লাগিলেন। এ দিকে রায় মহাশয় কাছারি বরখাস্ত করিয়া প্রথমে অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ৫০।৬০টী ভৈরব যেন কৈলাস হইতে উপস্থিত হইয়াছেন। নীলমণি বাবুকে কখন দেখেন নাই ও তাঁহার সহচরদিগকেও কখন নয়নগোচর করেন নাই। তথাপি অনুমানে বুঝিলেন ইহাঁরা প্রকৃত অতিথি নহেন। তাবতই বড় লোক। দেখা যাউক কি জন্য এ ভাবে আসিয়াছেন। এই মনে করিয়া সরকার ও দারোগা ও চাকর বাকরদিগকে বলিয়া দিলেন ইহাঁরা যাহা চাইবেন তাহাই দিবা। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া অতিথি প্রধান হালদার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার কথা বার্ত্তায় জানিলেন এ ব্যক্তি কেবল বড় মানুষ নহেন মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বভাষাভিজ্ঞ। নীলমণি বাবু বলিলেন রায় মহাশয় আমরা ইচ্ছাভোজী, আমরা অদ্য আম্র দিয়া ইলিস মাছের অম্ল খাইব। এখন ইলিস মাছ ও আম্রের নিতান্ত অসময়। আপনার পুণ্য প্রতাপে আর অতিথি ভক্তির জোরে মিলালেও মিলাইতে পারেন। এই জন্য আপনার নিকট আতিথ্য প্রার্থনা করা গিয়াছে। আমরা আর কিছুরই গ্রাহক নহি। প্রাতঃস্মরণীয় গোলোক রায় এই কথায় ভীত হইয়া নিজ ও আত্মীয় বড় মানুষদিগের নিকটস্থ সমুদায় বাগানে মশাল জ্বালাইয়া আম্র তল্লাস করিতে ২০ জন লোক নিযুক্ত করিলেন। এবং নিকটে জেলে পাড়ায় ইলিস মাছের জন্যও লোক পাঠাইলেন। এ দিকে অতিথিদিগের সায়ং সন্ধ্যার উদ্‌যোগ করিয়া দিয়া জল খাওয়ার আয়োজন করাইয়া আপনি অতিথি দিগের নিকট বিদায় লইয়া সন্ধ্যা করিতে গেলেন। বাটীতে গিয়া কাছারির পোষাক ছাড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন আজি বুঝি আমি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইলাম। তৎপর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন দুইজন জেলে ৪টি পেটোরকমের ইলিস মাছ আনিয়া রায় মহাশয়কে দেখাইল। রায় মহাশয় ঐ মাছ ৪টি দেখিয়া ইষ্ট দেবকে চিন্তা করিতে করিতে আহ্লাদে মোহিত হইলেন। জেলে দিগকে বলিলেন কালি প্রাতে আইস দাম ও পুরস্কার দিব। জেলেরা চলিয়া গেলে ঐ সময় চারি থোলো কাঁচা আঁব সহ খানসামারা বাগান হইতে আসিল। থোলো সহিত ৪০।৫০ টি কাঁছা আঁব দেখিয়া রায় মহাশয় ভাবিলেন আমার আতিথ্য এত দিনের পর আজি সফল হইল এবং আমিও কৃতকৃতার্থ হইলাম। আতিথ্যের যে এত ক্ষমতা তাহা জানিতাম না। তৎপর ঐ আম্র ও জ্যান্ত মাচ আর থোলো সমেত আম্র চাকর

দিগের দ্বারা অতিথিশালায় অতিথিদিগের নিকটে পাঠইয়া দিয়া সিধা পাঠাবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে অতিথিশালায় মাছ আর আঁব পৌছিলে অতিথিগণ উহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং ভাবিলেন গোলোক রায় ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ। তাহা না হইলে এ অসময়ে সামান্য চেষ্টায় অপ্রাপ্য বস্তু সকল হস্তগত হইল কেমন করে! এমন লোকের বাড়ীতে পাক করার আবশ্যক করে না গোলোকের প্রসাদ পাওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে সিধা সঙ্গে করিয়া রায় মহাশয় অতিথিদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে সুবক্তা নীলমণি বাবু বলিলেন আমরা আপনার প্রসাদের অতিথি। যেহেতু আপনি জাত্যংশে প্রধান ধার্ম্মিকতাতেও ঐরূপ আর যে মাছ আর আম্র সংগ্রহ করিয়াছেন ইহা পুরুষ মানুষে ভাল পাক করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ আমরা সন্ন্যাসী পাক শাকের তত এলাকা রাখিনা। এই কথা শুনিয়া রায় মহাশয় ঐ সকল দ্রব্য বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিয়া অতিথিদিগকে উত্তমরূপে জল খাওয়াইয়া আপনি বাটীতে গিয়া পরিবার দিগকে বলিলেন এই ইলিস মাছের অম্ল আর রুই মাছের ঝোল আর কৈ মাছ ভাজা কর। যেন অখ্যাতি না হয়। অতিথিরা ইলিস মাছের অম্ল খাইতে আমার বাটীতে আসিয়াছেন। আমি কথা বার্ত্তায় বুঝিয়াছি, উহাঁরা সকলি গুণবান্ দেখিতে অতিশয় শ্রীবান্ ও ধনবান্। ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। অতিথির পরিচয় লইতে নাই বলিয়া পরিচয় লই নাই। ফল কথা পাক যেন ভাল হয়। অধিক ব্যঞ্জনের প্রয়োজন নাই। ভাল ঘৃত আর ক্ষীর ও মাখন আনিতে লোক পাঠাইতেছি। নিরামিষ ব্যঞ্জনেও সেই ঘৃত দিবা। এই সকল কথা বলিয়া অতিথিশালায় গিয়া বলিলেন আপনারা আমার গৃহ পবিত্রার্থ বাটীতে চলুন। সেই খানে বসিবার স্থান আছে এখানে আর থাকা ভাল দেখায় না। একটি কথা নিবেদন করি আপনাদিগের নেয়ে মাঝি কত জন তাহারা সিধা লইয়া যাউক ইহাতে প্রধান অতিথি বলিলেন, মহাশয়! আব খোরাকী ফুরান ঠিকা নৌকায় আশা গিয়াছে। আপনার সহিত আমাদিগের পেট ফুরান। নীলমণি বাবুর এই সকল কথায় রায় মহাশয় হাঁসিয়া বলিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর আপনিত হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও আচারও জানেন কোন্ সাধক দ্বারদেবতা ও আবরণ দেবতা ও বাহনাদি পূজা না করিয়া মূল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন? আপনারা অদ্য আমার পূজনীয় মূল দেবতা। আপনাদিগের বাহক ও দ্বার দেবতাদিগকে পূজা না করিলে মূল পূজা সিদ্ধ হইবে না। তৎপর নীলমণি বাবু নেয়ে মাঝি আর দ্বারবানদিগকে ডেকে পাঠাইলে তখন

প্রকাশ পাইল। চুঁচড়ার বাবু নীলমণি হালদার আর কলিকাতাস্থ বড় বড় লোক যাঁহারা নীলমণি বাবুর অতি প্রিয়বন্ধু তাহারাই সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়াছেন। গোকুল রায় এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যাঁহাকে বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর নিমন্ত্রণ করিয়াও বর্দ্ধমানে লইয়া যাইতে পারেন নাই আজি সেই নীলমণি বাবু আমার অতিথিশালায় গড়াগড়ি যাচ্চেন। আমার কি সৌভাগ্য!' যাহা হউক আজি মনের সাধে মেয়েরা নীলমণি বাবুকে দেখে নিউক। নীলমণি বাবুর যেমন রূপ তেমনি গুণ। আজি চক্ষুঃ কর্ণের স্বার্থকতা করিয়া লই। নীলমণি বাবুর ন্যায় রূপে গুণে দানে মানে বাঙ্গালি বাবু প্রায় দেখা যায় না। ধনে যেমন ধনবান্ দানেও তেমনি দাতা। এবং ব্রাহ্মণ্যে ততোধিক। ইনি যে প্রকার ক্রিয়াবান্ তেমনি জ্ঞানী বিদ্বান্। ভাগ্যবন্ত ব্যক্তিতে এতাধিক সদ্‌গুণের সমাবেশ কেবল ইহাতে দেখিতে পাইলাম। এখন নারায়ণের কৃপায় ইহাঁকে তৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতে পারিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে সম্বাদ আসিল যে তাবৎ প্রস্তুত। মধ্য বাটীর বড় ঘরে আহারের স্থান হইল। ৫০।৬০ খানি গালিচার আসন আর ৬০ খানি বড় কাঁশার থাল ৬০টি গেলাস আর এক এক খানি রেকাবে কাঁচাগোল্লা আর উত্তম পিষ্টক আর প্রত্যেককে এক একটি রূপার বাটীতে পায়স। আর প্রত্যেক পাতের নিকট ৫টি করিয়া কাঁশার বাটীতে ব্যঞ্জন এক এক পাথরের বাটীতে মাছের অম্ল। অন্ন পরিবেশন হইলে তাহাতে সদ্যোজাত গোঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে সকলকে দেওয়া হইলে পাতিনেবুও দেওয়া হইল। তাবতি ব্রাহ্মণ; আচমন করিয়া যথাবিধানে সকলেই আহার করিতে বসিয়া নানাবিধ শাস্ত্রালাপের পর নীলমণি বাবু নিজেই খোসগল্প করিতে লাগিলেন। নীলমণি বাবু এমনি সুবক্তা ছিলেন যে বড় বড় কথক ঠাকুর তাঁহার নিকটে কথা কহিতে ভীত হইতেন। বক্তৃতাশক্তি তাঁহার এমনি ছিল যে তাহা শুনিয়া খ্যাতাপন্ন উকীলেরা বিমোহিত হইতেন। গান বাদ্যেও ওস্তাদ ছিলেন।

গুণসাগর নীলমণি বাবুর অসাধারণ যে সকল গুণ ছিল তাহার মধ্যে তিনি দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানে এক জন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। জর্ম্ম্যাণ সিলবরের ন্যায় রূপা তৈয়ার করত তদ্দ্বারা নানাপ্রকার চাঁদির বাসন তৈয়ার করিতেন। তাঁহার কৃত চাঁদির তিনি রূপদস্তা নাম দিয়াছিলেন। এখনকার রূপদস্তার জিনিস পত্র নামে রূপদস্তা। প্রকৃতপক্ষে তাহা দস্তা। আসল রূপদস্তা চাঁদির সমকক্ষ। যাহাহউক নীলমণি বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণ শ্রীরামপুরে অতিথি হইয়া পরমাপ্যায়িত হইয়া রায় মহাশয়ের নিকটে সেই রাত্রেই

বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। গোলুকচন্দ্র রায়ের ন্যায় আতিথ্য আর যে কেহ করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায় নাই। কিন্তু শুনা গিয়াছে নাটোরেশ্বরী মহারাণী ভবানী ঠাকুরাণীও নাটোরে ও বড় নগরের বাটীতে যে প্রকার আতিথ্য করিতেন সেরূপ আতিথ্য অন্যে কেহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় বড় নগরের গঙ্গা বাসের বাটীতে প্রত্যহ পঞ্চ সহস্র নাগা সন্ন্যাসী সকল ইচ্ছামত ভোজন পাইত। তদ্ভিন্ন অন্য রকম দণ্ডী পরম হংস অবধূত ব্রহ্মচারী গৃহস্থ অতিথিও যত আসিতেন সকলেই ইচ্ছামত ভোজন পাইতেন। ইহাঁর কথা স্বতন্ত্র। ইনি কাশীতে অন্ন দান দ্বারা অন্নপূর্ণা খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরদিগের দান কেবল পরোপকারার্থ। ইহাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভার্থ দান করেন নাই। ইহাঁদিগের পর আর যে সকল লোক আতিথ্য করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার মধ্যে লোক দেখান অতিথিশালাও আছে। যাহাই হউক। তাহাতেও দেশের উপকার হইতেছে। সৎকর্ম্মের কাচও ভাল। ইদানী এই কলিকাতা মহানগরীতে চোরবাগান বাসী বণিকাগ্রগণ্য মহামান্য রাজা রাজেন্দ্রলাল বাহাদুরের বাটীতেও প্রত্যহ ৩।৪ শত সংখ্যক অন্নার্থী উত্তম রূপ আহার পাওয়ায় ধনের স্বার্থকতা ও হিন্দু কুলের মুখোজ্জল হইতেছে। ইহাতেও যে ইনি যমদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য। সেকালে সংস্কৃত বিদ্যা দানার্থ হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ অধ্যাপকদিগকে নগদ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই এই প্রকাণ্ড বঙ্গ রাজ্যে এতাধিক সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ছিল যে মৈথিল দ্রাবিড় দেশীয় সংস্কৃত বিদ্যার্থী সকল নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া ন্যায় স্মৃতি অধ্যয়ন করত কৃতবিদ্য হইয়া দেশে যাইতেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানদিগের ব্যাকরণ অভিধান ও কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষার্থ প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ২।৪ খানি বা ততোধিক করিয়া চতুষ্পাঠী থাকিত। ইহাতে বাঙ্গালায় অধিক পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। এখন সেই বাঙ্গালার হিন্দু মহাশয়গণ বিলাতের মোক্ষমূলার সাহেবের আর অল্‌কট সাহেবের নিকটে সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিলে দেশীয় পণ্ডিতদিগের কৃত ব্যাখ্যা বুঝিতে পারেন না।

এখন এমনি সময় উপস্থিত যে কামারের নিকটে গিয়া কুমারের ব্যবসা শিক্ষিতে হইতেছে। কালের এমনি ক্ষমতা যে, যে দেশের মাতৃভাষা দেবভাষা ছিল। এখন সেই দেশে ম্লেচ্ছ ভাষা মাতৃভাষা হইবার উপক্রম হইতে চলিল। সামান্য চিঠী পত্র লিখিতে হইলে ম্লেচ্ছ ভাষা ও ম্লেচ্ছ অক্ষর ব্যবহার করিতে হইতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও

ঈশ্বরারাধনা সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। পুরাতন হিন্দুগণ নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরোপাসনা আর পরোপকার করায় অসভ্যতা ও মূর্খতাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখন দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ ম্লেচ্ছানুকরণে ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার করিতেছেন। হিন্দু শাস্ত্রে এ সকল ব্যাপারকে শুদ্ধ তামসিক ব্যাপার বলে।

এখন নিঃস্বার্থ অন্য প্রকার দানের কতিপয় উদাহরণ দেখান যাইতেছে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা আর যশোহর জেলার অন্তঃপাতি টাকী আর কস্‌বা নিবাসী চিরস্মরণীয় রায় কালীনাথ চৌধুরী আর কালীকুমার পোদ্দারেরদিগের প্রদত্ত দেশ দেশান্তর ব্যাপী অতি প্রশস্ত পরিপাটী রাজমার্গ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কত শত ব্যক্তি যে কত শত সহস্র জলাশয় পান্থশালা নদী খাল প্রভৃতিতে সংক্রমণ বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি কার্য্যে নিঃস্বার্থ রূপে যে কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাহার নির্ণয় হয় না। অতঃপর নৈমিত্তিক আর কাম্য কর্ম্মে যে কত অর্থ ব্যয় হয় তাহা অপরিসীম। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, কাশীখণ্ড প্রভৃতি মহাপুরাণে ও পুরাণে ও স্ত্রীলোকদিগের ব্রত নিয়মে ও তীর্থ যাত্রায়ও ততোধিক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হইতেছে। হিন্দু জাতির যে সকল ক্রিয়ায় কথা বলা গেল এ সকল কার্য্যের মধ্যে গরিব দুঃখী প্রতিপালনে অধিক অর্থ সামর্থ্য ব্যয় হইয়া থাকে। হিন্দুজাতির মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ জাতিই গরিব। এ জন্য সকল কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে দান করার বিধান আছে। যাঁহারা অগরিব তাঁহারা বাবু। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনে কালকূট বিষ উঠিলে তাহার বিশ্রাম স্থান দেবদেব মহাদেব বৈ আর কেহই হইতে পারে নাই। তেমনি সৃষ্টিকালে সকল পদার্থ সৃজনের পর দুঃখ ও দরিদ্রতা সৃষ্টি হইলে তাহারা কুত্রাপি স্থান না পাইলে পর মানবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঐ দুই পদার্থকে অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে দুঃখ দরিদ্রতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। লোকে ব্রাহ্মণগণকে যে স্বার্থপর বলেন সেটি নিতান্তই কুসংস্কারের ধর্ম্ম বৈ আর কিছুই নহে। সম্প্রতি ম্লেচ্ছরাজ্যে ম্লেচ্ছাচার প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব হওয়ায় ব্রাহ্মণে স্বার্থপরতাদি দোষ দর্শাইতে পারা যাইতেছে। প্রবল কলিতে ব্রাহ্মণে যে স্বার্থপরতাদি দোষ জন্মিয়াছে একথা দেবগুরু শিবও বলিয়াছেন। শিববাক্য। অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণঃ ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নশ্রৌতবর্ত্মনা॥ তারাপ্রদীপ। তারা প্রদীপ বলেন কলি অর্থাৎ প্রবল কলিকালের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকর্ম্মী হেতু অপবিত্র। ইহারা কেবল আগমোক্ত ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। নতুবা শ্রুতি প্রভৃতি সম্মত ক্রিয়ায় কোন ফল লাভ করিতে পারিবেন না।

পাঠকবৃন্দকে এ সম্বন্ধে নূতন রকমের আর একটি শিববাক্য জানাইতেছি। যথা। নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতিজাতীয়া বিষহীনোরগাইব। পাঞ্চালিকা যথাভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিতাঃ॥ সত্যাদৌসফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব। অমরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥ ইংরেজি ভাষায় ডেড্‌লেটর নামে যেমন প্রসিদ্ধ বাক্য আছে তন্ত্র শাস্ত্রেও ঠিক তেমনি মৃতকা অর্থাৎ মরা কথাও আছে। সেই মরা কথা এই প্রবল কলিযুগে বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত বাক্যই হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল কথা সত্য ত্রেতা দ্বাপরে জীবন্ত ছিল। এখন আগমোক্ত বাক্যই সজীব ও ফলপ্রদ। অপর প্রবল কলিতে বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ শাস্ত্র সকল কাল মাহাত্ম্যে বীর্য্যহীন ও বিষরহিত সর্পের ন্যায় ক্ষমতাশূন্য ও তেজঃ বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল শাস্ত্র সজীব ও সক্ষম থাকিলে ব্রাহ্মণের আর বৈদিকাদি ক্রিয়া কলাপের প্রতি কেহই দোষারোপ পুর্ব্বক নিন্দা করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থার প্রকৃত কারণ কেবল তন্ত্র শাস্ত্র না জানা আর বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র সকল নিত্য ও অপরিবর্ত্তন্‌শীল এইরূপ কুসংস্কারের নিতান্ত বাধ্য হওয়া। বেদ যে নিত্য পদার্থ তাহাও সত্য বটে। কিন্তু ঐ বেদ যুগ পরিবর্ত্তনে শ্রুতি স্মৃতির ও পুরাণের আকার ধারণ করেন। যেমন দ্বাপর যুগের জন্য পুরাণরূপ ধারণ করত ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। কলি ও প্রবল কলিতে আবার আগম ও তন্ত্র যামল ডামর রূপ ধারণ করেন ইহা কেহই মনে মনে একবারও চিন্তা করেন না। এতদ্ভিন্ন আর কোন কারণ উপলব্ধি হয় না।

এক প্রসঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় পাঠক বর্গকে বিরক্ত করা হইল। কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

পূজা যাত্রা ও শ্রাদ্ধ দ্বারা বাঙ্গালি প্রকৃত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা আর পরোপকারিতা দেখান গিয়াছে। তৎপর আতিথ্যে ও পথ ঘাট বন্ধনে আর জলাশয় দানে আর তীর্থ যাত্রায় ও ছেলে মেয়ের বিবাহে ও অন্যান্য সংস্কারে আর পুরাণাদি প্রতিষ্ঠায় কেবল পরোপকার দেখান গিয়াছে। ইহা ভিন্ন বিদ্যা দানে পরোপকারিতার যেমন প্রবল দৃষ্টান্ত এমন আর কিছুতেই দেখা যায়না এই বিদ্যাদান এখন পাশ্চাত্য নিয়মে প্রবল হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। এইসঙ্গে কর্ম্ম কাণ্ডেরও সেই রূপ আকার হইয়াছে।

এখন বাঙ্গালির রাজভক্তির স্থূল বৃত্তান্ত কিছু লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

এই বিশাল বঙ্গরাজ্য চিরকালই রাজপরতন্ত্র। রাজাই এ রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এ রাজ্য অরাজকতা ভাবে কখন শাশিত হয় নাই। অরাজকতাকে বাঙ্গালি হিন্দুরা অতিশয় অমঙ্গলের হেতু বলিয়া জানেন। বাঙ্গালিরা অদ্যাপি

রাজাকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হুতাশন কুবের ও যম বলিয়া মানিতেছেন। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, এক রাজ শরীরে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবের ও দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতির অংশ থাকায় রাজাই পরমারাধ্য দেবতার স্বরূপ হয়েন। রাজাকে অবজ্ঞা করিলে রাজ্য বিপর্য্যয় ও মহাপাপ হয়। যাগ কর যজ্ঞ কর জপ কর তপঃ কর সকলেরি পুণ্যাংশ রাজাতে বর্ত্তিয়া থাকে। আবার রাজার পাপে রাজ্য ধ্বস ও রাজার পুণ্যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এক রাজা হইয়া কোটি কোটি প্রজার ধন মান জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

যথার্থ হিন্দু আর মুসলমানেরা রাজাকে যেমন দৈবশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর বলিয়া মানেন, রাজারাও তেমনি প্রজা পুঞ্জকে ঔরসপুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। প্রজাবর্গকে পণ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত বোধ করা ছিলনা। বিশেষত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হিন্দু রাজা সকল যে প্রকার প্রজা পালনের ও রাজ্য রক্ষার নিয়ম প্রতি পালন করিতেন, এরূপ অন্য কোন জাতি করিতে পারেন নাই ও ভবিষ্যতে যে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা আর্য্য রাজনীতি সমগ্র জানেন তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে মনুক্তিকে কদুক্তি না বলিয়া সদুক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন।

রাজা হওয়া সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের এইরূপ সংস্কার যে ভ্রষ্ট যোগী আর আউলিয়া ফকির সকল বহুকষ্ট করেন বলিয়া জগদীশ্বর উঁহাদিগকে রাজ্যেশ্বর করিয়া দেন। রাজা ও বাদসা হওয়া বিস্তর তপস্যার কর্ম্ম। বিনা তপস্যায় বা পুণ্যে কেহই রাজা বাদসা হইতে পারে না। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া বাঙ্গালি হিন্দু প্রজারা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে প্রজারা এক দিনের জন্য অসুখী নন। তবে যে দুই একটি রাজপ্রতিনিধির দোষে প্রজাপীড়ন হইয়া গিয়াছে তাহাও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। এইরূপ না ঘটিলে অন্যের অভ্যুদয় হয় না বলিয়া জগদীশ্বর অবিমৃষ্যকারী রাজ প্রতিনিধির হাতে বঙ্গরাজ্য বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বঙ্গের প্রজা সকল এমনি উদার চরিত্র রাজভক্ত যে তাঁহারা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইব বলিয়া ডাইনির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ডাইন কর্ত্তৃক শোণিত শোষণ হইতে দেখিয়াও ডাইনিকেও প্রকৃত মানব বলিয়া বোধ করেন না। ইঁহারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে পিশিতাশনা ডাইনিরাও কোম সময়ে দয়াপরতন্ত্র হইয়া শোণিত পান পরিত্যাগ করিবে। যদি তাহা না ঘটে তবে যাহার কৃপায় নিরীহ নরশোণিত পান করা হইতেছে, তিনিই আবার তাঁহাদিগের শোণিত পান ও মাংস চর্ব্বণ করিবেন।' ইহা ভিন্ন আরও মনে করিতেছেন যে যে অর্জ্জুন গাণ্ডীব-ধ্বনিতে ত্রৈলোক্য কম্পিত করিয়াছি-

লেন শেষে সেই অর্জ্জুন গাণ্ডীব বহন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। অতএব সহ্য করাই ভাল। এইক্ষণ অতীত বঙ্গেশ্বর দিগের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই বঙ্গবাসী প্রজাকগণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন। এবং প্রজারাও যাঁহাদিগকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতেন।

অনুমান ২৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গরাজ্যের মধ্যস্থলে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম পারে একটি রাজনগর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে যিনি রাজধানী সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন তাঁহাকেই বাঙ্গলার আদি রাজা মনে করিয়া আইন আকব্বরী যে বাঙ্গালার রাজাবলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধে ঠিক তাহারি অনুরূপ একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১।	ভোজ গৌর ইনি নির্ব্বিবাদে ৭৫ বৎসর রাজ্য করেন। ও গৌড় নগর পত্তন করেন।	
২।	লাল সেন ইনিও ঐরূপে ৭০ বৎসর রাজত্ব করেন।	
৩।	রাজা মাধব	৫৭ বৎসর
৪।	সামন্ত ভোজ	৪৮ বৎসর
৫।	জীনৎ	৬০ বৎসর
৬।	পৃথু	৫২ বৎসর
৭।	গরার	৪৫ বৎসর
৮।	লক্ষ্মণ	৫০ বৎসর
৯।	নন্দ ভোজ	৫৩ বৎসর

অতঃপর সুরবংশীয় একাদশ সম্রাট সপ্তশত চতুর্দ্দশ বর্ষ যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহার তালিকা।

১।	আদিত্য সুর ...	৭৫ বৎসর
২।	যামিনীভান ...	৭৩ বৎসর
৩।	অনিরুদ্র	৭৮ বৎসর
৪।	প্রতাপরুদ্র ...	৬৫ বৎসর
৫।	ভূদত্ত	৬৯ বৎসর
৬।	রঘুদেব	৬২ বৎসর
৭।	গিরিধর	৮০ বৎসর
৮।	পৃথীধর	৬৮ বৎসর
৯।	সৃষ্টিধর	৫৮ বৎসর
১০।	প্রভাকর ...	৬৩ বৎসর
১১।	জয়ধর	২৩ বৎসর
		৭১৪ বৎসর

অতঃপর পাল বংশীয় দশ জন নৃপতিতে এই বঙ্গ দেশে ছয় শত অষ্টনবতি বৎসর যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহার তালিকা।

১।	ভূপাল	৭৫ বৎসর
২।	ধীরপাল	৯৫ বৎসর
৩।	দেবপাল	৮৩ বৎসর
৪।	ভূপতি পাল ...	৭০ বৎসর
৫।	ধনপতি পাল ...	৪৫ বৎসর
৬।	বিগ্রপাল	৭৫ বৎসর
৭।	জয়পাল	৯৮ বৎসর
৮।	রাজ পাল	৯৮ বৎসর
৯।	ফোগ পাল	৫ বৎসর
১০।	জগ পাল	৭৪ বৎসর
		৬৯৮ বৎসর

অতঃপর বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ সেন বংশীয় সপ্ত নৃপতির তালিকা।

১।	শুক সেন	৩ বৎসর
২।	বল্লাল সেন ...	৫০ বৎসর
৩।	লক্ষণ সেন	৭ বৎসর,
৪।	মাধব সেন	১০ বৎসর
৫।	কেশব সেন ...	১৫ বৎসর
৬।	সদা সেন	১৮ বৎসর
৭।	নবজী সেন ...	৩ বৎসর,
		১০৬ বৎসর

মুসলমান ও ইংরেজ রাজ প্রতিনিধিদিগের তালিকা পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে, যে সকল হিন্দু রাজাদিগের নামের তালিকা দেওয়া গেল, ইঁহারা বাঙ্গলার প্রজাগণকে যে প্রকারে প্রতিপালন করিয়া, গিয়াছেন তাহা এখন উপন্যাস হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য আধুনিক ইতিহাস লেখকেরা পুরাতন হিন্দু রাজাদিগের বৃত্তান্ত কোন ইতিহাসে লেখেন নাই। এখন প্রসঙ্গতঃ এই প্রবন্ধে তাহার কতিপয় শাসন বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

ভূমী সম্পত্তির কর ছিল না। তৎকালে চাসী প্রজা বৈ অন্য কোন রকম প্রজা যাহা ছিল তাঁহারা চৌধুরী ও ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর ভোগী। চাসী প্রজারা যে যে দ্রব্য উৎপন্ন করিতেন সেই উৎপন্ন দ্রব্যের ভূমি বিশেষে কোন কোন স্থানে রাজা অষ্টমাংশ কোন স্থানে দশমাংশ কোন স্থানে দ্বাদশাংশ গ্রহণ করিতেন। ধুর পরিমাণে চৌধুরী দিগের নিকট হইতে মুদ্রা লওয়া হইত ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমির কর গ্রহণ করা হইত না। এতদ্ভিন্ন জলাশয়ের ও গোচারণ স্থানের আর শ্মশান ভূমির ও গোভাগাড়ের ও বিদ্যালয়ের কর লওয়া হইত না। এমন কি জমির মাপ পর্য্যন্ত ছিল না। আকবর বাদসার আমল হইতে জমির মাপ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা তোড়র মলই সরিবের কর্ত্তা ছিলেন (তৎপূর্ব্বে ফসলের পরিমাণ বৈ জমির পরিমাণ করার রীতি ছিল না। ইষ্ট্যাম্পের কি অন্য রকমের আয় ছিল না। আদালত ফৌজদারী পুলিস ও কালেক্টরি আর সৈন্যের খরচ রাজা নিজেই দিতেন বলিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থে চাকরান ভূসম্পত্তি দেয়া হইত এই সকল ব্যয়ের নিমিত্ত প্রজাদিগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলনা। তথাপি প্রজার ঘরে চুরি হইলে সেই চুরির দ্রব্য চোর হইতে আদায় করিয়া দিতে না পারিলে গৃহস্থকে নিজ হইতে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য দিতেন। হিন্দু রাজারা প্রজাপুঞ্জ কিসে ধার্ম্মিকতা বজায় রাখে, আর হা অন্ন হা অন্ন করিয়া না বেড়ায় তাহারি চেষ্টা পাইতেন। প্রজারাও স্ব স্ব শ্রেণীর উপযুক্ত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। যাঁহার যে ব্যবসা ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে তিনি তাহার কোন মতে ব্যতিক্রম করিতেন না। এত গুলি হিন্দুজাতি ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া

গিয়াছেন ইহার, কোন আমলে প্রজা বিদ্রোহ যে হইয়াছিল এমন কথা কোন ইতিহাসলেখক লেখেন নাই।

ক্রমাগত ৩৭। ৩৮ জন রাজার আমলে ১৫। ১৬ শত বৎসরের মধ্যে যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই ইহাই রাজ ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রাজার বা রাজ কর্ম্মচারীর দোষে প্রজা বিদ্রোহী হয়। নচেৎ প্রজা বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই। এবং প্রজার দোষেও কখন কখন রাজ বিদ্রোহ হয়। উল্লিখিত হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব কালে না হইয়াছিল রাজবিদ্রোহ না হইয়াছিল প্রজাবিদ্রোহ ইহার কিছুই হয় নাই। ইহাতেও বাঙ্গালির রাজভক্তির প্রমাণ বিজ্ঞান হইতে পারে। এমন যে সিপাই বিদ্রোহ গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালিরা বিদ্রোহ নিবারণের নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক যত্ন পাইয়াছিলেন। সে সময় বাঙ্গালিরা বিদ্রোহীদিগের পক্ষ হইলে কলিকাতা রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন হইত। বাঙ্গালির দৈহিক বল নাই সত্য কিন্তু ধীষণার বল অত্যন্ত প্রবল। বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতোবলং।

মুসলমান রাজত্ব কালে কএক বার বাঙ্গালি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন সত্য ইংরেজদিগকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালিরা করিয়াছেন বলিয়া ইংরেজের অপকার করিতে ভাল বাসেন না। বিষবৃক্ষোঽপি সংরোপ্য স্বয়ং ছেদ্যমসঙ্গতং।

পরোপকার পক্ষে বাঙ্গালিদিগের এইরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে বাঙ্গালি স্বহস্তে বিষ বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাকে আর ছেদন করেন না। আর আর বৃক্ষের ত কথাই নাই। এই এক কারণ অপর কারণ এই—"অদ্যাপি নো হ্যতি হরঃ কিল কালকূটং কূর্ম্মো বিধর্ত্তিধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন। অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি মঙ্গীকৃতঃ সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি" ॥

সুকৃতি বাঙ্গালিরা যাহা একবার অঙ্গীকার করেন তাহা চিরদিনই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মহা অপরাধ বোধ করেন। যে হেতু শিব কালকূট বিষ পান করিয়া বমন করিয়া ফেলেন নাই অদ্যাপি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কূর্ম্ম দেব সমুদ্র মন্থন কালে আপন পৃষ্ঠ দ্বারা ধরণীকে বহন করিয়াছিলেন বলিয়া আজও ধারণ করিতেছেন এক দিনের জন্য বিরক্ত হন নাই। ইহা বৈ জলনিধি দুর্ব্বিসহ বাড়বাগ্নিকেও চিরদিন স্বকীয় হৃদয়ে স্থান দিয়া আর পরিত্যাগ করেন নাই। এই কবিতাটি হিন্দু নীতির ভিত্তি!

এমন সরল হৃদয় হিন্দু জাতি যে রাজ ভক্ত হইবেন না ইহা কি সম্ভব! তবে উচ্চ রকমের পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার ফলেকি যে ঘটিবে তাহা ভগবান নারায়ণের চিত্তে বিরাজ করিতেছে ইতি।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

শ্রীপঞ্চমী।*

১

আয়রে ভারতীরাণি আয়রে জননি!
আবার বরষ পরে, আবার হরষ ভরে
আবার পূজিব তোর রাঙ্গা পা দুখানি।
অদম্য উৎসাহে সেই, আবার এসেছি এই
ভুলিয়া সে বুকভরা শোক তাপ গ্লানি।
এ নহে একটী দুটী, এই দেখ কোটি কোটি,
মিলিয়াছি ভাই ভাই দেখ বীণাপাণি,
কোটি হস্তে অই পায়, অর্পিব অঞ্জলি হায়
ছিঁড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ শশী দিনমণি,
কোটি বজ্রে গরজিয়া, কোটি কণ্ঠে হুঙ্কারিয়া
কাঁপায়ে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব আকাশ অবনী,
আনন্দে গাইব "জয় ভারতী জননী!"

২

মা!
যদিও ভারত পুড়ে গেছে কালানল,
যে দিকে—যে দিকে চাই, ভূত ভবিষ্যত নাই
সম্মুখ পশ্চাৎ ভরা শ্মশানই কেবল।
সুন্দর নগর গ্রাম, শান্তিময় সুখ ধাম
পরিপূর্ণ করিয়াছে শোক কোলাহল,
যদিও সে ভস্মাভস্ম, নাহি তার কোন চিহ্ন
প্রাণ প্রিয় পরিবার পুড়েছে সকল,
যদিও মলিন মুখে, সেই ভস্মমাখা বুকে
মুছিতে পারিনি হায় শোক অশ্রুজল।
তবু চিত্ত নহে নত, তবু মা আহ্লাদ কত
পূজিতে জননি তোর চরণ কমল!
সেই শ্রদ্ধা সেই ভক্তি তেমনি অটল।

৩

মা! যদিও——
বিদীর্ণ ভারত বক্ষ ঘোর ভূকম্পনে,
যদিও গিয়াছে ফাটি, সর্ব্বংসহা নরা মাটী
হৃদয়ে অনল সিন্ধু মত্ত আস্ফালনে,
যদিও সে হাহুতাশে, সুদীর্ঘ—সধূমশ্বাসে
উড়িয়াছে ছাই ভস্ম গগনে গগনে,
কর্দ্দমে নরক মলা, পরিপূর্ণ গলা গলা
বাহিরিছে পরিতাপ উষ্ণ প্রস্রবণে
যে বিষাক্ত অবসাদে, লুকাইয়া প্রাণ কাঁদে
যদিও ফুটেছে তাহা গভীর গর্জ্জনে,
তথাপি আনন্দময়ি! আনন্দে উন্মত্ত হই
অর্পিতে অঞ্জলি তব কমল চরণে,
সেই শ্রদ্ধা সেই ভক্তি তেমনি মা মনে!

৪

মা!
এখনো তেমনি ভক্তি হৃদয়ে প্রবল,
ভাসায়ে ভারত যদি, যুগে যুগে নিরবধি
গর্জ্জিয়াছে ঘন ঘন কাল সিন্ধু জল,
জননী কোলের ছেলে, অবশে দিয়েছে ফেলে
হারায়েছে প্রিয়পতি কণ্ঠের কমল!
রাখিয়া প্রাণের ভাই, স্নেহের ভগিনী নাই
ভাসিয়া গিয়াছে আহা নরনারী দল!
শোক দুঃখে মূর্চ্ছাপন্ন, যদিও তাদের জন্য
প্রাণের ভিতরে প্রাণ জ্বলে অবিরল,
তবু চিত্ত উন্মাদিত, আহ্লাদে হৃদয় স্ফীত
পূজিতে জননি তোর চরণ কমল,
এখনো তেমনি ভক্তি হৃদয়ে প্রবল!

* ময়মনসিংহ সারস্বত উৎসবে পঠিত।

৫

মা !

এই যে এত যে দুঃখে জলে প্রাণ মন
সারাদিনে একমুটি, নাহি মিলে ভিক্ষা
দুটী
দুঃখের উপরে দুঃখ নিত্য অনশন !
কোথা সে আফগান সীমা, এজনমে
দেখিনি মা
ভারতের রক্ত চিহ্নে করে নির্দ্ধারণ !
ভারতেরি হাড়ে হাড়ে, উন্নত পর্ব্বতা-
কারে
দুর্ভেদ্য হিরাট দুর্গ করিল গঠন !
ভারতের বুকচিরা, লইয়া ধমনী শিরা
শৃঙ্খলিয়া শ্বেতহস্তী করিল বন্ধন !
এই যে মা বুকভরা, কালানল ধূ ধূ করা
চাপিয়া রেখেছি বিন্ধ্য করি আচ্ছাদন,
তবু মা আহ্লাদে মাতি, প্রাণশূন্য মৃত-
জাতি
নীরক্ত হৃদয়ে হয় রক্ত সঞ্চালন,
পূজিতে জননি তোর কমল চরণ !

৬

এই দেখ জননিরে তোর আগমনে,
যুগ যুগান্তের মরা, শুদ্ধ রক্ত শিরাভরা
জেগেছে ভারত আজ নবীন জীবনে !
প্রাণভরা আহা উহু, তবু পিক ডাকে কুহু
ফুটেছে কুসম ফুল কাননে কাননে !
ভুলিয়া সে হায় হায়, মলয় বহিয়া যায়
কহিয়া তোমার বার্ত্তা প্রতি জনে জনে !
কি যেন উল্লাসে মাতি, এ পতিত মৃত-
জাতি
জেগেছে মোক্ষদা মূর্ত্তি নিমিখি নয়নে,
অর্পিতে অঞ্জলি তব কমল চরণে !

৭

মা !

জাগে না ভারত আর এমন আশ্বাসে,
অচৈতন্য সংজ্ঞাহীন, মৃত প্রাণে কোন দিন
এমন জীবনী শক্তি আর নাহি আসে,
বহেনা কখনো আর, মৃত বক্ষে এপ্রকার
অমর অমৃত গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
কি জানি উড়ায়ে আনে, কি জানি গো
লাগে প্রাণে
তোমার চরণ স্পর্শে বসন্ত বাতাসে,
কি জানি ভারত জাগে আশা অভিলাষে।

৮

মা ! এদগ্ধ শ্মশান দেশে—
নাহি শোভে অন্য মূর্ত্তি অন্য দেবতার,
বিনা অই বীণাপাণি, সরোজ আসন খানি
জ্ঞানদা মোক্ষদা মূর্ত্তি জননি তোমার !
বিনা ও বীণার গানে, মৃতসঞ্জীবনী তানে
হয় না এ ছাই ভস্মে জীবন সঞ্চার,
স্বাধীনতা অনুরাগে, জাতীয়তা নাহি জাগে
জ্বলন্ত জীবন্ত জ্যোতি স্নেহ মমতার।
মিশেনা মা ছাই ছাই, মিশেনা মা ভাই
ভাই
পরস্পর ভিন্নভাব ঘোচেনা কাহার,
কি জানি কি সর্ব্বনাশে, কেহ কাঁদে
কেহ হাসে
নয়নে লাগিয়া থাকে বিষাক্ত আঁধার !

৯

মা !

না পূজিলে ও চরণ বোঝে সাধ্য কার,
জননী জনম ভূমি, ভারত ভারতী তুমি
জ্ঞানদা মোক্ষদা মূর্ত্তি প্রতিমা তোমার
বিনা ও বীণার গানে, মৃত সঞ্জীবনী
তানে
এ পতিত মৃত জাতি হবে না উদ্ধার।
তাই মা ভারত পুজে, এশ্মশানে শেত
ভুজে
প্রাণভরা শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে উপহার.
জ্ঞানময়ী মহামূর্ত্তি জননি তোমায় !

১০

মা !

মায়ের হৃদয় নিয়া, দেবতার চক্ষু দিয়া
দেখ্‌রে ভারত চেয়ে দেখ্ এক বার,
দেখ্ এ শ্মশান ক্ষেত্রে, অমর অমৃত নেত্রে
বরষিয়া এক বিন্দু সুধার আসার।
আবার বাঁচিয়া উঠি, মরা ভাই কোটি
কোটি
আবার তেমনি ছুটি ছাড়িয়া হুঙ্কার,
সাগর উঠুক কেঁপে, ধরণী উঠুক কেঁপে
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ভয়ে পর্ব্বত পাহাড় !
দেখ্ মা ভারত চেয়ে দেখ্ এক বার !

১১

দেখ্‌রে ভারত চেয়ে ভারতী জননী।
আবার বরষ পরে, আবার হরষ ভরে
আবার পূজিতে তোর রাঙ্গা পা দুখানি,
অদম্য উৎসাহে সেই, আবার এসেছি
এই
ভুলিয়া সে বুক ভরা শোক তাপ গ্লানি।
এ নহে একটী, দুটী, এই দেখ কোটি কোটি
মিলিয়াছি ভাই ভাই দেখ্ বীণাপাণি !
কোটি হস্তে অই পায়, অর্পিব অঞ্জলি হায়
ছিড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ শশী দিনমণি !
কোটি বজ্রে গরজিয়া, কোটি কণ্ঠে হুঙ্কা-
রিয়া
কাঁপায়ে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব আকাশ অবনী,
আনন্দে গাইব "জয় ভারতী জননী !"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

চুম্বক তত্ত্ব।

আমাদিগের এবম্বিধ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই যে নিকৃষ্ট জীব ভৌতিক ঘটনাপরম্পরার নিয়মাবলীর অনুসন্ধানে কখনও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বজ্রবিদ্যোতিত ঝটিকা সমাগমে মেষপাল ভীত হয় অথবা পূর্ণচন্দ্র গ্রহণ কালে পক্ষিগণ কুলায়াশ্রয় গ্রহণ করে, এবং গো মহিষাদির দল তখন ভীত চিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষিগণ যে কখন এ সমস্ত প্রকৃতি-কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়না তদ্বিরুদ্ধে আমরা কোনই যুক্তি দেখিতে পাই না। মনুষ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের বিদ্যমানতা,

ভৌতিক কার্য্যকলাপের সংঘটন, এবং মানব আবাস ভূমি এই ভূমণ্ডলের দর্শন বৈচিত্র্য, এই সমস্ত মানব-বাহেন্দ্রিয় ভেদ করিয়া তাহার অন্তরস্থিত শক্তি বিশেষের গোচরে আইসে। বহিরিন্দ্রিয় সমূহ বাহ্য-জ্ঞান-লাভের সহকারী স্বরূপ মাত্র। ভৌতিক ব্যাপার সমস্ত বাহেন্দ্রিয় গোচর হইয়া পশ্চাৎ চিন্তা শক্তির বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। মানব মনের এমনি গঠন বৈচিত্র্য যে, উহা কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বিশেষের চিন্তায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কোন একটি সত্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ঐ সত্যকে অন্য কতিপয় পরস্পর সম্বদ্ধ সত্য শৃঙ্খলের একটী গ্রন্থিস্বরূপ বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে। তখন উহা ঐ শৃঙ্খলের মধ্যে ঐ সত্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান অবধারণে সচেষ্টিত হইয়া থাকে। উক্ত সত্য শৃঙ্খল হইতে ঐ সত্যটি অবিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মে। মনুষ্য বর্ত্তমান কালে যাহা প্রত্যক্ষ করে তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিশেষের মূল বলিয়া তাহার বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের এরূপ সংস্কার যে প্রকৃতি কার্য্য সমস্ত স্বতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীন নহে, এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভৌতিক বলমাত্র ও তাহার কার্য্যকলাপ যাবতীয় যে পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরাধীন, ইহা মানব মনে যত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতি যে নিরপেক্ষ সাধীন অংশ সমূহের সমষ্টি এই বিশ্বাস ততই তিরোহিত হইতে থাকে। পরিশেষে প্রধানতঃ ভৌতিক বিজ্ঞান বলে আমরা প্রকৃতিকে একটী সর্ব্বাঙ্গীন সজীব সৃষ্টি বলিয়া বিশ্বাস করি। প্রকৃতিদেহের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ অবশিষ্টাঙ্গ সকলের সহিত এক সূত্রে সংবদ্ধ। যুগে যুগে ঐ শরীর পরিবর্ত্তনশীল সত্য, কিন্তু তদ্দেহে অবিচ্ছিন্নতার কোথায়ও কোন অভাব দৃষ্ট হয়না। অথবা অপরিবর্ত্তনীয় কার্য্য কারণ সম্বন্ধের ও একটি মাত্র বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয় না। যে সৃষ্টি ক্রিয়া সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহা এত বিস্তৃত ও বিবিধ যে, এক জনে তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তদধ্যয়নে সক্ষম হইতে পারে না। বিদ্যার পরিসরের বিস্তৃতি অনুসারে আমাদিগের অনুসন্ধান ক্ষেত্রকে ততই খণ্ডে বিভাগ করিয়া লইবার প্রবণতা জন্মে। বিভক্ত বিবিধ অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তাহাতে তত্তৎ বিষয়গুলি অধিকতর মনোযোগের সহিত আলোচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, এক একটী শাখার তত উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। জ্ঞান রাজ্যের চতুর্দ্দিকে মানব মন তাহার জয় বিস্তারে ধাবমান। সমগ্র বিদ্যা বা জ্ঞান যেন একটি মধ্য বিন্দু হইতে যে বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহাতে বস্তুতঃ ব্যক্তি বিশেষে এক একটি বিষয় লইয়া এক এক দিকে যেন

সরল রেখা ক্রমে অগ্রসর হয়, তাহাতে সেই সেই বিষয়গুলি উন্নতি মার্গে ততই বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। প্রকৃতি-পাঠার্থীকে বিষয় বিশেষ অবলম্বন করিয়া অনেকাংশে পুস্তকাদি পাঠে এবং বাচনিক অন্যান্য ব্যক্তির নিকট তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হয়। পরিশেষে তাহাকে প্রকৃতিরূপ গ্রন্থকে কার্য্যতঃ হস্তে লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাঠ করিতে হয়। তাহাকে স্বয়ং প্রকৃতি কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে। সর্ব্বদা নৈসর্গিক সত্যের অব্যবহিত সংসর্গে না আসিলে অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা হইতে সক্ষম হওয়া যায় না। অধিকন্তু চিন্তাশক্তির সজীবতা এবং অভ্রান্ত বিচারশক্তি লাভ করিবার এক মাত্র উপায়—প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎকার জ্ঞান লাভ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিলে সমগ্র ঈশ্বর সৃষ্টির জ্ঞানকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে এক্ষণে কেবল এই বিষয় গুলির জ্ঞান বুঝায়,—আলোক, তাপ, চুম্বক ও তাড়িতের কার্য্য ও নিয়মাদি, শব্দতত্ত্ব, তরল পদার্থ নিচয় ও বাষ্পাদির চাপ ও গতি। যন্ত্রবিজ্ঞানও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু এক্ষণে এই শাখাটি এতাদৃশ বিশদ হইয়া উঠিয়াছে যে তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতালাভ জন্য এক ব্যক্তিকে কেবল উহারই আলোচনায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রয়োগকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা কহে। ইহার বহুল বিস্তৃতি বিধায় ইহা স্বতন্ত্র ভাবে অধীত হওয়া কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত এ বিষয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত না বলিলেও হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভৌতিক বল কার্য্যের প্রাধান্য সামান্য নহে। তাপ ও আলোক সহযোগে আমরা পদার্থের সংযোগ সাধন করিয়া থাকি। এবং আবার ঐ তাপ ও আলোক মাহাত্ম্যে তাহাদের বিশ্লেষণ সাধনও করিতে পারি। তাড়িত-বল রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ গত পরস্পর দৃঢ় সম্বদ্ধ পরমাণু সমূহকে সবেগে পৃথগ্‌ভূত করিয়া ফেলে। সূর্য্যালোক রশ্মি যবক্ষারায়ুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার উপাদান পদার্থ সমূহকে পৃথক্ করিয়া দেয়। সূর্য্য তৈজস কিরণের এবম্বিধ বিশ্লেষণী শক্তি মাহাত্ম্যে উদ্ভিদ্‌রাজ্য সংগঠিত হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ্‌রাজ্য হইতে আবার জীবরাজ্যের সৃষ্টি। এইরূপে রসায়ন-বিজ্ঞানও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বিকশিত বিষয় সমূহের বিবরণ দ্বারা পাঠকের আশু মনোরঞ্জন করা সহজকথা। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত অসংখ্য মানব হিতকরী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আধুনিক সুবিধা জনক রূপান্তরিত গঠনের সবিশেষ বিবরণ উল্লেখ দ্বারা সাধারণ পাঠকের চিত্ত রঞ্জন অনায়াস সাধ্য। কিন্তু কি রূপ প্রণালীমত বিজ্ঞানালোচনা আত্মোৎকর্ষের উপাদানী ভূত হইতে পারে, কি

প্রকারে বৈজ্ঞানিক, তত্ত্ব সমূহ জীবন্ত বীজ স্বরূপ মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং পরিণামে বিবিধ সুফল ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা তত সহজ ব্যাপার নহে। আবিষ্কৃত বিজ্ঞানতত্ত্ব সমস্তের তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠক সমক্ষে ধারণকরণাপেক্ষায় তদ্বিষয়ের যথারীতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান গুরুতর বিষয় সন্দেহ নাই।

চুম্বকবিজ্ঞান বা চুম্বকতত্ত্ব কি প্রণালীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। চুম্বক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ প্রয়াসীকে অগ্রে তাহার সাধ্যমত তদ্বিষয়ক এক খানি উত্তম গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু পুস্তকে যাহা লিখিত থাকে তাহাতেই যথেষ্ট জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। অর্থ পরিচায়ক সুচিত্রাদিতেও পরিতপ্ত হওয়া উচিত নহে। চুম্বক শক্তির কার্য্য প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিয়া সন্তুষ্ট হইবে না। অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণেতা তাহাদিগেয় গ্রন্থবর্ণিত পরীক্ষণগুলি কখনই স্বহস্তে সাধন না করিয়া তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের বর্ণনার স্পষ্টতা, বলবত্তা, ও কখন কখন সত্যতারও অভাব দৃষ্ট হয়। অতীব উৎকৃষ্ট বর্ণনা হইলেও উহা যে কখনই প্রত্যক্ষ দর্শনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না তাহার আর সন্দেহ নাই।

চুম্বক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষণানুষ্ঠানোপযোগী কতিপয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিক্রেতার নিকট হইতে এক খণ্ড সরল দণ্ড-চুম্বক ক্রয় করিবে। অত্রত্য বাজারে দণ্ড-চুম্বক দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অশ্বের লাল বাঁধা লৌহ খণ্ডের আকার অর্থাৎ ইংরাজি u অক্ষরাকার চুম্বক অনেক পাওয়া যায়। মূল্যও অধিক নহে। আট আনা হইতে ৫।৬ টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ আয়তনের ঐরূপ বক্র চুম্বক বিক্রীত হইয়া থাকে। সুলভ মূল্যে তদ্রূপ একটি ক্রয় করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা স্বয়ং একটি সরল দণ্ড-চুম্বক প্রস্তুত করিয়া লইবে। তৎপ্রকরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একটি ইস্পাতদণ্ড হইতে দশ ইঞ্চি দীর্ঘ, এক ইঞ্চি প্রস্থ এবং এক ইঞ্চি ঘন বা পুরু পরিমিত এক খণ্ড, কর্ম্মকার দ্বারা কাটাইয়া লইবে। তদনন্তর তাহার প্রান্ত দ্বয়ের ধার ও কোণগুলি উকাদ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কার ও মসৃণ করিয়া লইবে। তাহার পরে দণ্ডটিকে কঠিন করিয়া লইতে হইবে। তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহাকে অগ্নিতে উত্তমরূপে পোড়াইতে হইবে। স্বর্ণকারের একটি ছোট হাপোরের সাহায্যে সুবিধা হইবে। তাহাতে দণ্ডটি পুড়িয়া লোহিতোত্তপ্ত হইলে তাহাকে তুলিয়া লইয়া শীতল জলে নিমজ্জিত করিবে। এতদ্বারা উহা কাচ সদৃশ কঠিন ও ভঙ্গুর

হইয়া উঠিবে। এক্ষণে উহাকে জল হইতে তুলিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিয়া রাখিয়া দিবে। তদনন্তর বক্র চুম্বকটির প্রয়োজন। তৎসহকারে ইস্পাত দণ্ডটিতে চুম্বক ধর্ম্ম প্রদান করিতে হইবে। অশ্বপাদুকাকার বক্র চুম্বকের বক্রাংশ লোহিত বর্ণে আকৃত থাকে। অবশিষ্টাংশ যে দুই বাহুতে শেষ হইয়াছে, ঐটুকু মাত্র উজ্জ্বল ইস্পাত বর্ণ বিশিষ্ট। ঐ বাহুদ্বয়ের একটীর শেষাংশের গাত্রে তাহার প্রস্থ প্রমাণ একটি ছেদ, বা খাঁজ অঙ্কিত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মত প্রস্তুত ইস্পাত দণ্ডটিকে এক সমতল দৃঢ় পদার্থরূপ আধারোপরিস্থাপন করিয়া, একটি সূতা লইয়া তদ্দ্বারা তাহার ঠিক অর্দ্ধাংশ মাপিয়া লইয়া মধ্যদেশ খড়ি, পেন্‌শিল্ অথবা কালী দ্বারা চিহ্নিত করিবে।

তদনন্তর বক্র চুম্বকটির বক্রাংশ ধরিয়া তাহার প্রান্তদ্বয় ইস্পাত-দণ্ডের ঠিক মধ্য দেশে তাহার সহিত লম্বভাবে স্থাপন করিবে। তাহাতে চুম্বকের দুই প্রান্তের উপরিদেশ দণ্ডের মধ্য চিহ্নের দুই পার্শ্বে, দণ্ডের সংস্পর্শে সংস্থিত হইবে। এক্ষণে চুম্বককে অতিবেগে দণ্ডের গাত্র সংস্পর্শে অধিক চাপ না দিয়া দণ্ডের এক প্রান্ত, পরে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘর্ষণ সম্পন্ন করিবে। এইরূপে দশ বার বার ঘর্ষণ সম্পাদন করিয়া শেষ ঘর্ষণ কালে চুম্বককে ইস্পাত-দণ্ডের ঠিক্ মধ্যদেশে আনিয়া দণ্ড হইতে তুলিয়া লইবে। কিন্তু ঘর্ষণ কালীন চুম্বককে দণ্ড হইতে বারেকও তুলিবে না। অথবা দণ্ডের প্রান্তদ্বয়ের বাহিরেও লইয়া যাইবে না; অর্থাৎ ঘর্ষণকালে চুম্বক ও দণ্ডকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না। পুনশ্চ ইস্পাত দণ্ডটিকে উল্‌টাইয়া রাখিয়া তাহার বিপরীত দিকটিও ঐ রূপে ঘর্ষণ করিবে। উভয় দিকের ঘর্ষণ কার্য্য যেন সমসংখ্যক হয়, অর্থাৎ এক দিক দশবার ঘৃষ্ট হইলে, অপর দিকটিও দশবার ঘর্ষণ করিতে হইবে। তাহাতে ইস্পাত-দণ্ডটি সর্ব্বতোভাবে চুম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠিবে।

যদ্যপি অশ্ব পাদুকাকার অথবা দণ্ড-চুম্বক দুয়ের কোনটিও সংগৃহীত না হইয়া উঠে, সে স্থলে বাজারে সচরাচর দুই তিন আনা মূল্যে যে চৌম্বক ক্রীড়নক বিক্রীত হয় তাহার একটি সংগ্রহ করিয়া লইলেই হইবে। তন্মধ্যে একটি হাঁস, মাছ অথবা একখানি জাহাজ কিম্বা নৌকা থাকে, এবং তাহার সহিত একটি ক্ষুদ্র চুম্বক লৌহের কাটা থাকে। ঐ চুম্বক শলাকার এক প্রান্তের দিক কিয়দংশ বাদে অবশিষ্ট সমস্ত টুকু লোহিত বর্ণে আবৃত। পূর্ব্বোক্ত দণ্ড চুম্বকটির পরিবর্ত্তে এই ক্ষুদ্র শলাকা চুম্বকটি দ্বারাও পরবর্ত্তী পরীক্ষণগুলি সম্যক্ সাধিত হইবে।

এইক্ষণে কতিপয় সাধারণ সূচ সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। সূচগুলি দীর্ঘাকার হইলে ভাল হয়। তদ্রূপ একটি সূচ লইয়া তাহার মধ্যদেশে একটি সূতা

বাঁধিয়া দিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে পৃথিবীর সহিত সমান্তর ভাবে ঝুলাইয়া রাখ। তদনন্তর সরল দণ্ড চুম্বকটি, অভাবে পূর্ব্বোক্ত ক্রীড়নকের একটি চুম্বক শলাকা লইয়া তাহার এক প্রান্ত দোদুল্যমান সূচের মধ্যদেশ হইতে ক্রমান্বয়ে তাহার উত্তর প্রান্তদ্বয়ের নিকট পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া দেখ। সমগ্র সূচটি চুম্বক দণ্ড অথবা শলাকা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইবে। চুম্বকটি সূচ সন্নিধান হইতে সরাইয়া নাও, সূচটি তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সূচটি স্থির হইয়া আসিলে তখন চুম্বকের অপরপ্রান্তদেশ পূর্ব্বমত তৎসমীপে ধারণ করিয়া দেখ; চুম্বকের সেই প্রান্ত দ্বারাও সূচটি ঠিক পূর্ব্ববৎ আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইবে। চুম্বকের দুই প্রান্তের আকর্ষণ কার্য্য মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে না। সূচের পরিবর্ত্তে তৎস্থানে এক খণ্ড লৌহ তার ঝুলাইয়া রাখিয়া পূর্ব্ববৎ তৎসন্নিধানে চুম্বকটি ধারণ করিয়া দেখ; তাহাতেও তারখণ্ডও সূচীর ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া চুম্বক সমীপে অগ্রসর হইবে। তারের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে এক খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র সীস, তাম্র, পিত্তল ও রৌপ্য সূতা দ্বারা ঝুলাইয়া রাখিয়া চুম্বককে পর পর প্রত্যেকটির নিকট ধারণ করিয়া দেখ; চুম্বক তাহার কোনটিও আকর্ষণ করিবে না। পুনশ্চ ধাতুর পরিবর্ত্তে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ, কাচ, হস্তি-দন্ত ও কাচ-কড়া ঝুলাইয়া দিয়া তাহাদেরও প্রত্যেকের নিকট চুম্বক ধারণ করিয়া দেখ। চুম্বকের, তন্মধ্যে কোনটিরই প্রতি আকর্ষণ শক্তির কার্য্য দেখিতে পাইবে না। কিন্তু যতগুলি ধাতু আছে তৎসমুদায়কে এইরূপে চুম্বক সহযোগে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত আরও দুইটি ধাতু চুম্বক ধর্ম্মাধীন··· নিকেল্ (Nikel) ও কোবল্ট্ (Codult) ধাতুদ্বয়ও চুম্বক সম্বন্ধে লৌহ শ্রেণী ভুক্ত। এই কতিপয় পরীক্ষা দ্বারা চুম্বকের এই অসাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হইতেছে যে উহা লৌহ ইস্পাত, নিকেল্ ও কোবল্ট, কেবল এই কয়টি ধাতু মাত্রকে আকর্ষণ করে; এবং এই ধাতু চতুষ্টয়েরও এই অসাধারণ ধর্ম্ম সপ্রমাণ হইতেছে যে উহারাই কেবল চুম্বক ধর্ম্মাধীন, অর্থাৎ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

চুম্বক শক্তির কার্য্য সমূহ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যেসমস্ত পরীক্ষণের প্রয়োজন, তৎসমস্ত প্রায় লৌহ ও ইস্পাত সহযোগেই সাধিত হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ ধাতুদ্বয় নিকেল্ ও কোবল্ট্ অপেক্ষা অধিকতর সুলভ ও অনায়াস প্রাপ্য।

পূর্ব্বোক্ত সূচীর পরীক্ষাটি উপর্য্যুপরি অনেকবার সাধন করিবে। সূচের উভয় প্রান্ত পর পর দণ্ড অথবা শলাকা চুম্বক দ্বারা অনেকবার আকৃষ্ট করাইবে। এবম্বিধ সামান্য পরীক্ষাটি উপর্য্যুপরি অনেকবার সাধন করিতে বিরক্তিবোধ

করিবে না। অথবা উহা বুদ্ধিকৌশল নিরপেক্ষ বলিয়া অবহেলাও করিবে না। পরীক্ষাকালে প্রকৃতির সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এরূপ বোধ করিতে হইবে। অত্যন্ত সহজই হউক অথবা প্রভূত বুদ্ধিকৌশলসম্পন্নই হউক পরীক্ষণ মাত্রই প্রকৃতির যেন ভাষা স্বরূপ। প্রকৃতিকে যন্ত্রযোগে পরীক্ষণ সহকারে তাহার তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে প্রকৃতি তদ্দ্বারা ও তন্মুহূর্ত্তেই তাহার উত্তর দিবে। সুতরাং সেই ভাষায় পর্য্যাপ্ত অধিকার ও পারিপাট্য লাভ করা অতীব আবশ্যক। একমাত্র অভ্যাস দ্বারাই তল্লাভে সক্ষম হইবে। তদ্দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বের যে জ্ঞান লাভ করিবে, তৎসমুদায় মনে চিরাঙ্কিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত কয়টি পরীক্ষাতে চুম্বকের প্রধানতম ধর্ম্ম যে, উহা লৌহ ও ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, কেবলমাত্র ইহাই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে উহার আর একটি প্রধান ধর্ম্ম পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন কর। সরল চুম্বকটি (দণ্ড চুম্বক অথবা শলাকা চুম্বক) লইয়া তাহার মধ্যদেশে সূক্ষ্ম সূতা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দাও। সূতা অবলম্বন করিয়া উহা যেন অবাধে ঝুলিতে পায়। তাহাতে দেখিবে, উহার এক প্রান্ত উত্তর ও অপর প্রান্ত সুতরাং দক্ষিণ দিকাভিমুখ করিয়া স্থির হইবে। তাহাকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দাও, ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় উহার সেই এক দিক্‌টিই উত্তর দিকাভিমুখী হইয়া, স্থির হইবে। মনে কর, ঐ প্রান্তটি কোন রূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া পুনরায় উহাকে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে; তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া উহার সেই চিহ্নিত প্রান্তটিই উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া স্থির হইবে, এবং অপর অচিহ্নিত প্রান্ত দক্ষিণ দিকাভিমুখী থাকিবে। ঐ সরল চুম্বকটিকে যদ্যপি ঝুলাইয়া না রাখিয়া একটি কীলক বা গোঁজের উপর ঠিক্ মাঝামাঝি শিথিল ভাবে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা ঘুরিয়া ঠিক্ উত্তর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হইবে, এবং উহার ঐ চিহ্নিত প্রান্তটিই উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করিবে। সরল চুম্বকটি দ্বারা একটি সূচকে উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া লইয়া তাহার মধ্যদেশে সূক্ষ্ম সূতা বাঁধিয়া দিয়া ঝুলাইয়া দিলে, দেখিবে যে সূচটি উত্তর দক্ষিণ দিক্ হইয়া স্থির হইবে। মনে কর, উহার সূক্ষ্মাগ্র প্রান্তটি উত্তর ও সচ্ছিদ্র প্রান্ত দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া স্থির হইল। উহাকে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দাও; সেই সূক্ষ্মাগ্র প্রান্তই পুনরায় উত্তর ও সচ্ছিদ্র প্রান্ত দক্ষিণ দিক্ করিয়া স্থির হইবে। ঐ সূচিটিকে লইয়া সূতা খুলিয়া ফেলিয়া উহার মধ্যদেশে একটী ক্ষুদ্র কর্ক্ অথবা এক খণ্ড শোলা বিদ্ধ করিয়া দিয়া জলে ভাসাইয়া দিলে দেখিবে, উহার সূক্ষ্মাগ্র দিক্ কর্ক অথবা শোলা শুদ্ধ

ঘুরিয়া উত্তর দিগনির্দ্দেশ করিবে। চুম্বকের এক প্রান্ত যে উত্তর দিগ নির্দ্দেশ করে, এইটিও উহার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। চুম্বকের যে প্রান্ত উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করে, তাহাকে তাহার উত্তর কেন্দ্র ও অপর প্রান্ত, অর্থাৎ যেটি দক্ষিণ নির্দ্দেশ করে, সেইটিকে তাহার দক্ষিণ কেন্দ্র কহে। চুম্বকের এই দিগনির্দ্দেশক ধর্ম্ম সত্ত্বে দিক্ দর্শন যন্ত্রে ইহার নিয়োগ হইয়াছে। অকূল সাগরে দিগ-নির্ণয়ের জন্য নাবিকের একমাত্র সহায় যে দিক্‌দর্শন যন্ত্র, তাহা একটি চুম্বক শলাকা মাত্র।

এক্ষণে চুম্বকের আরও একটি প্রধান ধর্ম্ম পরীক্ষা সিদ্ধ করিয়া লও। একটি সূচ লইয়া তাহাকে সরল চুম্বক অথবা অশ্বপাদুকাকার চুম্বকের এক প্রান্ত দ্বারা ১০, ১২ বার লম্বালম্বি ঘর্ষণ করিয়া লও। তাহাতে সূচটি চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র চুম্বক শলাকায় পরিণত হইবে। তখন ঐ সূচটিকে সূক্ষ্ম সূতা বা রেশম দ্বারা মধ্যাবলম্বন করিয়া ঝুলাইয়া রাখ। ঐ সূতা বা রেশমের একটুমাত্রও পাক না থাকে; সূচটিও যেন না ঘুরিয়া স্থির ভাবে ঝুলিতে থাকে। তদনন্তর পূর্ব্বমত তাহার সন্নিধানে সরল চুম্বকটি ধারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। এস্থলে এই পরীক্ষার ভিন্নরূপ ফল দেখিতে পাইবে। চুম্বকের দুই প্রান্তের প্রত্যেকটি ঐ সূচের একপ্রান্তকে আকর্ষণ করিবে, ও অপরটিকে প্রতিক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে চুম্বকের কেবল আকর্ষণ শক্তির কার্য্য লক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে শুদ্ধ আকর্ষণের স্থলে দ্বিবিধ শক্তির আবির্ভাব হইতে দেখিবে, আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ। এই পরীক্ষাটি পুনঃ পুনঃ সাধন করিয়া ঠিক করিয়া দেখিয়া রাখ, চুম্বক ও সূচ এ দুয়ের কোন্ দুই প্রান্ত পরস্পর আকর্ষণ করে, এবং কোন্ দুই প্রান্তই বা পরস্পর প্রতিক্ষেপ করে।

এক্ষণে সরল চুম্বকটিকে বিলম্বিত সূচের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাখ, এবং সূচটিকে সূক্ষ্ম সূতা অবলম্বন করিয়া অবাধে ঝুলিতে দাও। চুম্বকের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে উহার এক প্রান্ত উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া স্থির হইবে। মনে কর, সূক্ষ্মাগ্র প্রান্তটিই উত্তর দিকাভিমুখী হইল; তাহা হইলে উহার ঐ প্রান্তটিই উত্তর-কেন্দ্র, আর অপর সচ্ছিদ্র প্রান্তটি সুতরাং দক্ষিণ কেন্দ্র স্থির হইল। এক্ষণে সরল চুম্বকেরও উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র দুইটি স্থির করিয়া লও। উহাকে মধ্যে সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া উহার কোন্ দিক্ উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করে তাহা দেখিয়া লইয়া সেই প্রান্ত কোনরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। আর যদ্যপি অশ্বপাদুকাকার চুম্বক লইয়া বক্ষ্যমান পরীক্ষণটি সাধন করিতে হয়, তবে আর উহার উত্তর কেন্দ্র স্থির করিয়া লইতে হইবে না, কারণ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে উহার ঐ কেন্দ্র একটি

ছেদে অঙ্কিত থাকে; সুতরাং ঐ চিহ্নিত প্রান্তটিই উহার উত্তর কেন্দ্র। এক্ষণে সরল দণ্ড চুম্বকটি অথবা অশ্বপাদুকাকার চুম্বকটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ কর। পূর্ব্বোক্ত বিলম্বিত সূচটির সছিদ্র প্রান্ত দক্ষিণ ও সূক্ষ্মাগ্র প্রান্ত উহার উত্তর কেন্দ্র। ইহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে। এ স্থলে সূচটির ঐ স্বাভাবিক অবস্থানের কোনরূপে ব্যতিক্রম না ঘটে, অর্থাৎ উহা অন্য দিকে না সরিয়া যায়, তৎপক্ষে একটু পূর্ব্ব সতর্কতার প্রয়োজন। তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ উহাকে বায়ুবেগ হইতে সুরক্ষিত করিতে হইবে। বাতাসের বলে এদিক্ ওদিক্ না ঘুরিয়া বেড়ায়। আরও লৌহ অথবা ইস্পাত বিনির্ম্মিত বোতাম সমন্বিত অঙ্গ রক্ষক পরিয়া, কিম্বা পকেটে ছুরিকা অথবা অন্য কোনরূপ লৌহময় পদার্থ লইয়া পরীক্ষাধীন বিলম্বিত সূচ সন্নিহিত হইবে না। রাত্রিকালে পরীক্ষার সময় কোনরূপ লৌহময় বর্ত্তিকাধারও নিকটে রাখিবে না। ফলতঃ সূচের সন্নিধানে লৌহ অথবা ইস্পাতময় কোন পদার্থই থাকিবে না। এরূপাবস্থায় সূচ-চুম্বকটি স্থির ভাবে ঝুলিতে থাকিলে তাহার প্রান্ত দ্বয়ের নিকট বৃহৎ চুম্বকের কেন্দ্রদ্বয় পর পর ধারণ করিয়া দেখ। প্রথমে বড় চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র সূচ-চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রের (সূক্ষ্মাগ্রের) নিকট ধর; দেখিবে সূচের ঐ কেন্দ্র প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া বেগে পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়াযাইবে। তখন বড় চুম্বককে সরাইয়া লও, সূচকে পুনরায় স্থির হইয়া আসিতে দাও; আবার চুম্বকের ঐ কেন্দ্রই সূচের ঐ কেন্দ্রেরই নিকট ধর; পুনরায় ঐরূপ প্রতিপক্ষেণ লক্ষ্য করিবে। এই পরীক্ষণটীই পুনঃ পুনঃ বার কতক সাধন কর। তদনন্তর সূচ চুম্বক পুনরায় স্থির হইয়া আসিলে, বড় চুম্বকের এইবার দক্ষিণ কেন্দ্র সূচ-চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রের নিকট ধর। তাহাতে বড় চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র সূচ-চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়া স্বাভিমুখে টানিয়া আনিতে দেখিবে। সূচের সূক্ষ্মাগ্র উত্তর কেন্দ্র আকৃষ্ট হইয়া বড় চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র গাত্রে সংলগ্ন হইবে। পুনরায় বড় চুম্বককে সরাইয়া রাখ; এবং সূচ-চুম্বককে স্থির হইয়া আসিতে দাও। এইবার দুইটি চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্রদ্বয় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী কর। বড় চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র সূচের দক্ষিণ কেন্দ্রের (সছিদ্র প্রান্তের) নিকট ধর; সূচের দক্ষিণ কেন্দ্র প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া বেগে পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যাইবে। এই প্রতিক্ষেপণ ধর্ম্মের কার্য্য চারি পাঁচ বার প্রত্যক্ষ করিয়া বড় চুম্বককে রাখিয়া দাও; সূচকে পুনরায় স্থির হইয়া ঝুলিতে দাও। এইবার চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র সূচের উত্তর কেন্দ্রের (সূক্ষ্মাগ্রের) নিকট ধরিয়া দেখ; চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র দ্বারা সূচের উত্তর কেন্দ্র আকৃষ্ট হইয়া তাহার গাত্র সংলগ্ন হইবে। এই কয়টি পরীক্ষাতে এই সপ্রমাণ হইল যে বৃহৎ

চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রকে প্রতিক্ষেপ করে, ও তাহার দক্ষিণ কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে, এবং বৃহৎ চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্রকে প্রতিক্ষেপ করে, ও তাহার উত্তর কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ কার্য্যদ্বয় উভয়তঃ কি না, অর্থাৎ বৃহৎ চুম্বককে ঝুলাইয়া রাখিয়া ক্ষুদ্র চুম্বক সূচটি তাহার নিকট ধরিয়া পূর্ব্বমত পরীক্ষা করিলে, সমান ফল হয় কি না, তাহা দেখ। বৃহৎ চুম্বকটিকে মধ্যে সূক্ষ্ম সুতা বাঁধিয়া দিয়া সূচটির ন্যায় ঝুলাইয়া রাখ। উহার চিহ্নিত উত্তর কেন্দ্র উত্তর দিক নির্দ্দেশ করিয়া স্থির হইয়া আসিলে, তখন সূচ-চুম্বক লইয়া তাহার উত্তর কেন্দ্র দণ্ড চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রের নিকট ধরিবামাত্র উহা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যাইবে। তাহার পর, বড় চুম্বকটি পুনরায় স্থির হইয়া আসিলে, তাহার দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকট সূচের দক্ষিণ কেন্দ্র ধারণ কর; তাহাতে বড় চুম্বকের উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র প্রতিক্ষিপ্ত হইবে। আবার বড় চুম্বকের উত্তর কেন্দ্রের নিকট সূচের দক্ষিণ কেন্দ্র ধরিলে, উহা সূচাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইবে; এবং তাহার দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকট সূচের উত্তর কেন্দ্র ধরিলে, উহাও আকৃষ্ট হইয়া সূচাভিমুখে অগ্রসর হইবে। সূচ-চুম্বকটি ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ চুম্বককে এরূপাবস্থায় আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপ করণে সক্ষম হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিযান ও সারস্বত উৎসব *

সন্তানগণ! আজ আমরা যে অভিযানিক যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ইহা সামান্য অভিযান নহে। বিজয়োদ্যত সেনা বিজয় পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া শত্রু বিরুদ্ধে যে অভিযান বা মার্চ (march) করে, ইহা সে অভিযান নহে। আমরা আজ যে অর্থে এই অভিযান শব্দ প্রযুক্ত করিলাম, এ অর্থে অভিযান শব্দ পূর্ব্বে কখন প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং অভিধান খুঁজিয়া অভিযানের এ অর্থ পাইবে না। হৃদয়ের উৎস হইতে অভিযানের যে অর্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, অনেক দিনের সাধনাবলে আজ অভিযান শব্দ সেই অর্থে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম।

আমরা যে অর্থে অভিযান শব্দ অদ্য কার্য্যতঃ প্রযুক্ত করিলাম, তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছি। অভি পূর্ব্বক 'যা' ধাতুর উত্তর শানচ প্রত্যয় করিয়া অভিযান শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহার যৌগিক অর্থ কাহারও অভিমুখে গমন করা। ইহার রূঢ় অর্থ এক দল সৈন্যের শত্রুর অভিমুখে গমন। আজ আমরা এই রূঢ় শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করিলাম—এক হৃদয়দলের অন্য হৃদয় দলের অভিমুখে গমন। আমরা অপগণ্ড ভারত সন্তান এত দিন নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। আজ আমাদের কোন দৈবী শক্তিবলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কে যেন আমাদের অঙ্গে সম্মোহন অস্ত্র প্রযুক্ত করিয়াছিল—তাই আমরা এত দিন চেতনা-হারা হইয়া পড়িয়াছিলাম—আমাদের অঙ্গের বেশভূষা রত্নাভরণ সেই অবসরে কে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। এত দিন আমরা মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলাম—সংজ্ঞা ছিলনা—সুতরাং কিছুই জানিতে পারি নাই—এবং প্রতিবিধানও করিতে পারি নাই। সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখি—আমরা লগ্নকায়, লগ্নপদ এবং রাজরাজেশ্বরীর সন্তান হইয়াও নিরাভরণ পড়িয়া আছি। তখন দরবিগলিত অশ্রুধারায় আমাদের বক্ষ ভাসিয়া গেল। ক্রন্দনে আমাদের এত দিন অতীত হইয়াছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে বসিয়া শুদ্ধ কাঁদিলে চলিবে না। আমাদের ভাই ভগিনীগণের সকলেরইত এই দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং

* এই প্রবন্ধটী ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির উদ্বোধন-উপলক্ষে পঠিত হয়।

এস ভাই! আমরা কে কোথায় পড়িয়া আছে—কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিতেছে—দেখিয়া আসি, যে উঠিতে পারিতেছে না চল আমরা, গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া তুলি; যে কাঁদিতেছে তাহার অশ্রু জল মুছাইয়া দিই; আশ্বাস বাক্যে তাহার শুষ্কপ্রায় হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি। চল ভাই! আমরা যে দল উঠিয়াছি—সেই দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগ সাধনা করি। ভারতের সমস্ত হৃদয়-স্রোতস্বিনী একত্র মিলাইয়া এক নূতন মহাসাগর উৎপন্ন করি। এক হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অন্য হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অভিমুখে যে গমন—তাহাই আমাদের আজকার অভিযানের প্রতিপাদ্য। ইহা রাজসিক বা তামসিক নহে। ইহা পূর্ণ সাত্বিক। ইহার সহিত সামরিক ভাবের বা বীর রসের কোন সংস্রব নাই। করুণ রসই এ অভিযানের জীবন—সুতরাং নিরস্ত্র বলিয়া আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। যোগসিদ্ধ না হইলে অস্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। যত দিন আমরা যোগসিদ্ধ না হইব—তত দিন আমরা বালক—কৃপার পাত্র। পঞ্চবিংশতি কোটী হৃদয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, আমাদের কিসের অভাব? সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য এই যোগ সাধনা। এত দিন আমরা শুদ্ধ ভাবময় জীবনে সময় অতীত করিয়াছি,—আজ আমাদের কার্য্যময় জীবন আরম্ভ হইল। তাই আজ আমরা দ্বারে দ্বারে অভিযান করিয়া দূরবিক্ষিপ্ত হৃদয়-কলিকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া আজ ভগবতী সরস্বতী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যে সরস্বতী দেবীর বরে আজ ইউরোপ ও আমেরিকা—এসিয়ায় ও আফ্রিকায় কর্তৃত্ব করিতেছে,—যে ভগবতী সরস্বতীর কৃপায় প্রাচীন আর্য্যেরা জগতে অজেয় ছিলেন, আজ সেই ভগবতী সরস্বতীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানভিক্ষা করিতেছি। বিনা জ্ঞানে কোন জাতি উঠিতে পারে না। জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। সুতরাং এস ভাই। আজ সমস্ত ভারত মিলিয়া এই শুভ দিনে ভগবতী সরস্বতী দেবীর আরাধনা করি। তিনি যেন ভারতের প্রতি আবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যেন আবার ভারতকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বলিত করেন। যখন এ পূজায় আমাদের অধিকার ছিল, তখন সারস্বত উৎসবে সমস্ত ভারত মাতিয়া উঠিত। কিন্তু অজ্ঞানে সারস্বত উৎসবের মহিমা বুঝিবে কিরূপে? তাই অজ্ঞান আমরা এত দিন সারস্বত উৎসবে বিরত ছিলাম। এখন জ্ঞানের পুনরুন্মেষের সহিত আমরা সারস্বত মহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—তাই আজ আবার এই সারস্বত উৎসবের অবতারণা। ময়মনসিংহ পুণ্যভূমি—যেহেতু সারস্বত উৎসবের পুনরারম্ভ ময়মনসিংহে। আশা করি অচিরাৎ

সমস্ত ভারত সারস্বত উৎসবে ময়মনসিংহের অনুবর্ত্তন করিবেন। তখন এক স্থানের অভিযান অন্য স্থানের অভিযানের সহিত মিলিত হইয়া ভারতে অপূর্ব্ব সৌভাগ্য রবি সমুদিত করিবে। বৎসরের দুই চারি দিন অন্ততঃ আমরা জাতিধর্ম্ম—ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া যদি ভগবতী সরস্বতীর মন্দিরে আসিয়া পরস্পর শোকদুর্ভর ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখি, যদি দুই চারি জন নিজ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থে বলি দিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলেও কালে আমরা একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত হইতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান্, শিখ ও ব্রাহ্ম—সকলেই এই অভিযানেও এই সারস্বত উৎসবে যোগ দিতে পারেন। কাহারও ইহাতে কোন আপত্তি নাই—আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। ইহা অপেক্ষা সুখের দিন শতধাবিভিন্ন ভারতের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে?

সন্তানগণ! সন্তান শব্দের সহিত জননী শব্দের যে নিত্য সম্বন্ধ। একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে আর একটি শব্দ স্বতঃই মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমাদের জননী কোথায়? ঐ যে কঙ্কালময়ী বিবশা নিরাভরণা রুক্ষালকা আলুলায়িত কেশী রমণীমূর্ত্তি দেখিতেছি, উনিই আমাদের মা—ভারত জননী। ঐ দেখ! উনি মৃতপ্রায়া ধরাশায়িনী পড়িয়া আছেন। ঐ যে চতুর্দ্দিকে করালমূর্ত্তি করধৃতদণ্ড পুরুষগণ দাঁড়াইয়া আছে, উহারা কে? সত্যবান্‌কে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল যমদূতেরা আসিয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের জননীকে গতাসু মনে করিয়া তাহারাই উহাঁকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। আজ আমরা সাবিত্রীর অনুবর্ত্তন করিব। সাবিত্রী যেমন সমনসদন হইতে সত্যবান্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আমরাও—সন্তানগণ—সেইরূপ জননীকে কালের করাল পুরী হইতেই ফিরাইয়া আনিব। আনিয়া জননীর মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনৌষধ প্রয়োগ করিব। যতদিন না মা আবার বলশালিনী হন, তত দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিমগ্ন থাকিব। তত দিন আমোদ আহ্লাদ সুখবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রতধারী রহিব। মা মরণোন্মুখী থাকিতে সন্তানের আমোদে অধিকার কি?

সন্তানগণ! তোমরা আজ একটী নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। তোমাদের রক্ত বসন তোমাদের এই নব ধর্ম্মে দীক্ষার পরিচায়ক। কোন উৎসব বা আমোদের জন্য তোমরা আজ এই রঞ্জিত বসনে আবৃত হও নাই। তোমরা একটী গভীর ব্রত উদ্যাপনার জন্য আপন ইচ্ছায় এই বসনকে অঙ্গের আভরণ করিয়াছ। আশা করি, যত দিন ব্রতের উদ্যাপনা না হইবে, তত দিন এই বসন পরিত্যাগ

করিবে না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ সাম্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক সন্ন্যাসীর জীবনে ভারতক্ষেত্র সমুজ্জলিত হইয়াছিল। তখন প্রতি গৃহী অর্দ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহিমায় ভারত তৎকালে হিমালয় সমান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ভারতে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। পতিত জাতিকে তুলিবার এরূপ মহামন্ত্র আর নাই। গৃহে থাকিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, এরূপ সংস্কার অমূলক। সন্ন্যাসধর্ম্ম অন্তরে অবস্থিত। যে অন্তরে সন্ন্যাসী তাহার গৃহও অরণ্য সমান। গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলে বরং সন্ন্যাস ধর্ম্মের অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়—কার্য্যের প্রসর অধিকতর বিস্তৃত হয়। সুতরাং সন্তানগণ! তোমরা গৃহে থাকিয়াই সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুশীলন করিবে, গৃহে থাকিয়াই জননীর চরণে আত্ম বলি দিতে অভ্যাস করিবে, পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই পারিবারিক জীবনকে জাতীয় জীবনে আহুতি দিতে শিক্ষা করিবে।

আজ হইতেই তোমরা আত্ম ভুলিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির চরণে আত্ম-আহুতি দিতে আরম্ভ করিবে। এ বড় কঠোর সাধনা। আমি অনেক দিন হইতে এ সাধনায় নিমগ্ন আছি—কিন্তু আজও সিদ্ধকাম হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী আসিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রতভঙ্গ করিয়া দেয়। পারিবারিক জীবন সময়ে সময়ে জাতীয় জীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেই স্রোতে পড়িয়া সময়ে সময়ে—স্বদেশ ও স্বজাতি—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাদ্বয়কে—ভুলিয়া যাই। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রতস্মৃতি প্রবল বেগে হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। তখন আবার লজ্জায় অভিভূত হই,—ক্ষণিক আত্মস্মৃতির জন্য গতানুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকি, এইরূপে এই দগ্ধ জীবন চলিতেছে। অন্তর্দাহে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ব্রতস্খলন হইলেও—মধ্যে মধ্যে আত্মস্মৃতির অধীন হইলেও—গৃহীত ব্রত কখন পরিত্যাগ করি নাই। ব্রত পরিত্যাগ করি নাই বলিয়াই আজ তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছি। কিন্তু আমা হইতে আশা অল্প। এই দেখ আমার শ্মশ্রুকেশ পলিত বেশ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত দিন আর বাঁচিব? আমি জননীর কিছুই করিতে পারিলাম না। এই দুঃখে দিন দিন আরও অকালবৃদ্ধ হইতেছি। জীবন দিন দিন দুর্ভর বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমাদের মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন আবার মনে সাহস হয়, আশা-ঊষা নবীন রশ্মিতে আবির্ভূত হয়। সন্তানগণ! তোমরা এখন ভারতের একমাত্র আশা! আমাদের জীবনের শিক্ষা তোমাদের

মূল ধন। এই মূলধন লইয়া এই জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। আমরা যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখন কোন মূলধন পাই নাই। তবে আর্য্য-গৌরবের স্মৃতি মাত্র উপলক্ষ করিয়া এতদূর হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা এই মূলধনকে পাথেয় করিয়া দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হও, এবং অনতিকালে গন্তব্য স্থানে উপনীত হও।

সন্তানগণ! অভিযানের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য তোমাদিগকে না বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের পতনের প্রধান কারণ স্বাতন্ত্র্যে। স্বাতন্ত্র্য উন্নতির চরম অবস্থা—ও অপব্যবহারে পতনের প্রধান সোপান। স্বানুবন্ধন না করিলে মানুষ কখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না। প্রতিপদে সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে। পরস্পর-সংঘর্ষে জাতীয় শক্তি বিনষ্ট হইবে! সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিকূলে দাঁড়াইলে যেমন সমাজের পতন অনিবার্য্য, সেইরূপ ব্যক্তি সমষ্টিরূপ সমাজের প্রত্যেক উপাদান, যদি সামাজিক শাসনের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে সমাজ ধ্বংস বা সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং উভয়েরই উভয়কে রক্ষা করিয়া চলা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন—এতদুভয়েরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ যদি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়ান, তাহা হইলে তিনি আত্মধ্বংসকারী হইবেন। সেইরূপ ব্যক্তিগণ যদি স্বাতন্ত্র্য হইয়া সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়ান—তাহা হইলে বন্যজন্তুর অবস্থায় পরিণত হইবেন। আমরা সমাজের ধ্বংসকামী নহি, সুতরাং সমাজদ্রোহী হইব না। সমাজকে বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করিব। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাফলে আমরা সকলেই স্বাতন্ত্র্য হইতেছি। ইহা জাতীয় জীবন-গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সকলেই স্বাতন্ত্র্য হইলে আমরা কোন সাধনাতেই কাহারও দ্বারা অভিনীত হইব না। সকলেই নেতা; নীত হইবার কেহ থাকিবে না। ভারতে এখন আদেশ কর্ত্তার সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কে আদেশ প্রতিপালন করিবে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহই কাহারও কথা শুনে না—কেহই কাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে না, নেতা বলিয়া কাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেও চাহে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের কোন সমবেত কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় থাকিলে আমাদের জাতীয় দুর্গতির দিনের অবসান হইবে না। আমাদের সম্মুখে ইংরাজ জাতির যে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি? ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ এই

অধিনীতি ধর্ম্ম।" তাঁহারা যেরূপ অধিনীত হইতে জানেন, বোধ হয় আর কোন জাতি এরূপ অধিনীত হইতে জানেন না। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অধিবাসিগণকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিলাম। ব্রিটন্ ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের উন্নতির মূল এই অধিনীতি। যাঁহাকে নেতা বলিয়া নির্ব্বাচন বা স্বীকার করিয়া লইলাম, তিনি যাহা বলিবেন অবিতর্কে তাহা সম্পাদন করাই অধিনীতি ধর্ম্মের প্রধান প্রতিপাদ্য। গুরু বা নেতা যাহা বলিবেন বিনা বিচারণায় তাহার অনুবর্ত্তন না করিলে কোন মহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে না। কারণ ক্ষিপ্রকার্য্য করণ সময়ে অধিনীত ব্যক্তি মাত্রকেই কার্য্যের দোষ গুণ বিচারণা দ্বারা বুঝাইয়া একমতে আনা অসম্ভব। সুতরাং তাহা করিতে সকল কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐ যে রণে অজেয় শিখজাতি আজ মিসর, ব্রহ্ম, আফগান, সুদন জয় করিয়া বেড়াইতেছে, উহা এই অধিনীতি ধর্ম্মের জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। শিখগুরু মহামতি গুরুগোবিন্দ সিংহ উহাদিগকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা আজ রণে অজেয়—বীরত্বে অতুলনীয়। ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডীও তাঁহাদিগের মন্ত্র শিষ্যগণকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অল্প দিনে তাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে যথায় যাইতে বলিতেন, যমালয় হইলেও তাঁহারা বিনা বিচারণায় তথায় যাইতেন। তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেন, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও তাহা তাঁহারা করিতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ অধিনীতের সংখ্যা ভারতে যতই বাড়িবে—ততই ভারতের মঙ্গল। সন্তানগণ! তোমরা আজ সেই অধিনীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। আজ হইতে তোমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের নিজ-নির্ব্বাচিত বা মহাজন-নির্ব্বাচিত গুরুর বচন তোমরা কখন উল্লঙ্ঘন করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে, গুরু তোমাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিলেও—তোমরা তথায় যাইতে পশ্চাদ্‌পাদ হইবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে তোমাদের গুরু তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন—প্রাণোৎসর্গেও তাহা তোমরা সাধন করিবে। এ প্রাণ যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কার্য্যে ব্যথিত না হইল, তাহা হইলে এ প্রাণে প্রয়োজন কি? এ জীবনের সার্থকতা কি? তোমাদিগের কঙ্কালময়ী জননী মূর্ত্তি তোমাদিগকে সতত এই ব্রত স্মরণ করাইয়া দিবে। জননীর কঙ্কালময়ী প্রতিমূর্ত্তি তোমাদিগের নয়ন-সমক্ষে রহিয়াছে। যে অন্ধ, সেই কেবল তাহা দেখিতে পায় না। যত দিন জননীর এই মূর্ত্তি থাকিবে ততদিন তোমাদিগকে এ ব্রত পালন করিতে হইবে। কিন্তু একটী কথা যেন তোমাদের মনে সর্ব্বদা থাকে। তোমাদের ব্রত শুদ্ধ সত্বগুণমূলক। রজঃ ও তমোগুণের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ঔদ্ধত্য ও অবিনয় রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং ঔদ্ধত্য ও অবিনয়কে তোমরা সর্ব্বথা পরিহার করিবে। গুরুর বচন হৃদয়ে ধারণ করিয়া—জননী ও ঈশ্বরকে—মস্তকে রাখিয়া তোমরা—সন্তানদল—অকুতোভয়ে সংসারপথে অগ্রসর হও—এই আমাদের এই দীন হীন সন্তানের একমাত্র বাসনা। যাহা আমি করিতে পারি নাই—তোমরা তাহা সাধন কর—এইমাত্র কামনা। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

সন্তানাচার্য্য।

ধর্ম্মালোচনা।

আজ কাল আমাদিগের দেশে ধর্ম্ম লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মগণ সত্যের জয় বলিয়া ব্রহ্ম শব্দের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া কত কথা বলিতেছেন। অন্যদিকে হিন্দুচূড়ামণি বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন, তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হরিধ্বনি করিয়া কত স্থানে কত সভা করিতেছেন, কত প্রকার বক্তৃতা করিয়া আপন আপন মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কি? তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না—এদিকে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম করিয়া ভারতের গগণ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। আমরা বলি, প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম কি? ইহা স্থির করিয়া পরে তাহার আলোচনা, তাহার প্রচারণা, তাহার স্থাপনা করিলেই ভাল হয়। তাহা হইলেই মনোরথ সিদ্ধ হইবে, বিবাদ বিসম্বাদ চুকিয়া যাইবে, লোকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহপরকালে যারপরনাই সুখী হইবে, এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষ হাত তুলিয়া নিরন্তর জয় ঘোষণা করিবে।

ভারতের না না স্থানে ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। যতই ধর্ম্মের আলোচনা হইবে ততই ধর্ম্মের ভাব বিশোধিত হইতে থাকিবে, ততই জ্ঞানালোক পরিবর্দ্ধিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে, পাপাচরণের প্রাদুর্ভাব বিলুপ্ত হইয়া

যাইবে, সর্ব্বত্র শান্তিদেবী বিরাজ করিতে থাকিবেন। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের আলোচনা, সত্য ধর্ম্মের অনুসন্ধানও দেখিতে পাই না। লোকে কেবল ধম্ম ধর্ম্ম করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত। প্রকৃত আলোচনা না করিলে সে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় না। ন্যায়রত্ন, তর্কচূড়ামণি মহাশয়েরা সেদিক্ দিয়া চলেন না। দুটি পাঁচটি উপরি কথা ও সংস্কৃত বচন বলিয়া রবাহুত অনাহূত লোকদিগকে ভুলাইয়া থাকেন। লোকেরা কি আশ্চর্য্য কথা। কি আশ্চার্য্য বক্তৃতা! কি চমৎকার যুক্তি! বলিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের চিন্তাশক্তির প্রভাব নাই, বিবেক শক্তিত প্রবলতা নাই, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা নাই। কাজেই তাঁহারা সত্যাসত্য, ভ্রান্তাভ্রান্ত বিষয় বিচার করিয়া সার সংগ্রহ করিতে পারেন না। অথচ হিন্দুধর্ম্মের জয় বলিয়া চীৎকার করিয়া বৃথা গোল করেন।

আমাদিগের দেশের লোকের এই একটি দৃঢ় সংস্কার আছে যে, পূর্ব্বতন ঋষিগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ই সত্য, বিজ্ঞানসম্মত, আমাদিগের পূর্ব্ব ও প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। সেই সমস্ত যদি হিন্দুধর্ম্ম হইল, তবে যেমন কেন ক্ষমতাশালী পুরুষ হউন না, তিনি সেই হিন্দু ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালন করিতে পারিবেন না। কেহ যে কখনও পারিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসও হয় না। কেহ যে কখনও পারিবেন, তাহারও আশা করা যাইতে পারে না। অতএব এরূপ হিন্দুধর্ম্ম কখনই জনসমাজে অনুষ্ঠিত ও পালিত হইতে পারে না। সংসারী ব্যক্তি এরূপ ভয়ানক ধর্ম্ম কখনই পালন করিতে পারেন না। সত্যের অনুসন্ধান কর, সত্য অনুষ্ঠান কর, মঙ্গল হইবে। নচেৎ ধর্ম্ম লইয়া এরূপ গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে কিছুমাত্র ফল হইবে না। দেশ ও কালের গতিকে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।

সংস্কৃত বচন শুনিলেই হিন্দুদিগের বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবেক শক্তি ও যুক্তি একবারে বিলীন হইয়া যায়। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা অমনি সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন—তাহা অমনি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। রামায়ণ ও মহাভারতে, স্মৃতি ও সংহিতাতে, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে কত যে অফল ও অসার কথা লিখিত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। পৌত্তলিক জড়োপাসকেরা সেই সমস্ত অসার ভ্রমসঙ্কুল কথা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত করিয়া পুলকিত হন। ও মুক্তিলাভের পথ বলিয়া স্বীকার করেন। এরূপ অন্ধ বিশ্বাস লোকের হৃদয় অধিকার করিলে, কখনই ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতে পারে না। পৌত্তলিক হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম সংস্কারক বলিয়া দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাও অন্ধ

বিশ্বাসে জড়িত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাহা হইলে, "অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ।" ইহাই হইয়া উঠিল। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" নিজে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অন্যকে সিদ্ধ করিবে? অন্ধ কখনও অন্ধকে লইয়া যাইতে পারে না।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র অপার সমুদ্র স্বরূপ ইহাতে না আছে, এমন বিষয় নাই। তাহা বলিয়া কি বিবেকশালী প্রকৃত ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্যালোকবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঐসকল ভ্রমসঙ্কুল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মত সত্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে? বিবেকের পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন পথ পরিত্যাগ করিয়া, যুক্তিকে একবারে অতল সাগর জলে ডুবাইয়া যাহা শাস্ত্রে দেখিবেন, তাহাই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে হিমালয় পরিস্কৃত গঙ্গাকে কি না বলিয়াছেন। যতই কেন পাপী হউক না, এক বিন্দু গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ও গঙ্গা গঙ্গা বলিলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। পরিশেষে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে বিরাজ করিতে থাকিবে। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥" আরও বলিয়াছেন, "অন্ধাঃ ক্লীবা জড়া ব্যঙ্গাঃ পতিতা রোগিণোঽন্ত্যজাঃ। গঙ্গাং সংসেব্য পুরুষা দেবৈ র্গচ্ছন্তি তুল্যতাং॥" অন্ধ, ক্লীব, জড়, বিকলাঙ্গ, পতিত, মহারোগী ও হীনজাতি, ইহারা যদি গঙ্গায় স্নান গঙ্গা পূজাদি করে, তাহা হইলে দেব ভাব প্রাপ্ত হয়। গঙ্গার মর্ত্ত্য লোকে আগমন বৃত্তান্ত, বোধ হয়, সভ্য মহাশয়েরা সকলেই জানেন। দেবরাজ ইন্দ্র সগর ভূপতির অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতাল তলে ধ্যানে নিমগ্ন বাহ্যজ্ঞান শূন্য কপিল মুনির পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। এ দিকে অশ্বের অপহরণ বার্ত্তা প্রচারিত হইলে, মহারাজ সগরের আজ্ঞানুসারে ষষ্টি সহস্র সগর সন্তান অশ্বের অন্বেষণে দিকে দিকে প্রস্থান করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিলেন যে, পাতালে অশ্ব আছে। তখন সগর সন্তানেরা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একজন মুনি তপস্যায় মগ্ন, তাঁহার পশ্চাতে পিতার অশ্বমেধের সংস্কৃত অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে। তখন সগর-সন্তানগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় গালিবর্ষণ ও তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল। অকারণে অবমানিত হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া শাপানলে সেই ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানকে ভস্মীভূত করিলেন। সগর-কুলোৎপন্ন ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন পূর্ব্বক সগর-সন্তানদিগকে উদ্ধার করিলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হইল। সগর-সন্তানেরা পৃথিবী খনন করাতে সমুদ্রের

উৎপত্তি হইল, তজ্জন্য সমুদ্রের একটি নাম সাগর হইল।

এই সকল কথা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের লেখনী সম্ভূত। রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণে এরূপ অলৌকিককথার অসদ্ভাব নাই। সেই সকল কথা ঋষিপ্রণীত বলিয়া কি সত্য, যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? এই সকল অদ্ভুত ব্যাপারের আলোচনাতে কখনই সত্য ধর্ম্মের আলোচনা হইতে পারে না। এ সকল বালক বালিকা ও নিরক্ষর লোকদিগের মনোরঞ্জন উপন্যাস মাত্র। সত্য ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। এ সকল কথা সত্যের বহু দূরে অবস্থিত। আজ কাল পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে বিজ্ঞানের বড়ই প্রাদুর্ভাব। লোকে সকল বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানের যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ধর্ম্মের আলোচনাতেও বিজ্ঞানের যোগ। ধর্ম্মের আলোচনায় বিজ্ঞানের কতদূর আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আছে, তাহা এক্ষণে আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না। আমরা বলি, যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। যাহা মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা। আকাশকুসুম ও শশবিষাণ কেহ কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। অতএব সত্যের অনুসন্ধান কর, সত্যের আলোচনা কর। ধর্ম্মের মূল সংস্থাপিত হইবে, দেশের মুখ উজ্জল হইবে।

একাদশীর উপবাস বিজ্ঞান সম্মত একাদশীর উপবাস কর, স্বর্গ লাভ হইবে; নচেৎ নরকে পচিয়া মরিবে। এ সকল প্রতিপন্ন করিলে, কি সমস্ত ঋষিবাক্য সত্য ও বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে? কখনই নহে। এক ব্যক্তির কতকগুলি বাক্য সত্য, যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া সংদৃষ্টিক ন্যায়ে তিনি যাহা বলিবেন, সমস্তই সত্য হইবে, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। ফল কথা —একাদশী বিজ্ঞান সম্মত হইলেই বা কি হইবে। তাহাতে কি ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি মহৎ মহৎ কার্য্য সকল সংসাধিত হইবে? সেরূপ প্রত্যাশা করা আর মরুভূমি মধ্যে জল প্রত্যাশা করা উভয়ই তুল্য। একাদশীর ফল কি? শরীর শুষ্ক করা। বাত পীড়িত, উদরাময়গ্রস্ত বা জরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কথঞ্চিৎ ভাল বটে; কেননা, জরাদি পীড়ায় শরীর শুষ্ক করা চাই; কিন্তু সুস্থ সবল শরীরে উপবাস করা প্রকৃতির বিরুদ্ধ কার্য্য। এই ত একাদশীর বিজ্ঞান সম্মত ফল—ইহাতে ধর্ম্মের সংস্রব কই? তবে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিয়া বিবেক বিহিত গতানুগতিক লোকদিগকে মুগ্ধ ও অনুরক্ত করা স্বার্থসাধন করা মাত্র! ইহাতে কি ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে? না, দেশের মান রক্ষা ও মুখ উজ্জল হইবে? অনন্তর কতকগুলি অজ্ঞলোক একত্র হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া "একাদশী ব্রত বিজ্ঞান সম্মত, একাদশী ব্রত বিজ্ঞান সম্মত" বলিয়া হিন্দু ধর্ম্ম কি চমৎকার,

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ও পথে ঘাটে চীৎকার করিতে লাগিল। অমনি হিন্দুধর্ম্ম সংশোধিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। কি ভয়ানক ভ্রম! ইহাতেও কখন কি ধর্ম্ম সংশোধিত হয়। শারীরিক নিয়মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংস্রব অতি সামান্য, তাহাতে কোন ধর্ম্ম সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। হিন্দুনামধারী মহাশয়েরা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইল, এই তাঁহাদের আস্ফালন।

হিন্দুধর্ম্ম সকল বিষয়েরই সহিত জড়িত। কাব্য, ইতিহাস, গমন, ভোজন, শয়ন, দন্তধাবন, শৌচ প্রভৃতি মানব জাতির যত কার্য্য আছে, সমস্তই ধর্ম্মের সহিত দৃঢ়বদ্ধ। গোমাংস ভক্ষণ করিলে, হিন্দুদিগের জাতিভ্রষ্ট হয়, পেয়াজ রসুন খাইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হয়, ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইলে পুত্র বিনষ্ট হয়, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ করিলে, মূর্খ হয়। এইরূপ হিন্দু শাস্ত্রে সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের সহিত দৃঢ়রূপে ধর্ম্মকে বদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের উদারভাব, ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক উত্থানকারী ধর্ম্মপালক মহাশয়েরা এই সমস্ত বিষয়ের যৌক্তিকতা, প্রামাণিকতা ও বিজ্ঞান সম্মতত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া কত যত্ন, কত ক্লেশ ও কত পরিশ্রম করিতেছেন, ভারতের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। বক্তৃতার বলে সমগ্র ভারত কম্পিত করিতে অভিলাষ করিতেছেন। করুন, তাহাতেই বা কি হইবে? ঐ সকল পর্য্যালোচনা করাতে ধর্ম্মের আলোচনা হয় না; বিদ্যার আলোচনা হয়, নিজের বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করা হয় মাত্র। উহাতে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ভাবিত হইতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে ভ্রান্ত অভ্রান্ত, সার অসার নানাবিধ বচন আছে। তন্মধ্যে বিচার ও যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়া যাহা অভ্রান্ত, যাহা সত্য, তাহাই গ্রহণ করা বিবেকশালী মানবের কর্ত্তব্য। ভ্রান্ত মত লইয়া গোলযোগ করিলে কখনই ধর্ম্ম প্রচার হইবে না, কখনই দেশের মঙ্গল হইবে না, চিরকালই অধঃপতিত থাকিতে হইবে। এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে কৃতবিদ্য সমাজে মুনি ঋষির বচন, শাস্ত্রের কথন বলিলে, কেহ মুগ্ধ হইবে না। আজ জ্ঞানের আলোক, বিবেকের প্রভা, বিজ্ঞানের প্রভাব, চারি দিকে রাজ্য করিতেছে। এখন যাহা সত্য, যাহা অভ্রান্ত, যাহা যুক্তি সম্মত, তাহাই লোকে গ্রহণ করিবে। এই সত্য যুগে সহজে আর কাহাকেও ভুলাইবার জো নাই। এমনি যুগমাহাত্ম্য, একটি শিশুকেও ভুলাইতে পারা যায় না। এই জন্য বলিতেছি, হে হিন্দুধর্ম্মরক্ষকগণ! আপনারা বিচার টিচার ত্যাগ করিয়া

বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করুন, অভ্রান্ত মতের আলোচনা করুন, তাহা হইলে, ধর্ম্মের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি হইবে। মিছা মিছি জিগীষাপরবশ হইয়া আস্ফালন করিলে কিছু হইবে না। দুই পাঁচজন চিন্তাবিহীন বিবেক শূন্য অকৃতবিদ্য লোককে ভুলাইলে, ফল হইবে না।

সত্যই ধর্ম্মের প্রাণ। সত্যের উপরি ধর্ম্ম সংস্থাপিত। সদাচার তাহার নিত্য অনুগামী। যে স্থানে সত্য নাই, সদাচার নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। সেখানে অধর্ম্মের অন্ধকার, পাপের অন্ধকার চারিদিকে আপন আপন ভীষণ ভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অলীক পদার্থ লইয়া কখন সত্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। আকাশ কুসুমের সত্তা কি কখনও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? ভ্রম জ্ঞান কতক্ষণ থাকে? ভ্রম জ্ঞান কখন তত্ত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অতএব যাহাতে ভ্রম বিনাশ হয়, মিথ্যা ও অসদাচরণ দূরীভূত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা কর, সত্যের অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে, অবশ্যই ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা জানিতে পারিবে। সত্য অনুষ্ঠান করিতে মতি হইবে। অসদাচরণ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, তখন তোমার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি দেখিয়া লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিবে। তখন ধর্ম্ম চর্চ্চা করিলে লোক সকল তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। তখন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ভ্রমসঙ্কুল মত লইয়া চিরজীবন (শত সহস্র বৎসর) ধর্ম্ম প্রচার ও ব্যাখ্যা করিলে, কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না। অতএব, সত্যের অনুসন্ধান কর, সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে নিজের মঙ্গল, পল্লীর মঙ্গল, এমন কি, সমস্ত ভারতের মঙ্গল হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।